কিশোর থ্রিলার

তিন গোয়েন্দা

ভলিউম ১০৬

রকিব হাসান

শামসুদ্দীন নওয়াব

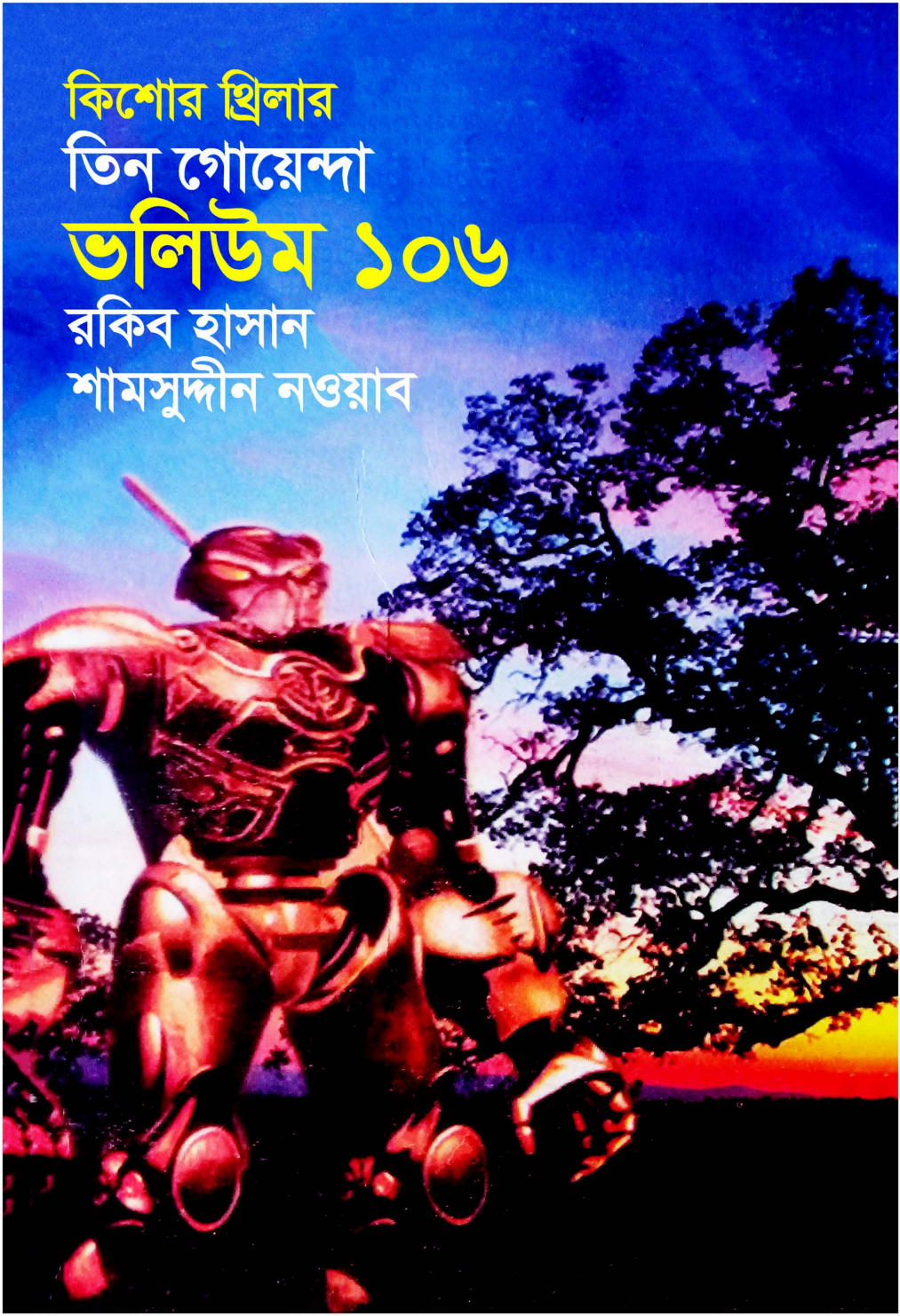

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ: ২০০৮

রচনা: বিদেশি কাহিনি অবলম্বনে

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
ভিক্টর নীল

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

পেস্টিং: বি. এম. আসাদ

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
mail: alochonabibhag@gmail.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

Volume 106
TIN GOYENDA SERIES
By: Rakib Hassan &
Shamsuddin Nawab

সেবা প্রকাশনী

ঊনপঞ্চাশ টাকা

তিন গোয়েন্দা

হ্যালো, কিশোর বন্ধুরা—
আমি কিশোর পাশা বলছি, আমেরিকার রকি বিচ থেকে।
জায়গাটা লস অ্যাঞ্জেলেসে, প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে,
হলিউড থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে।
যারা এখনও আমাদের পরিচয় জানো না, তাদের বলছি,
আমরা তিন বন্ধু একটা গোয়েন্দা সংস্থা খুলেছি, নাম:
তিন গোয়েন্দা।
আমি বাঙালী। থাকি চাচা-চাচীর কাছে।
দুই বন্ধুর একজনের নাম মুসা আমান, ব্যায়ামবীর,
আমেরিকান নিগ্রো; অপরজন আইরিশ আমেরিকান,
রবিন মিলফোর্ড, বইয়ের পোকা।
একই ক্লাসে পড়ি আমরা।
পাশা স্যালভেজ ইয়ার্ডে লোহা-লক্কড়ের জঞ্জালের নীচে
পুরানো এক মোবাইল হোম-এ আমাদের হেডকোয়ার্টার।

তিনটি রহস্যের সমাধান করতে চলেছি এবার—
এসো না, চলে এসো আমাদের দলে!

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া, কোনওভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোনও অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়।

ভূতুড়ে শহর/রকিব হাসান ৭-৭৭
রোবট-রহস্য/শামসুদ্দীন নওয়াব ৭৮-১৫৯
ইচ্ছপূরণ/শামসুদ্দীন নওয়াব ১৬০-১৯২

তিন গোয়েন্দার আরও বই:

তি. গো. ভ. ১/১	(তিন গোয়েন্দা, কঙ্কাল দ্বীপ, রূপালী মাকড়সা)	৬৬/-
তি. গো. ভ. ১/২	(ছায়াশ্বাপদ, মমি, রত্নদানো)	৬৬/-
তি. গো. ভ. ২/১	(প্রেতসাধনা, রক্তচক্ষু, সাগর সৈকত)	
তি. গো. ভ. ২/২	(জলদস্যুর দ্বীপ-১,২, সবুজ ভূত)	
তি. গো. ভ. ৩/১	(হারানো তিমি, মুক্তোশিকারী, মৃত্যুখনি)	৫৫/-
তি. গো. ভ. ৩/২	(কাকাতুয়া রহস্য, ছুটি, ভূতের হাসি)	৫৫/-
তি. গো. ভ. ৪/১	(ছিনতাই, ভীষণ অরণ্য ১,২)	
তি. গো. ভ. ৪/২	(ড্রাগন, হারানো উপত্যকা, গুহামানব)	
তি. গো. ভ. ৫	(ভীতু সিংহ, মহাকাশের আগন্তুক, ইন্দ্রজাল)	৫৮/-
তি. গো. ভ. ৬	(মহাবিপদ, খেপা শয়তান, রত্নচোর)	
তি. গো. ভ. ৭	(পুরনো শত্রু, বোম্বেটে, ভূতুড়ে সুড়ঙ্গ)	
তি. গো. ভ. ৮	(আবার সম্মেলন, ভয়ালগিরি, কালো জাহাজ)	৬০/-
তি. গো. ভ. ৯	(পোচার, ঘড়ির গোলমাল, কানা বেড়াল)	৬১/-
তি. গো. ভ. ১০	(বাক্সটা প্রয়োজন, খোড়া গোয়েন্দা, অথৈ সাগর ১)	
তি. গো. ভ. ১১	(অথৈ সাগর ২, বুদ্ধির ঝিলিক, গোলাপী মুক্তো)	
তি. গো. ভ. ১২	(প্রজাপতির খামার, পাগল সংঘ, ভাঙা ঘোড়া)	৬৩/-
তি. গো. ভ. ১৩	(চাকায় তিন গোয়েন্দা, জলকন্যা, বেগুনী জলদস্যু)	
তি. গো. ভ. ১৪	(পায়ের ছাপ, ছদ্মবেশ, সিংহের গর্জন)	
তি. গো. ভ. ১৫	(পুরনো ভূত, জাদুচক্র, গাড়ির জাদুকর)	
তি. গো. ভ. ১৬	(প্রাচীন মূর্তি, নিশাচর, দক্ষিণের দ্বীপ)	
তি. গো. ভ. ১৭	(দুঃস্বপ্নের অঙ্ক, নকল কিশোর, তিন পিশাচ)	৬০/-
তি. গো. ভ. ১৮	(খাবারে বিষ, ওয়ার্নিং বেল, অবাক কাণ্ড)	
তি. গো. ভ. ১৯	(বিমান দুর্ঘটনা, গোরস্তানে আতঙ্ক, রেসের ঘোড়া)	
তি. গো. ভ. ২০	(খুন, স্পেনের জাদুকর, বানরের মুখোশ)	
তি. গো. ভ. ২১	(সুলায় নেক্স, কালো হাত, মূর্তির হুঙ্কার)	
তি. গো. ভ. ২২	(চিতা নিরুদ্দেশ, অভিনয়, আলোর সংকেত)	
তি. গো. ভ. ২৩	(পুরানো কামান, গেল কোথায়, ওকিমুরো কর্পোরেশন)	
তি. গো. ভ. ২৪	(অপারেশন কক্সবাজার, মায়া নেকড়ে, প্রেতাত্মার প্রতিশোধ)	
তি. গো. ভ. ২৫	(জিনার সেই দ্বীপ, কুকুরখেকো ডাইনী, গুপ্তচর শিকারী)	
তি. গো. ভ. ২৬	(খাবেলা, বিষাক্ত অর্কিড, সোনার খোঁজে)	
তি. গো. ভ. ২৭	(ঐতিহাসিক দুর্গ, রাতের আঁধারে, ভুষার বন্দি)	
তি. গো. ভ. ২৮	(ডাকাতের পিছে, বিপজ্জনক খেলা, ভ্যাম্পায়ারের দ্বীপ)	
তি. গো. ভ. ২৯	(আরেক ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন, মায়াজাল, সৈকতে সাবধান)	৫১/-
তি. গো. ভ. ৩০	(নরকে হাজির, ভয়ঙ্কর অসহায়, গোপন ফর্মুলা)	৫৮/-
তি. গো. ভ. ৩১	(মারাত্মক ভুল, খেলার নেশা, মাকড়সা মানব)	৫৩/-
তি. গো. ভ. ৩২	(প্রেতের ছায়া, রাত্রি ভয়ঙ্কর, খেপা কিশোর)	৬৩/-
তি. গো. ভ. ৩৩	(শয়তানের থাবা, পতঙ্গ ব্যবসা, জাল নোট)	
তি. গো. ভ. ৩৪	(যুদ্ধ ঘোষণা, দ্বীপের মালিক, কিশোর জাদুকর)	৫৫/-

ভি. গো. ভ. ৩৫ (নকশা, মৃত্যুঘড়ি, তিন বিঘা)
ভি. গো. ভ. ৩৬ (টক্কর, দক্ষিণ যাত্রা, গ্রেট রবিনিয়োসো)
ভি. গো. ভ. ৩৭ (ভোরের পিশাচ, গ্রেট কিশোরিয়োসো, নিখোঁজ সংবাদ) ৫৪/-
ভি. গো. ভ. ৩৮ (উদ্দেশ্য, ঠগবাজি, দীঘির দানো)
ভি. গো. ভ. ৩৯ (বিষের ভয়, জলদস্যুর মোহর, চাঁদের ছায়া)
ভি. গো. ভ. ৪০ (অভিশপ্ত লকেট, গ্রেট মুসাইয়োসো, অপারেশন অ্যালিগেটর)
ভি. গো. ভ. ৪১ (নতুন স্যার, মানুষ ছিনতাই, পিশাচকন্যা)
ভি. গো. ভ. ৪২ (এখানেও ঝামেলা, দুর্গম কারাগার, ডাকাত সর্দার)
ভি. গো. ভ. ৪৩ (আবার ঝামেলা, সময় সুরঙ্গ, ছদ্মবেশী গোয়েন্দা)
ভি. গো. ভ. ৪৪ (প্রত্নসন্ধান, নিষিদ্ধ এলাকা, জবরদখল)
ভি. গো. ভ. ৪৫ (বড়দিনের ছুটি, বিড়াল উধাও, টাকার খেলা)
ভি. গো. ভ. ৪৬ (আমি রবিন বলছি, উল্কি রহস্য, নেকড়ের গুহা)
ভি. গো. ভ. ৪৭ (নেতা নির্বাচন, সি সি সি, যুদ্ধযাত্রা)
ভি. গো. ভ. ৪৮ (হারানো জাহাজ, শাপদের চোখ, পোষা ডাইনোসর)
ভি. গো. ভ. ৪৯ (মাছির সার্কাস, মঞ্চভীতি, ডীপ ফ্রিজ)
ভি. গো. ভ. ৫০ (কবরের প্রহরী, তাসের খেলা, খেলনা ভালুক)
ভি. গো. ভ. ৫১ (পেঁচার ডাক, প্রেতের অভিশাপ, রক্তমাখা ছোরা)
ভি. গো. ভ. ৫২ (উড়ো চিঠি, স্পাইডারম্যান, মানুষখেকোর দেশে)
ভি. গো. ভ. ৫৩ (মাছেরা সাবধান, সীমান্তে সংঘাত, মরুভূমির আতঙ্ক) ৫১/-
ভি. গো. ভ. ৫৪ (গরমের ছুটি, স্বর্গদ্বীপ, চাঁদের পাহাড়) ৪৬/-
ভি. গো. ভ. ৫৫ (রহস্যের খোঁজে, বাংলাদেশে তিন গোয়েন্দা, টাক রহস্য) ৪৬/-
ভি. গো. ভ. ৫৬ (হারজিত, জয়দেবপুরে তিন গোয়েন্দা, ইলেক্ট্রনিক আতঙ্ক)
ভি. গো. ভ. ৫৭ (ভয়াল দানব, বাঁশিরহস্য, ভূতের খেলা)
ভি. গো. ভ. ৫৮ (মোমের পুতুল, ছবিরহস্য, সুরের যাদু)
ভি. গো. ভ. ৫৯ (চোরের আস্তানা, মেডেল রহস্য, শিশির ডাক) ৪০/-
ভি. গো. ভ. ৬০ (উটকি বাহিনী, ট্রাইম ট্র্যাভেল, উটকি শত্রু) ৪২/-
ভি. গো. ভ. ৬১ (চাঁদের অসুখ, ইউএফও রহস্য, মুকুটের খোঁজে ভি. গো.) ৩৬/-
ভি. গো. ভ. ৬২ (যমজ ভূত, ঝড়ের বনে, মোমপিশাচের জাদুঘর) ৪০/-
ভি. গো. ভ. ৬৩ (ড্রাকুলার রক্ত, সরাইখানায় ষড়যন্ত্র, হানাবাড়িতে তিন গোয়েন্দা) ৪৬/-
ভি. গো. ভ. ৬৪ (মায়াপথ, হীরার কার্তুজ, ড্রাকুলা-দুর্গে তিন গোয়েন্দা) ৩৮/-
ভি. গো. ভ. ৬৫ (বিড়ালের খুনখারাবি+রহস্যভেদী তিন গোয়েন্দা+ফেরাউনের কবরে) ৩৬/-
ভি. গো. ভ. ৬৬ (পাথরে বন্দী+গোয়েন্দা রোবট+কালো পিশাচ) ৩৮/-
ভি. গো. ভ. ৬৭ (ভূতের গাড়ি+হারানো কুকুর+পরিত্যক্ত জাহাজ) ৪২/-
ভি. গো. ভ. ৬৮ (টেরির দানো+বাবলি বাহিনী+উটকি গোয়েন্দা) ৪৩/-
ভি. গো. ভ. ৬৯ (পাগলের গুপ্তধন+দুষ্টু মানুষ+মমির আর্তনাদ) ৪২/-
ভি. গো. ভ. ৭০ (পার্কে বিপদ+বিপদের গন্ধ+ছবির জাদু) ৪৬/-
ভি. গো. ভ. ৭১ (পিশাচবাহিনী+রক্তের সন্ধানে+পিশাচের থাবা) ৪৬/-
ভি. গো. ভ. ৭২ (তিনদেশী রাজকুমার+সাপের বাসা+রবিনের ডায়েরি) ৪৭/-
ভি. গো. ভ. ৭৩ (পৃথিবীর বাইরে+ট্রেইন ডাকাতি+ভূতুড়ে ঘড়ি) ৪৬/-
ভি. গো. ভ. ৭৪ (কাওরাই দ্বীপের মুখোশ+মহাকাশের কিশোর+ব্রাউনভিলে গন্ডগোল) ৫১/-
ভি. গো. ভ. ৭৫ (কালো চাঁদ+সিংহ নিরুদ্দেশ+ক্যাটাসিল্যান্ড) ৫১/-
ভি. গো. ভ. ৭৬ (মৃত্যুর মুখে তিন গোয়েন্দা+পোড়াবাড়ির রহস্য+নিখুঁত রহস্য) ৪১/-
ভি. গো. ভ. ৭৭ (চ্যাম্পিয়ান গোয়েন্দা+ছায়াসঙ্গী+পাতাল ঘরে তিন গোয়েন্দা) ৫০/-
ভি. গো. ভ. ৭৮ (চক্রান্তে তিন গোয়েন্দা+সিলেটে তিন গোয়েন্দা+জলদস্যুর) ৪৬/-
ভি. গো. ভ. ৭৯ (ভূতুরে সোনা+পিশাচের ঘাঁটি+ভূতুরে মানব)
ভি. গো. ভ. ৮০ (মুখোশ পরা মানুষ+অদৃশ্য রশ্মি+গোপন ডায়েরি)
ভি. গো. ভ. ৮১ (কালোপর্দার অন্তরালে+ভয়াল শহর+সুমেরুর আতঙ্ক) ৪৭/-
ভি. গো. ভ. ৮২ (কবরদুর্গ কবলে+গাড়ি চোর+পুতুল-রহস্য) ৪৪/-

তি. গো. ভ ৮৩	(খনিতে বিপদ+গুহা-রহস্য+কিশোরের নোটবুক)	৪৪/-
তি গো ভ. ৮৪	(মৃত্যুগুহায় বন্দি+বিষাক্ত ছোবল+গুটকি রাজকুমার)	৪১/-
তি. গো. ভ. ৮৫	(গুপ্তধনের সন্ধানে+শয়তানের জলাভূমি+সেরা গোয়েন্দা)	৫০/-
তি. গো. ভ ৮৬	(পাহাড়ে বন্দি+বারমুডা অভিযান+রহস্যের হাতছানি)	৪৮/-
তি. গো. ভ. ৮৭	(মমিরহস্য+ভাইরাস আতঙ্ক+তালিকা-রহস্য)	৪৯/-
তি. গো. ভ. ৮৮	(পিছনে কে!+খুনে তান্ত্রিক+কালো আলখেল্লা)	
তি গো. ভ. ৮৯	(বোম্বেটের সিন্দুক+মারাত্মক বিপদ+হারানো তলোয়ার)	৪৪/-
তি. গো. ভ. ৯০	(হিমগিরিতে সাবধান!+সাগরে শঙ্কা+খেপা জাদুকর)	৪৪/-
তি. গো. ভ. ৯১	(ক্যামেরার চোখ+ভ্যাম্পায়ারের ছায়া+ভূতুড়ে বাড়ি)	৪১/-
তি. গো. ভ. ৯২	(জিন্দালাশের পিছে+অগ্নিগিরি অভিযান+গবলিনের কবলে)	৫০/-
তি. গো. ভ. ৯৩	(পিশাচের আস্তানা+উড়ন্ত রবিন+অন্য ভুবনের কিশোর)	৪১/-
তি. গো. ভ. ৯৪	(সময়সুড়ঙ্গে আবার+হিমপিশাচের কবলে+ছায়ামানবী)	৪৬/-
তি. গো. ভ. ৯৫	(মরণসঙ্কেত+জলদস্যুর গুপ্তধন+গোলমাল)	৫৩/-
তি. গো. ভ. ৯৬	(সাগরতীরে তিন গোয়েন্দা+দ্বীপরহস্য+দুর্গরহস্য)	৫৩/-
তি. গো. ভ. ৯৭	(ভেল্কিবাজ+মঙ্গলের অতিথি+প্রেতচক্র)	৩৮/-
তি. গো. ভ. ৯৮	(ঝড়ের দ্বীপ+জিন্দালাশের মুখোমুখি+তুষারগিরি-রহস্য)	
তি. গো. ভ. ৯৯	(রুদ্র সাগর+মূর্তি চোর+মহাকাশের দূত)	৪৪/-
তি. গো. ভ. ১০০	(নিঝুমপুরের কাণ্ড+তুষারদানো+খুলিগুহার রহস্য)	৪৪/-
তি. গো. ভ. ১০১	(প্রেত বৈমানিক+ছায়া কালো কালো+বাতিঘরের পিশাচ)	৪৬/-
তি. গো. ভ. ১০২	(গুপ্তদূত+গ্রহান্তরের বন্ধু+জাদুঘরের দানব)	৪২/-
তি. গো. ভ. ১০৩	(মাদক-রহস্য+গুপ্তধনের নকশা+ভয়ের মুখোশ)	৫০/-
তি. গো. ভ. ১০৩/২	(অদ্ভুত পাথর+দানবের চোখ+হারানো মমি)	৩৬/-
তি. গো. ভ. ১০৪	(নিখোঁজ মেয়ে+মৃত নগরী+বনের খাঁচায়)	৪৭/-
তি. গো. ভ. ১০৪/২	(গোরস্থানে সাবধান!+নেকড়ের বনে+খাবারচোর)	৪৪/-
তি. গো. ভ. ১০৫	(ভূতুড়ে ট্রেন+ইয়েতি-রহস্য+ক্যাপ্টেন কিডের গুপ্তধন)	৪৬/-
তি. গো. ভ. ১০৫/২	(লকেট-রহস্য+গুটকির পেট শো+পান্না-রহস্য)	৩৮/-
তি. গো. ভ. ১০৬	(ভূতুড়ে শহর+ রোবট-রহস্য+পান্না-রহস্য)	৪৯/-
তি. গো. ভ. ১০৬/২	(লাটসাহেব+পাজি বিড়াল+ভৌতিক দুর্গ)	৫৯/-
তি. গো. ভ. ১০৭	(যন্ত্রপিশাচ+বিভীষণের জাগরণ+কঙ্কাল-রহস্য)	৫০/-
তি. গো. ভ. ১০৭/২	(টেরোড্যাকটিলের থাবা+পাহাড়ী দানো+রাজকুমারের খোঁজে)	৩৮/-
তি. গো. ভ. ১০৮	(অভিশপ্ত হোটেল+সবুজ মৃত্যু+হারকিউলিস-রহস্য)	৪১/-
তি. গো. ভ. ১০৮/২	(বনভূমির আতঙ্ক+বামন ভূত+ড্রাকুলার আলখেল্লা)	৩৮/-
তি. গো. ভ. ১০৯	(ওয়াদারম্যান+খুনে রোবট+নেকড়ের গর্জন)	৪১/-
তি. গো. ভ. ১০৯/২	(আবার মায়ানেকড়ে+টি-রেক্স-রহস্য+বনের ডায়েরি)	৪১/-
তি. গো. ভ. ১১০	(বিদায়, মুসা!+বাক্স-রহস্য+মৃত্যু-মমির অভিশাপ)	৫৯/-
তি. গো. ভ. ১১০/২	(অদৃশ্য হাত+সার্কাসের তাঁবু+চাঁদের মানুষ)	৪১/-
তি. গো. ভ. ১১১	(ঠগবাজ+মৃত্যুর মুখোমুখি+হারানো ক্যামেরা)	৪৭/-
তি. গো. ভ. ১১১/২	(দুঃস্বপ্নের খেলা-১+দুঃস্বপ্নের খেলা-২+ডাইনোসরের উপত্যকা)	৫৩/-
তি. গো. ভ. ১১২	(জাদুকরের ভেল্কি+মিশর-রহস্য+হিম মৃত্যুর ফাঁদে)	৬২/-
তি. গো. ভ. ১১২/২	(ছায়ামূর্তি+গ্রহান্তরের দুঃস্বপ্ন+ভূতুড়ে খামার)	৪৪/-
তি. গো. ভ. ১১৩	(নির্জন উপত্যকা+ভিনগ্রহে বিপদ+ডাইনীর কবলে)	৫৩/-
তি. গো. ভ. ১১৩/২	(ফুলচোর-১ ও ২+গ্রহযুদ্ধ)	৫০/-
তি. গো. ভ. ১১৪	(বুদ্ধির খেলা+অরণ্যের প্রতিশোধ+ভূতুড়ে বিমান)	৪৯/-
তি. গো. ভ. ১১৪/২	(ম্যাজিক শো+কালঘুম+মঞ্চনাটক)	৪৬/-
তি. গো. ভ. ১১৫	(ঘোড়াচোর কিশোর+জাদুর ঘোড়া+দ্বীপের দানো)	৫২/-
তি. গো. ভ. ১১৫/২	(পাহাড়ে আতঙ্ক+ভূতুড়ে বর্ম+ভূমিকম্প)	৪৩/-
তি. গো. ভ. ১১৬	(দৈত্যের গুহায় তিন গোয়েন্দা+রহস্যজাল+গ্রীনহিলসের গুপ্তধন)	৪০/-
তি. গো. ভ. ১১৬/২	(আঁধারে কে+জলাভূমির আতঙ্ক+ভূতুড়ে দুর্গ)	৪৩/-
তি. গো. ভ. ১১৭	(সময়সুড়ঙ্গে মহাবিপদ+খুন-রহস্য+ছুটিতে ছোটাছুটি)	৫১/-
তি. গো. ভ. ১১৭/২	(আমিই কিশোর+আলাদা অভিযান+আমাজানের গহীনে)	৪৯/-
তি. গো. ভ. ১১৮	(চোরের পিছে+গোলকধাঁধা+চিঠির ফাঁদে)	৫১/-

ভূতুড়ে শহর

রকিব হাসান

প্রথম প্রকাশ:২০০৫

এক

গোল্ডেন ডোর সিটি। সুন্দর নাম। কিন্তু কোনমতেই পছন্দ করতে পারছে না কারিনা টেলার। দু'মাস হলো এসেছে। একদিনের জন্য ভাল লাগেনি শহরটা। আসার পর থেকেই তার মনে হচ্ছিল, খারাপ কিছু ঘটবে, খারাপ কিছু ঘটবে! এবং সত্যিই ঘটল। ওর ছোট ভাই নিকুকে কিডন্যাপ করে নিয়ে গেল ভয়ঙ্কর ভূতটা।

ঘটনার দিন সৈকতে বেড়াতে গিয়েছিল দুজনে। নিকু আবদার ধরল, 'আপু, জেটিতে উঠি?'

সৈকতের শেষে পাথরের জেটিটা যেন ঠেলে বেরিয়ে চলে গেছে লাইটহাউসের দিকে। গোল্ডেন ডোর সিটির লাইটহাউস।

'না।' কারিনার দুই হাত প্যান্টের পকেটে। 'এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে। ঠাণ্ডা পড়ছে।'

'প্লিজ, আপু!' গোঁ ধরল পাঁচ বছরের নিকু। 'আমি সাবধান থাকব।'

ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে হাসল কারিনা। 'শব্দটার মানে জানিস?'

ভুরু কুঁচকাল নিকু। 'কোন শব্দ?'

'এই যে বললি, সাবধান, হাঁদা কোথাকার!' ঘূর্ণিতে ফেনায়িত সাগরের পানির দিকে তাকাল কারিনা। ঢেউগুলো বেশি বড় নয়। কিন্তু যে রকম করে এসে পাথরের জেটির গায়ে আছড়ে পড়ছে, ভাল লাগছে না তার। মনে হচ্ছে যেন জেটিটা ভেঙে নিয়ে যেতে চায় ঢেউ। জেটির শেষ মাথায় নীরব প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে আছে উঁচু লাইটহাউসটা। অন্ধকার। তাকালেই ভয় লাগে। কেমন যেন...কেমন বলা যায়? হ্যাঁ, ভূতুড়ে!

'আপু, প্লিজ!' আবার অনুরোধ করল নিকু।

জোরে নিঃশ্বাস ফেলল কারিনা। হাল ছেড়ে দিয়েছে। 'ঠিক আছে, যা। কিন্তু ঠিক মাঝখানে থাকবি। কিনারে যাবি না। দেখে পা ফেলবি। পানিতে

পড়লে মরবি বলে দিলাম।'

আনন্দে লাফাতে লাগল নিকু। 'তুই আসবি?'

ঘুরে দাঁড়াল কারিনা। 'না। আমি এখানে বসে পাহারা দেব। মনে রাখিস, সাগর থেকে হাঙর এসে যদি তোকে গিলতে চায়, আমি কিচ্ছু করব না।'

লাফানো থামিয়ে দিল নিকু। 'হাঙর কি ছোট ছেলেদের খায়?'

'খায়, মুখের কাছে কোন মেয়ে না পেলে।' ওর কথা বিশ্বাস করে ভাইকে চোখ বড়বড় করে ফেলতে দেখে হেসে ফেলল কারিনা। একটা বড় পাথরের ওপর বসল। 'ঠাট্টা করলাম। হাঙরের কাছে ছেলেমেয়ের কোন বাছবিচার নেই। যা, হেঁটে আয় জেটির ওপর থেকে। বাড়ি যাওয়া দরকার। কয়েক মিনিটের মধ্যেই অন্ধকার হয়ে যাবে।'

'ঠিক আছে।' নাচতে নাচতে চলে গেল নিকু। জেটিতে উঠে বলল, 'ভাবিসনে, আপু, আমি জেটি থেকে পড়ব না। হাঙর ধরতে পারবে না আমাকে।'

'বড়াই করা ছাড়। সাবধান থাকবি।' কারিনার অবাক লাগে। আজব এই শহরের ভীতিকর পরিবেশ নিকুর মধ্যে কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি দেখে। দুই মাস আগে ওদের মা ওদের বাপ-দাদার পুরানো বাড়িটাতে এসে উঠেছেন। কারিনার ভাল লাগেনি, কিন্তু নিকুর কোন বিকার নেই। এখানকার সাগরপাড়ে পড়ে থাকা ঝিনুকের মত হাসে। ঝিনুকের হাসি! শুনতে অদ্ভুতই লাগে, কিন্তু হাসির ভঙ্গিতে ডালা ফাঁক করে রাখা ঝিনুকগুলোকে দেখে হাসিই মনে হয় কারিনার।

কারিনা জানে, শহরটা মোটেও নিরাপদ নয়। গোল্ডেন ডোর সিটির আরেক নাম 'ডেথ সিটি'। এখানকার রাত অন্যান্য শহরের চেয়ে অন্ধকার, চাঁদও অন্য শহরের চেয়ে বড়, যেখান থেকে ওরা এসেছে। মাঝে মাঝে রাত দুপুরে শোনা যায় অদ্ভুত শব্দ। মাথার অনেক ওপর থেকে ভেসে আসে বড় বড় ভ্যাম্পায়ার-বাদুড়ের ডানা ঝাপটানোর শব্দ, মাটির নীচ থেকে যেন চুইয়ে ওপরে উঠে আসে প্রেতের চাপা গোঙানি আর চিৎকার। হয়তো সবই তার কল্পনা, কে জানে! নিশ্চিত হতে পারে না সে। ভয়ও তাড়াতে পারে না। ইস্, বাবাটা যদি এখনও বেঁচে থাকত! ওদের সঙ্গে আসত! ভয় অনেক কম লাগত। বাবাকে খুব পেতে ইচ্ছে করে কারিনার। না পাওয়াটা ভীষণ

কষ্টের।

ভয় পেলেই বা কী করবে। সারাক্ষণ তো আর বাড়িতে বসে থাকা যায় না। থাকতে ইচ্ছেও করে না। প্রতিদিন বিকেলে তাই হাঁটতে বেরোয় দুই ভাইবোনে। চলে আসে সাগরের কিনারে। সাগর ওকে টানে।

এমনকী ওই যে ওই ভূতুড়ে লাইটহাউসটা, যেটাকে প্রচণ্ড ভয় পায় ও, সেটাও ওকে টানে।

কারিনার মনে ভাবনা। চোখ নিকুর দিকে। বড় বড় পাথরগুলোর ওপর হাঁটছে নিকু। বাবার শেখানো একটা গান মনে পড়ল কারিনার। গুনগুন করে গেয়ে উঠল। সুরটা মোটেও ভাল না। তারপরেও গায় কারিনা। কারণ, গানটা বাবার স্মৃতিবিজড়িত। গানের কথাগুলো অদ্ভুত:

সাগর যেন এক মহিলা,
কতই না তার দয়া,
কিন্তু ভয়ঙ্কর তার কালো মেজাজ
শীতল পানি আর ঢেউয়ের দেয়াল,
যদি তাতে পড়ো,
মৃত্যু তোমার ঘটবে সুনিশ্চিত
মাছেরা এসে ছিঁড়ে খাবে দেহ।
সাগর যেন এক রাজকন্যে,
কতই না তার রূপ,
কিন্তু সেই রূপের গভীরে যদি ডোবো
সেই অসীমতায়, যেখানে অক্টোপাসের বাসা
মৃত্যু তোমার ঘটবে সুনিশ্চিত
হাঙর এসে কামড়ে খাবে দেহ।

বাবার এই গান কারিনার মতই আরও একজন খুব পছন্দ করতেন, বাবার মা, কারিনার দাদু, বাবার কাছে শুনেছে সে। পাঁচ বছর বয়েসে কারিনার বাবাও তাঁর বাবা-মা'র সঙ্গে এই গোল্ডেন ডোর সিটিতেই বাস করত।

বাবা কি কখনও লাইটহাউসে গেছে? ভাবছে কারিনা। আর ঠিক তখনই, কোনরকম জানান না দিয়ে লাইটহাউসের মাথার কাছের জানালা দিয়ে বেরিয়ে এল সার্চলাইটের আলো।

ছোট্ট একটা অস্ফুট চিৎকার বেরিয়ে এল কারিনার মুখ দিয়ে। লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। সবাই জানে, লাইটহাউসটা পরিত্যক্ত। কেউ থাকে না ওখানে। ভিতরে শুধু মাকড়সা আর ধুলোর স্তূপ। এশহরে আসার পর কোনদিন ওটাতে আলো দেখেনি কারিনা। মা বলেছেন, লাইটহাউসের সার্চলাইট বহু যুগ ধরে জ্বালানো হয় না।

কিন্তু এখন আলো দেখতে পাচ্ছে কারিনা। তীব্র সাদা আলোকরশ্মি লাইটহাউসের মাথা থেকে যেন ফুঁড়ে বেরিয়ে এল। সাগরের দিকে মুখ সেই আলোর। সাগরের পানির উপর দিয়ে ধেয়ে এল শত্রুর কামান থেকে দাগা গোলার মত। ওই আলোর নীচে পানির ঘূর্ণি যেন আরও বেড়ে গেল। মনে হচ্ছে টগবগ করে ফুটছে, পানি থেকে বাষ্প উঠছে।

আলোটা ঘুরল তীরের দিকে। জেটির দিকে নিশানা করল। যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে কোন কিছু।

ওর ভাইয়ের দিকে আলোটাকে এগোতে দেখে আঁতকে উঠল কারিনা।

জেটির মাঝামাঝি জায়গায় রয়েছে নিকু। নীচের দিকে নজর। আলোটা এখনও দেখেনি।

'নিকু!' চেঁচিয়ে উঠল কারিনা।

গায়ে আলো পড়তে উপর দিকে তাকাল নিকু। তার মনে হলো, শক্ত একটা হাত ওকে চেপে ধরেছে। কয়েক সেকেন্ডের জন্য তার খাটো বাদামী চুলগুলো খাড়া হয়ে গেল। তারপর তার পা দুটো পাথরের জেটি ছেড়ে শূন্যে উঠে পড়ল। চোখ ধাঁধানো তীব্র আলো। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে কারিনা, সেই আলোর ভিতর থেকে দুটো কুৎসিত হাত বেরিয়ে এসেছে। তার মনে হলো, চেপে ধরতে যাচ্ছে নিকুকে।

দ্বিতীয়বার চিৎকার করে উঠল কারিনা। 'নিকু, সরে যা!'

ভাইয়ের দিকে দৌড়ানো শুরু করেছে সে। কিন্তু আলোটার গতি তার চেয়ে অনেক দ্রুত। জেটির কাছে কারিনা পৌঁছানোর আগেই হ্যাঁচকা টানে নিকুকে অনেকখানি তুলে নেওয়া হলো। কয়েক সেকেন্ড পাথর আর সাগরের ঢেউয়ের উপর যেন ঝুলে থাকল নিকু। তীব্র বাতাস চুম্বকের মত আকর্ষণ করছে তার চুল। চোখে আতঙ্ক।

'নিকু!' চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল কারিনা। পাথর থেকে পাথরে লাফিয়ে চলেছে। কোথায় পা পড়ছে লক্ষ নেই। ভাইয়ের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে,

হাত বাড়ালেই ছুঁতে পারে, এই সময় ঘটল দুর্ঘটনা। ভেজা শ্যাওলায় পা পড়ে জুতোর তলা পিছলে গেল। দড়াম করে আছাড় খেল সে। তীক্ষ্ণ ব্যথা ছড়িয়ে গেল ডান পায়ে। হাঁটুর কাছে ছড়ে গেছে।

'আপু!' নিকুর ককানি শোনা গেল। পাশাপাশি আরেকটা শব্দ। অদ্ভুত। কারিনার মনে হলো, গভীর কোন কুয়ার ভিতর থেকে উঠে আসছে, যেন কোনও প্রেতের অসহায় আর্তনাদ। হ্যাঁচকা টানে নিকুকে আরও উপরে তুলে নেওয়া হলো। কারিনার চোখের সামনে ঘটছে ঘটনাগুলো। কিছুই করতে পারছে না সে।

নিকুকে সাগরের উপর নিয়ে যাওয়া হয়েছে। জেটি থেকে দূরে। তার পায়ের নীচে ঢেউ ভাঙছে। ভয়াল সামুদ্রিক ঝড় হারিকেনের মত গর্জন করে চলেছে বাতাস।

স্বাভাবিক বাতাস নয়। মনে হচ্ছে যেন প্রাণ আছে ওই বাতাসের। প্রচণ্ড খিদে। জ্যান্ত সমস্ত কিছুকে গ্রাস করতে চায়। শব্দটা আসছে আলোকরশ্মির ঠিক ভিতর থেকে। অদ্ভুত এক ধরনের শয়তানি ভরা রসিকতা রয়েছে যেন ওই শব্দের মধ্যে। কারিনার মনে হলো, কুৎসিত হাসি হাসছে ওটা।

'নিকু!' হতাশকণ্ঠে ফিসফিস করে বলল কারিনা।

কথা বলার চেষ্টা করছে নিকু। বোধহয় তার নামটা আবার উচ্চারণ করতে বলছে বোনকে। পারছে না।

আবার চলতে শুরু করল আলোটা।

ঝাঁকি দিয়ে সাগরের দিকে আরও অনেকখানি সরিয়ে নেওয়া হলো নিকুকে। তীরে আছড়ে পড়া ঢেউয়ের কাছ থেকে দূরে। থামল না আর। ক্রমেই দূরে সরে যেতে লাগল। ঠাণ্ডা আলোর ভিতরে ছটফট করতে থাকা নিকু অস্পষ্ট হয়ে আসছে। উপর দিকে উঠে গেল আলোটা। নিভে গেল। হঠাৎ করে যেমন দেখা গিয়েছিল, হঠাৎ করেই অদৃশ্য হয়ে গেল।

নিকুও অদৃশ্য হয়ে গেছে আলোর সঙ্গে।

'নিকু! নিকু!' চিৎকার করে কাঁদতে লাগল কারিনা।

আলো নিভে গেলেও বাতাসের গর্জন বন্ধ হলো না।

নিষ্ঠুর বাতাস আর ঢেউয়ের শব্দ ঢেকে দিল কারিনার কান্না।

কারও কানে গেল না সেটা।

কেউ এল না ওকে সাহায্য করতে।

দুই

নিকুকে ভূতে তুলে নিয়ে যাবার দু'দিন পর গোল্ডেন ডোর সিটির একটা বেকারি শপে 'প্রিন্সেস' রোডালিন ওয়ারনারের সঙ্গে সকালের নাস্তা খেতে বসেছে তিন গোয়েন্দা। দুধ আর ডোনাট। তবে রোডা নিয়েছে দুধের বদলে কফি। তার যুক্তি, স্নায়ু সতেজ রাখতে ক্যাফেনের তুলনা নেই।

'কী হয়েছে তোমার নার্ভের?' জেলি ডোনাট চিবাতে চিবাতে জিজ্ঞেস করল রবিন।

'আমার মত এশহরে বাস করলে আর একথা জিজ্ঞেস করতে না।' কফির কাপে চুমুক দিল রোডা। রবিনের হাতের ডোনাটটার দিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'ভিতরে উল্টাপাল্টা জিনিস থাকতে পারে, এমন জিনিস না খাওয়াই ভাল।'

'কেন?' রবিনের প্রশ্ন।

'ভিতরে কী ভরে দিয়েছে জানা আছে তোমার?'

'কী আবার ভরে দেবে? এটা সুস্বাদু জেলি ডোনাট।' কিন্তু খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে রবিন।

সবজান্তার ভঙ্গিতে জবাব দিল রোডা, 'জেলি তো বুঝলাম, কিন্তু ওই জেলি কোনখান থেকে আনা হয়েছে তা জানো? বেকারির পিছনের ঘরে উঁকি দিয়েছ? ওখানে কী আছে দেখেছ? আমরা সবাই জানি, র‍্যাস্পবেরি দিয়ে জেলি বানায়, স্ট্রবেরি দিয়ে বানায়, আপেল-আঙুর আর আরও অনেক ফল দিয়েই বানানো যায়। কিন্তু শ্রদ্ধেয় কোনও বুদ্ধিমান মানুষের মগজ দিয়েও যে বানানো যায়, তা কি জানো?'

হাতের আধখাওয়া ডোনাটটা আস্তে করে প্লেটে নামিয়ে রাখল রবিন। 'ধূর, তোমার কথা আমি বিশ্বাস করি না!'

'সেটা তোমার ব্যাপার। এশহরে শুধু যুক্তির ওপর নির্ভর করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়, রোডা বলল। 'পরিস্থিতি আর মন কী বলে সেটার ওপরও জোর দেয়া উচিত মাঝে মাঝে। এসব ক্ষেত্রে নাকের সাহায্য

অবশ্যই নিতে পারো।' সামনে ঝুঁকে প্লেটে রাখা ডোনাট শুঁকলো সে। 'হুঁ। এটার গন্ধটা ঠিকই লাগছে আমার কাছে। খেতে পারো।'

ততক্ষণে দুধের গ্লাসে চুমুক দিতে আরম্ভ করেছে রবিন। 'উঁহু, আর খাব না।'

ডোনাটটা শুঁকল মুসা। 'আমি বরং খেয়ে ফেলি। মানুষের মগজ না ছাগলের মগজ, ও নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই।'

'খাও,' প্লেটটা মুসার দিকে ঠেলে দিল রবিন।

আবার গোল্ডেন ডোর সিটিতে ছুটি কাটাতে এসেছে তিন গোয়েন্দা। উঠেছে কিশোরদের র‍্যাঞ্চ হাউসে। বাড়িটা কিনেছেন রাশেদ পাশা। পুরানো মালের সন্ধান পেয়ে এশহরে এসেছিলেন তিনি। খামারবাড়ি সহ পরিত্যক্ত পুরানো র‍্যাঞ্চটা দেখে পছন্দ হয়ে যায়। কিনে ফেলেন।

চারিদিকে পাহাড়ঘেরা এই শহরটিতে ঢুকলে মনে হবে এক লাফে কয়েক কোটি বছর পিছিয়ে চলে আসা হয়েছে, অথচ রকি বীচ থেকে খুব একটা দূরে না। প্রাগৈতিহাসিক বলে চালিয়ে দেওয়া যায় অনায়াসে। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে এর ভূপ্রকৃতির খুব একটা পরিবর্তন হয়নি।

সুযোগ পেলেই ছুটি কাটাতে এখানে চলে আসে তিন গোয়েন্দা। প্রথমবার এসে পড়েছিল র‍্যাঞ্চ হাউসের এক ভয়ঙ্কর ভূতের খপ্পরে। সেসময়ই পরিচয় হয় রোডার সঙ্গে। সেবার ভূতের সঙ্গে লড়াই করতে তিন গোয়েন্দাকে সহায়তা করেছিল রোডা। ('তিন বন্ধু' সিরিজের 'মায়াপথ' বইতে)। মেয়েটা সুন্দরী। লম্বা, ছিপছিপে শরীর। নীল চোখ। বাবা আদর করে ডাকেন প্রিন্সেস।

আগের বারের মতই এবারও যেন তিন গোয়েন্দার গন্ধ পেয়ে র‍্যাঞ্চ হাউসে গিয়ে হাজির হয়েছিল রোডা। ওদের আসার খবর কীভাবে পেল জিজ্ঞেস করেও জানতে পারেনি রবিন, জবাব দেয়নি রোডা, শুধু রহস্যময় ভঙ্গিতে মুখ টিপে হেসেছে।

একমনে ডোনাট খেয়ে চলেছে মুসা। রুটির ফাঁক দিয়ে বেরনো জেলি আঙুলে লেগে যাচ্ছে। চেটেপুটে খাচ্ছে সেগুলো।

সেদিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল কিশোর।

রোডা বলল, 'মুসার সাহস আছে। তবে মগজ দিয়ে জেলি বানানোর কথাটা কিন্তু ভুল বলিনি আমি। বুড়ো কিনো লোকটা এমনিতেই উদ্ভট, তার

মগজটা আরও বিগড়ে দিয়ে গেছে ভিনগ্রহবাসীরা।'

'ভিনগ্রহবাসী?' ভুরু নাচাল কিশোর।

'হ্যাঁ এশহরে ভূতপ্রেত দৈত্যদানবের মত ভিনগ্রহবাসীদেরও ভীষণ উৎপাত। ফ্লাইং সসারে করে অতিবুদ্ধিমান ভিনগ্রহবাসীরা এসে যখন-তখন মানুষের নমুনা সংগ্রহ করে। গবেষণাগারে পরীক্ষা করার জন্য বেছে বেছে মানুষ তুলে নিয়ে যায়।'

'আমি ওসব বিশ্বাস করি না,' রবিন বলল।

'এই হলো তোমাদের এক সমস্যা!' ঝাঁঝিয়ে উঠল রোডা। 'এটা বিশ্বাস করি না, ওটা বিশ্বাস করি না। গতবার তো র‍্যাঞ্চ হাউসের ভূতের কথাও বিশ্বাস করনি তুমি আর কিশোর। তারপর যখন পড়লে সামনে…।'

'ফ্লাইং সসার তুমি নিজের চোখে দেখেছ?' প্রশ্ন করল রবিন। যদিও জানে জবাবটা কী হবে।

'দেখেছি মানে? তা হলে আর বলছি কী? শহরের দীঘির ওপরে উড়ছিল। নৌকা নিয়ে মাছ ধরতে বেরিয়েছিল বুড়ো কিনো ফক্স…'

'দাঁড়াও দাঁড়াও,' হাত তুলে বাধা দিল রবিন। 'যদ্দূর মনে পড়ে, তুমি বলেছিলে, দীঘিতে কোন মাছ নেই। ওখানে থাকতে পারেনি বলে সমস্ত মাছ লাফিয়ে তীরে উঠে আত্মহত্যা করেছিল। মাছই যদি না থাকবে মাছ ধরতে যায় কীভাবে?'

'মাছ ধরতে গেছে বলেছি, মাছ ধরেছে তা বলিনি,' নির্বিকার ভঙ্গিতে জবাব দিল রোডা। 'বাগড়া না দিয়ে আসল কথা শোনো। ফ্লাইং সসারটা বুড়োর মাথার ওপর নেমে এল, আকাশে স্থির হয়ে ভেসে রইল, তারপর ভয়ানক একধরনের উঁচু মাত্রার কম্পন তুলল বাতাসে। বললে বিশ্বাস করবে না, ধীরে ধীরে শিয়ালের মুখের মত লম্বা হয়ে গেল বুড়োর মুখ, চোখ দুটো কয়েক ইঞ্চি লম্বা হয়ে বেরিয়ে গেল, কিন্তু কোটর থেকে ছুটল না। ওর নাম ফক্স বলেই বোধহয় চেহারাটাকে শিয়ালের মত করে দিয়ে গেছে ভিনগ্রহবাসীরা।'

'তারপর?' ভুরু নাচাল রবিন।

বিচিত্র ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল রোডা। 'ফ্লাইং সসারটা চলে গেল। মাছ ধরায় ব্যস্ত হলো বুড়ো। আমি শিওর, মাছ নয়, অন্য কিছু ধরতে সেদিন দীঘিতে গিয়েছিল বুড়ো। তবে সেটা কী, জানি না।'

'বুড়ো কিনোর মুখটা কি শিয়ালের মতই হয়ে আছে এখনও?'

'কিছুটা। ওর ওপর ভিনগ্রহবাসীদের চিরস্থায়ী অপারেশন ছিল না ওটা, তাই শিয়াল হওয়া থেকে বেঁচে গেছে,' রোডা বলল। 'তবে পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়নি আর চোয়ালটা। লম্বা হয়ে আছে। দেখলেই বুঝবে অপারেশন চালানো হয়েছিল।'

'অনেক মানুষের চোয়ালই লম্বা থাকে,' রবিন বলল।

'অত থাকে না। যাও না, বিশ্বাস না করলে পিছনের ঘরে গিয়ে উঁকি দিয়ে দেখে এসো না। বুড়ো কিনো এই বেকারিতেই কাজ করে। মুসা যে ডোনাটটা খাচ্ছে, ওটা বুড়োর বানানো। সেজন্যেই সন্দেহটা হচ্ছিল আমার।'

হাল ছেড়ে দিল রবিন। রোডার সঙ্গে কথায় পারা কঠিন। সব প্রশ্নের জবাব তৈরি থাকে মুখে। সাহায্যের আশায় অসহায় ভঙ্গিতে কিশোরের দিকে তাকাল সে। কিন্তু কিশোর চুপ। হতাশ ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল কেবল।

আলোচনাটা থেমে গেল ওখানেই। পাশের টেবিলে একটা পত্রিকা পড়ে থাকতে দেখে খানিকটা অন্যমনস্ক ভঙ্গিতেই হাত বাড়িয়ে তুলে আনল রবিন। একটা খবর পড়ে বলল, 'কিশোর, দেখো, জেটি থেকে একটা পাঁচ বছরের ছেলেকে নাকি তুলে নিয়ে গেছে ভূতে!'

'তাই নাকি?' কৌতূহলী হয়ে হাত বাড়াল কিশোর। খবরটা মনোযোগ দিয়ে পড়ে মুখ তুলল। 'পুলিশ বলছে, ডুবে মারা গেছে। জোয়ারের সময় সেটা হওয়া স্বাভাবিক। বড় বড় ঢেউ জেটিতে আছড়ে পড়ে।'

রোডাও পড়ল। 'পুলিশের কথা বিশ্বাস করছ, ছেলেটার বোনের কথা করছ না কেন? বোনটা তো বলছে, ডুবে মরেনি। লাইটহাউস থেকে ভূতের আলো এসে তুলে নিয়ে গেছে ওর ভাইকে। ওর কথাটাই তো আমার বিশ্বাস হচ্ছে।'

'খাইছে!' চোখ বড় বড় হয়ে গেল মুসার। 'লাইটহাউসের ভূত!'

নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরে ছেড়ে দিল কিশোর।

'লাশ পাওয়া গেছে?' মুসা জানতে চাইল।

'না। পুলিশের ধারণা, ভাটার টানে ভেসে গেছে,' কিশোর বলল।

'গাধার দল!' রেগে উঠল রোডা।

'গাধা বলছ কেন?' বলেই বুঝল রবিন, ভুল করে ফেলেছে। রোডা

এখনই চড়াও হবে তার উপর।

সত্যিই তাই করল রোডা। প্রায় খেউ-খেউ করে উঠল, 'গাধা বলব না তো কী বলব? সহজ কথাটা বুঝতে পারছ না? লাশ পায়নি ওরা। কেন পায়নি? পানিতে ডুবে মরেনি ছেলেটা, তাই। আবারও বলছি, ওর বোনের কথাই ঠিক। ভূতে তুলে নিয়ে গেছে ওর ভাইকে। নিজের চোখে দেখেছে বলেই বলছে, সেটাকেও তোমরা অবিশ্বাস করবে নাকি?'

'ভূতেই নিক আর ঢেউয়েই নিক, ছেলেটা এখন মৃত,' মুসা বলল। 'এনিয়ে তর্ক করে আর লাভ কী?'

মুখ বিকৃত করে ফেলেছে রোডা। 'লাভ কী মানে? ছেলেটা বেঁচেও তো থাকতে পারে।'

রোডার রাগের কারণ বুঝতে পারল না মুসা। ওর দিকে তাকিয়ে চোখ মিটমিট করল। 'সেটা তো খুব ভাল কথা।'

'না!' চেঁচিয়ে উঠল রোডা। 'সেটা ভাল কথা না! বেঁচে থাকলে ও খুব কষ্টে আছে। উদ্ধার পাবার আশায় আছে। আর সেই উদ্ধারটা কেবল আমরাই করতে পারি।'

'আমরা?' তবু আগ্রহী হলো না মুসা।

'হ্যাঁ। পুলিশ কিছু করবে না, ওদের কথাতেই সেটা বোঝা গেছে। আমি ওই মেয়েটার কথা বিশ্বাস করছি। ভূতে নিয়ে যাওয়ার কথাটা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করছি।'

'আমিও করছি,' মুসা বলল। 'কিন্তু ভূতের সামনে আমি যেতে চাই না।'

'ভীতুরাই এভাবে কথা বলে,' এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল রোডা। 'তুমি আমাকে হতাশ করছ, মুসা আমান। তোমার এই কাপুরুষের মত কথা আমার একটুও ভাল লাগছে না।'

রবিন প্রশ্ন তুলল, 'কিন্তু পুলিশ খুঁজে না পেলে আমরা পাব কীভাবে?'

'পুলিশ খুঁজতে চায়নি, সেজন্য পায়নি। ঝামেলার ভয়ে গোটা ব্যাপারটা এড়িয়ে গেছে। এখন বলো, যাবে কিনা!'

'কোথায়?' জানতে চাইল রবিন।

'কারিনাদের বাড়িতে। ওর ভাইকে খুঁজে বের করব। তোমরা আমাকে সাহায্য করবে, না কি করবে না? তোমরা না গেলে আমি একাই যাব,' উঠে

দাঁড়াল রোডা।

কিশোরের দিকে তাকাল রবিন। আবার পত্রিকার খবরটা পড়ছে কিশোর। রবিন জিজ্ঞেস করল, 'কিশোর, রোডা কি বলছে শুনছ?'

মুখ তুলল কিশোর। ঘড়ি দেখল। ঘন ঘন নীচের ঠোঁটে চিমটি কাটল দু'তিন বার। তারপর বলল। 'খুঁজতে যেতে চাচ্ছে তো? আমিও যাব।'

ভুরু কুঁচকে ফেলল মুসা, 'ভূতের সঙ্গে লড়াই করতে যাবে?'

'যাব। অসুবিধে কী?'

'আমার অসুবিধে আছে। আমি যাচ্ছি না। তোমাদের মরতে ইচ্ছে হলে মরোগে।'

রবিনের দিকে তাকাল কিশোর। 'তোমার মরার ইচ্ছে আছে?'

একবার দ্বিধা করে উঠে দাঁড়াল রবিন। 'মরার ইচ্ছে নেই, তবে শেষ দেখার ইচ্ছে আছে।'

রবিনকে উঠে দাঁড়াতে দেখে অস্বস্তিতে পড়ে গেল মুসা। চারজনের মধ্যে তিনজনই ভূত শিকারের পক্ষে। দ্বিধাদ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে সে-ও উঠে দাঁড়াল। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'ভূতের হাতেই যদি মরণ লেখা থাকে, কী আর করা! চলো...'

তিন

বাড়ির বারান্দায় পাওয়া গেল কারিনাকে। কাঠের রকিং চেয়ারে বসে দোল খাচ্ছে। তার বিষণ্ন চেহারা দেখে মায়া লাগল রবিনের। ওদেরকে আসতে দেখেনি কারিনা। শোনেওনি কিছু। নিজের ভাবনায় বুঁদ হয়ে আছে। নিশ্চয় ভাবনা জুড়ে আছে ওর ছোট ভাইটা।

'হ্যাল্লো,' বারান্দায় উঠতে উঠতে বলল রোডা। 'তোমার নাম কি কারিনা টেলার?'

মেয়েটা সুন্দরী। কোমর পর্যন্ত লম্বা সোনালি চুল। ঘন নীল বড় বড় চোখ। সূর্যোদয়ের আগের আকাশের কথা মনে করিয়ে দেয়। এখন লাল। তারমানে ওরা আসার আগে কাঁদছিল।

'হ্যাঁ,' মৃদুস্বরে জবাব দিল কারিনা।

এগিয়ে গিয়ে হাত বাড়িয়ে দিল রোডা। 'আমি রোডালিন ওয়ারনার। বাবা ডাকে প্রিন্সেস। আমার পছন্দ না। বন্ধুদের আমি প্রিন্সেস ডাকতে বারণ করি। রোডা ডাকলেই চলবে। এরা আমার বন্ধু। কিশোর পাশা, মুসা আমান, রবিন মিলফোর্ড। আমাদের দেখে খুব সাধারণ মানুষ মনে হবে তোমার, কিন্তু অত সাধারণ নই আমরা। আমাদের বুদ্ধি আছে, সাহস আছে; আমরা কাজের লোক। বয়েস কম হলেও এই বয়েসেই অদ্ভুত সব ঘটনার মুখোমুখি হয়েছি আমরা। সব কিছু বিশ্বাস করি। ভূতপ্রেত, দৈত্যদানো, ভিনগ্রহবাসী, কোন কিছুকেই ধূর-ধ্যাৎ বলে উড়িয়ে দিই না।' এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে দম নেয়ার জন্য থামল সে। তারপর বলল, 'তোমার ভাইকে খুঁজে বের করে দিতে এলাম আমরা।'

রোডার কথাগুলো হজম করতে সময় লাগল কারিনার। জোরে জোরে দু'বার দোল দিল চেয়ারে। বসতে বলল, 'বোসো না। খাবে কিছু? লেমোনেড?'

'কাজ শেষ করার আগে মক্কেলের কাছ থেকে কিছু খাই না আমরা,' বারান্দায় পেতে রাখা চেয়ারে বসল রোডা।

'আমাকে লেমোনেড দিতে পারো,' রোডার পাশে বসল মুসা। 'হেঁটে এসে গলাটা একেবারে শুকিয়ে গেছে।'

'মুসা,' শপাং করে উঠল রোডার কণ্ঠ, 'এখানে আমরা খেতে আসিনি। কারিনাকে সাহায্য করতে এসেছি।'

'কিন্তু আমার পিপাসা পেলে কী করব?'

'ঠিক,' কিশোর বলল। 'আমারও পেয়েছে।' কারিনাকে জিজ্ঞেস করল, 'কোকটোক কিছু আছে?'

উঠে দাঁড়াল কারিনা। 'লেমোনেড, কোক, সবই আছে। রবিন, তুমি কী খাবে?'

'যা খুশি আনো।'

'রোডা, সত্যি তুমি কিছু খাবে না?'

ভেবে দেখার ভান করল রোডা। 'উঁম। ঠিক আছে, খাওয়াতেই যখন চাইছ, আনো। জিঞ্জার এল্ আছে? আমার পছন্দ ক্যানাডা ড্রাই, সবুজ ক্যান। ঠাণ্ডা, তবে বরফশীতল না।'

মাথা ঝাঁকাল কারিনা। 'দেখি।'

বাড়ির ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল কারিনা। কিশোরের দিকে তাকাল রবিন। 'কী দেখছ?'

হাত তুলে দেখাল কিশোর। 'লাইটহাউসটা।'

রবিনও তাকাল। বাড়ির কোণ ঘেঁষে তাকালে কোনমত চোখে পড়ে লাইটহাউসটা। আধ কিলোমিটার দূরে। লম্বা মোটা একটা থামের মত। সাদা রঙ করা।

মুসাও দেখল। কী জানি কেন, প্রথম দর্শনেই গায়ে কাঁটা দিল তার। অথচ লাইটহাউস আগেও দেখেছে। এরকম তো লাগেনি! বলল, 'ভূতুড়ে!'

'অনেক উঁচু,' রবিন বলল।

'অনেক পুরানো,' কিশোর বলল। 'ওটা বানানোর সময় নিশ্চয় বিদ্যুতের ব্যবহার জানত না মানুষ। ওই সময়কার লাইটহাউসের বাতিতে আধুনিক বৈদ্যুতিক বাল্‌বের পরিবর্তে তেলের বাতি ব্যবহার করা হতো। সাগরের জাহাজকে সেই আলো দেখিয়ে সাবধান করা হতো।'

'আমি শুনেছি ডেথ সিটির লাইটহাউসটাতে মানুষ পুড়িয়ে বাতি জ্বালানো হতো,' রোডা বলল।

'মানুষ পোড়ালে আলো জ্বলে না,' কিশোর বলল। 'আমি শিওর, আমেরিকার অনেক লাইটহাউসের মতই ডেথ সিটির লাইটহাউসটাও স্প্যানিয়ার্ডরাই বানিয়েছিল।'

'পরে নিশ্চয় বিদ্যুতের ব্যবস্থা করা হয়েছিল?' রবিন জানতে চাইল।

'হ্যাঁ,' জবাবটা দিল রোডা। 'গোল্ডেন ডোর সিটির আশেপাশের সাগর খুব বিপজ্জনক। এখনকার আধুনিক জাহাজকেও খুব সাবধানে চলাচল করতে হয়। অথচ লাইটহাউসটা অনেক আগেই বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। কেন, জানতে পারিনি। কোন জাহাজই এখন ডেথ সিটির উপকূলের কাছে ঘেঁষে না। শেষ এসেছিল জাপানী একটা মালবাহী জাহাজ। শত শত টয়োটা গাড়ি বোঝাই করা ছিল ওটাতে। জেটির কাছাকাছি ডুবে গিয়েছিল জাহাজটা। ওই সময় নাকি সৈকতে গিয়ে সহজেই নতুন গাড়ি কুড়িয়ে নেয়া যেত, ক্যামরি কিংবা করোলার মত দামী গাড়ি। অনবরত ঢেউয়ের ধাক্কায় সৈকতে এসে পড়ত গাড়িগুলো। কয়েক মাস ধরেই নাকি চলছিল এরকম

'হুঁ!' নীচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। 'লাইটহাউসটা বন্ধ করে

দেয়ার পিছনে নিশ্চয় কোন কারণ আছে।'

'ভূতের চেয়ে বড় কারণ আর কী হতে পারে,' মুসা বলল।

'ঠিক,' সুর মেলাল রোডা। 'ক্লাসিক কারণ।'

'কিন্তু ভূতুড়েটা হলো কেন, আমি সেটা জানতে চাই,' কিশোর বলল।

ফিরে এল কারিনা। হাতের ট্রে'তে চারটে গ্লাস। তিনটেতে কোক। একটাতে লেমোনেড। বরফের কুচি মেশানো। রোডাকে কোক খেতে অনুরোধ করল সে। জানাল, 'জিঞ্জার এল্ নেই, শেষ হয়ে গেছে।'

'ঠিক আছে, অসুবিধে নেই,' রোডা বলল। 'কোকের ক্যাফেনটা কাজে লাগবে।' গ্লাস তুলে নিয়ে চুমুক দেওয়ার আগে শুঁকে দেখল।

'কী শুঁকছ?' ভুরু নাচাল রবিন। 'মানুষের রক্ত মেশানো কিনা?'

'হেসো না। অবিশ্বাসের কিছু নেই। এটা ডেথ সিটি। একারণেই তো কোক খেতে চাই না আমি। মানুষের রক্ত মিশানো থাকলেও বোঝা যাবে না।'

ঢকঢক করে এক চুমুকে গ্লাসের লেমোনেড শেষ করে ফেলল মুসা। আয়েস করে ঢেকুর তুলে বলল, 'এই গরমের মধ্যে লেমোনেডের কোন তুলনা নেই।'

'দুদিন আগেও কিন্তু ভীষণ ঠাণ্ডা পড়েছিল,' বিষণ্ন কণ্ঠে বলল কারিনা। আবার আগের চেয়ারটাতে বসেছে।

গ্লাসে চুমুক দিল কিশোর। 'তোমার ভাই যখন উধাও হয়ে যায়, তখনও কী আবহাওয়া ঠাণ্ডা ছিল?'

মাথা ঝাঁকাল কারিনা। 'হ্যাঁ। ঝোড়ো বাতাস বইছিল। ঝাপটা দিয়ে ফুলিয়ে দিচ্ছিল ঢেউগুলোকে। ইস্, কেন যে হাঁটতে গিয়েছিলাম জেটির ধারে!'

'কখন গিয়েছিলে?' জানতে চাইল রোডা।

'সূর্য ডোবার সময়। তখন আকাশে মেঘ ছিল। দেখা যাচ্ছিল না, মেঘের জন্য।'

'দুজনেই জেটিতে উঠেছিলে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'না। নিকু একা। একটা পাথরের ওপর বসে ছিলাম আমি। নিকু এর আগেও বহুবার একা একা জেটিতে হেঁটেছে, কিন্তু সেদিন...' গলা ধরে এল কারিনার। মাথা নিচু করল। কান্না ঠেকাল।

'ওই সময় এসে ভূতে ধরল ওকে, তাই না?' রোডার প্রশ্ন।

জোরে দম নিল কারিনা। 'ভূত কিনা জানি না, তবে ভূতুড়ে।'

'পানিতে পড়ে যায়নি তো?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

মুখ তুলল কারিনা। 'উঁহু। পানিতেও পড়েনি। ডুবেও মরেনি। পুলিশকে বার বার বলেছি। মাকেও বলেছি। কেউ বিশ্বাস করেনি আমার কথা।'

'না না, আমরা করছি,' তাড়াতাড়ি বলল কিশোর। 'ভূত হোক বা না হোক, এটুকু বোঝা যাচ্ছে, পানিতে ডুবে মরার মত সাধারণ ঘটনা নয় এটা।'

'সব বিশ্বাস করি আমরা, বললামই তো,' কারিনাকে বলল রোডা। 'কীভাবে নিল তোমার ভাইকে, খুলে বলো তো সব?'

'জেটির ওপর হাঁটছিল নিকু,' কারিনা জানাল। 'হঠাৎ আলো জ্বলে উঠল টাওয়ারের মাথায়। তীব্র, উজ্জ্বল, সার্চলাইটের মত আলো। ঘুরে ঘুরে যেন নিকুকেই খুঁজতে লাগল ওটা। একসময় খুঁজে পেল ওকে। ওর ওপর আলোটা এসে পড়ল। দুটো কুৎসিত হাত বেরিয়ে এল আলোর ভিতর থেকে। নিকুকে জাপটে ধরে শূন্যে তুলে নিল। ওকে নিয়ে সাগরের ওপর চলে গেল আলোটা। তারপর নিভে গেল। নিভে যাওয়ার আগে পানিতে কতগুলো পাথরের ওপর শূন্যে ঝুলে থাকতে দেখেছি ওকে।'

'পুলিশকে এসব বলেছ?' কিশোর জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ। সব।'

'লাইটহাউসে গিয়েছিল পুলিশ?' মুসা জিজ্ঞেস করল। 'ভূতটাকে দেখেছে?'

'না। বিশ্বাসই করেনি আমার কথা. কারিনা বলল 'ওদের যেতে অনুরোধ করেছিলাম। ওরা বলল, লাইটহাউসে ঢোকার পথ তক্তা দিয়ে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। ওটার শেষ কেয়ারটেকার মারা যাবার পর গত তিরিশ বছরে কখনও ওটা থেকে আলো জ্বলতে দেখা যায়নি। ওদের ধারণা. ঢেউয়ের টানে সাগরে পড়ে গেছে নিকু। পানিতে ডুবে গেছে। প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম বলে আমি নাকি ভুলভাল দেখেছি আলোর ব্যাপারটা স্রেফ হ্যালুসিনেশন।'

'ফাঁকিবাজরা আর কী বলবে?' মুখ বাঁকাল রোডা।

'হাত দুটো বেরিয়ে এসে নিকুকে জাপটে ধরার সময় আলোর ভিতরে প্রচণ্ড গর্জন শোনা যাচ্ছিল,' কারিনা জানাল। 'মনে হচ্ছিল কোন দুষ্ট দানব যেন অট্টহাসি হাসছে।'

'দানবটা ছেলে না মেয়ে?' মুসার প্রশ্ন।

'অদ্ভুত প্রশ্ন করলে তো,' রোডা বলল। 'ছেলেমেয়ে দিয়ে কী হবে?'

'দানবের চেয়ে দানবীগুলো বেশি পাজি হয় তো, তাই। পুরুষ দানবগুলোকে সামলানো গেলেও মেয়ে দানবগুলোকে যাবে না, আমি শিওর।'

হেসে রবিন বলল, 'তারমানে বলতে চাইছি দানবী হলে তুমি এর মধ্যে নেই?'

'না,' মাথা নাড়ল মুসা।

মুসার কথাটাকে গুরুত্ব দিয়ে ভেবে বলল কারিনা, 'আমার ধারণা দানবীই।'

'দানবীই হোক আর পেত্নীই হোক,' কারিনার বাহুতে হাত রাখল রোডা, 'চিন্তা কোরো না, তোমার ভাইকে আমরা উদ্ধার করে আনবই।'

'কিন্তু যদি লাইটহাউসে ওকে পাওয়া না যায়?' রবিনের প্রশ্ন।

'তা হলে যেখানে থাকে সেখান থেকেই আনব,' জবাব দিতে এক মুহূর্ত দ্বিধা করল না কিশোর।

কারিনার ঠোঁট কেঁপে উঠল। চোখ ভিজে গেল। 'অনেক ধন্যবাদ তোমাদেরকে। পারো আর না পারো, আমার কথা তো বিশ্বাস করলে। কেউ যে আমার কথা বিশ্বাস করল, এটাই আমার জন্য বিরাট স্বস্তি। আমি জানি নিকু বেঁচে আছে। আমার মন বলছে।' চোখ মুছল সে।

'চলো, এখন। লাইটহাউসে ঢুকব,' কিশোর বলল।

চার

লাইটহাউসে যাওয়ার রাস্তাটা মোটেও ভাল না। সৈকত থেকে সামান্য দূরে পানির মাঝখানে ছোট্ট এক টুকরো জমি। সেখানে তৈরি হয়েছে

লাইটহাউসটা। গোড়ায় আর চারপাশে পাথরের ছড়াছড়ি। লাইটহাউসে যাওয়ার জন্য জেটির অন্য প্রান্ত থেকে সরু একটা কাঠের ব্রিজ বানানো হয়েছে। তক্তাগুলো এতই পুরানো, আর ব্রিজের কাঠামো এতই নড়বড়ে হয়ে গেছে, কেউ উঠলেই এখন ধসে পড়ার সম্ভাবনা আছে।

আশার কথা, সাগর এখন শান্ত। জেটির গায়ে এসে পড়া ঢেউগুলো ছোট ছোট। ব্রিজ ভেঙে নীচের পানিতে পড়ে গেলে সাঁতরে উঠে আসতে খুব একটা অসুবিধে হবে না। কিন্তু অসুবিধে যে আছে সেটা বোঝানোর জন্যই রোডা বলল, 'ঠিক এইখানটাতেই শার্ক তার পা হারিয়েছিল।'

'কোন শার্ক?' জিজ্ঞেস করেই মুসা বুঝল, ভুল করে ফেলেছে। বকবকানির সুযোগ করে দিয়েছে রোডাকে।

'এলান শার্ক,' রোডা বলল। 'ও, ওর কথা বলিনি বুঝি? পানিতে নেমেছিল সাঁতার কাটতে। বোঝো, কী রকম বোকামি। এখানকার সাগরে সাঁতার কাটতে কেউ নামে! তারপর যা ঘটার তাই ঘটল। বিরাট এক সাদা হাঙর এসে এক কামড়ে তার ডান পা'টা কেটে নিল। সত্যি কথা বলতে কি, আমার ধারণা ব্রিজের নীচের ঠিক ওই জায়গাটাতেই নেমেছিল শার্ক।'

রোডার বকবকানিতে কান নেই কিশোরের। লাইটহাউসে কীভাবে যাওয়া যায় সেটা ভাবছে। প্রথমে জেটি পেরোতে হবে। জোয়ারের সময় জেটিটাও বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। ঢেউ এসে গায়ের উপর পড়ে। তবে সরে গিয়ে পাশের উঁচু পাথরের স্তূপে উঠে দাঁড়ালে ঢেউ থেকে বাঁচা যাবে।

'একটা কথা জোর দিয়ে বলতে পারি,' বলেই চলেছে রোডা। 'এখানে পানিতে নামলে আস্ত শরীর নিয়ে উঠে আসতে পারবে না, হাত-পায়ের একআধটা অন্তত খোয়া যাবেই।'

রবিনের দিকে তাকাল কিশোর। 'ব্রিজটার যা দশা। ওঠার ঝুঁকি নেব কিনা বুঝতে পারছি না।'

আড়চোখে রোডার দিকে তাকাল মুসা। 'কম ওজন চাপালে হয়তো ভাঙবে না। মেয়েদের ওজন কম। ওদের একজনকে পাঠিয়ে দেখা যায়।'

'মুসা!' চেঁচিয়ে উঠল রোডা। 'তুমি যে এতবড় কাপুরুষ জানতাম না! মেয়েদের বিপদের মধ্যে ঠেলে দিয়ে নিজে বাঁচতে চাও!'

নির্বিকার ভঙ্গিতে জবাব দিল মুসা, 'বাস্তবতা বোঝার চেষ্টা করো, রোডা। ভুল বলিনি কিন্তু। আমাদের ওজন বেশি। সইতে পারবে না

ব্রিজটা।'

রোডাকে যে খোঁচাচ্ছে মুসা, বুঝতে পারল না কারিনা। 'ঠিক আছে ঠিক আছে, আমিই যাচ্ছি। নিকু আমার ভাই। ঝুঁকিটা সবার আগে আমারই নেয়া উচিত।'

হাসল মুসা। 'থাক, তোমাকে আর যেতে হবে না। আমিই যাচ্ছি।'

বাধা দিল রবিন, 'দাঁড়াও। আমার ওজনও বেশি না। তোমার আর কিশোরের চেয়ে কম। আমিই বরং আগে যাই।'

জেটির শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়াল ওরা।

ওজনটা আসলেই সমস্যা কিনা বোঝার জন্য রবিনের আগেই এগিয়ে গেল মুসা। পা রাখতে গেল নড়বড়ে ব্রিজটার উপর। হাত চেপে ধরল রবিন। 'পাগলামি কোরো না। তোমার ওজন সইতে পারবে না।'

'কিন্তু...'

'ও ঠিকই বলেছে, মুসা,' নীচের নীল পানির দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। ইতিমধ্যেই ঢেউ বেড়ে গেছে। ওরা এসে যখন দাঁড়িয়েছিল, তখনও এতটা ছিল না। 'বাহাদুরি দেখাতে গিয়ে অযথা বিপদে পড়ার কোন মানে হয় না। রবিন, ব্রিজটা ভেঙে পড়লে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পানি থেকে উঠে আসার চেষ্টা করবে।'

মাথা ঝাঁকাল রবিন। বুকের মধ্যে কাঁপুনি শুরু হয়েছে। ব্রিজে পা রাখতে যাবে, এই সময় হাত চেপে ধরল কেউ। ফিরে তাকিয়ে দেখে, কারিনা। কারিনার মুখে উদ্বেগ। ওর নীল চোখে শঙ্কার ছায়া। সাগরের বাতাসে উড়ছে ওর লম্বা সোনালি চুল। প্রায় ফিসফিস করে বলল, 'সাবধান, রবিন!'

হাসল রবিন। 'অকারণে ভয় পাচ্ছ। বিপদের কথা ভাবছ তো? এধরনের ঝুঁকি অনেক নিয়েছি আমরা। এখন বুকের ভেতর ধুকপুক করে, কিন্তু ভয় পাই না।'

ব্রিজের হ্যান্ডরেইল তৈরি করা হয়েছে দড়ি দিয়ে, ধরে ধরে এগোনোর জন্য। কিন্তু সেই দড়ির অবস্থাও মূল ব্রিজের চেয়ে কোন অংশে ভাল না। আস্তে করে প্রথম তক্তাটায় পা রেখে উঠে দাঁড়াল রবিন। চাপ দিয়ে দেখল ভেঙে পড়ে কিনা। পানির দিকে তাকাতে চায় না, তারপরেও চোখ চলে যায়। নিশ্চয়ই ভীষণ ঠাণ্ডা। গভীরও মনে হচ্ছে উপর থেকে। ভালমত

তাকালে হয়তো বড় কোন সামুদ্রিক প্রাণীর ছায়াও নড়তে দেখবে ওই পানির নীচে।

আরেক পা এগোল রবিন। মড়মড় করে উঠল তক্তা। দুলে উঠল ব্রিজ। শরীরের পুরো ওজন পড়েছে এখন ব্রিজের উপর। আরেক পা এগোল। তক্তা মড়মড় করছে। ব্রিজ দুলছে। দ্রুত এগোলে ব্রিজের উপর চাপ কম পড়তে পারে ভেবে আচমকা ছুটতে শুরু করল সে।

আরেকটু হলেই পেরিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু কপাল খারাপ। ও শেষ প্রান্তে প্রায় পৌঁছে গেছে, এই সময় ভেঙে গেল ব্রিজ। একটা দুটো তক্তা নয়, আস্ত ব্রিজটাই ধসে পড়ল। পানিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তলিয়ে গেল। দৌড়ে আসায় ফুসফুস প্রায় খালি। নাকেমুখে ঢুকে গেল নোনা পানি। থাবা দিয়ে, লাথি মেরে, কোনমতে মাথা তুলল পানির উপর। কাশতে আরম্ভ করল। কানে এল অন্যদের হই-চই। নোনা পানিতে চোখ জ্বালা করছে। ভালমত তাকাতেও পারছে না। পানি অকল্পনীয় ঠাণ্ডা।

'রবিন, জলদি ভাগো!' চেঁচিয়ে উঠল রোডা। 'হাঙর আসছে!'

হার্ট অ্যাটাক হয়ে যাবার জোগাড় হলো রবিনের। চোখ মেলে ঘুরে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করল ঠিক কোনখানে রয়েছে। লাইটহাউসটা কাছে, না জেটিটা কাছে, জানে না। তা নিয়ে মাথাও ঘামাল না। চিন্তা এখন একটাই, পানি থেকে ওঠা।

'কই, আমি তো হাঙর দেখছি না,' কারিনা বলল।

ওর কথা যেন শুনতেই পায়নি রোডা। চেঁচিয়ে বলল, 'রবিন! জলদি করো!'

ফিরে তাকাল রবিন। একটা মুহূর্তের জন্য কাশি থামিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'সত্যি হাঙর আসছে?'

কিশোর জানাল, 'আমি দেখতে পাচ্ছি না।'

মুসা বলল, 'আমিও না।'

'দেখার দরকারটা কী?' রোডা বলল। 'হাঙরটা ডুবে আছে। রবিন, কথা না বলে তাড়াতাড়ি করো। যে-কোন মুহূর্তে কামড় টের পাবে পায়ে তখন আর পা বাঁচানোর সময় পাবে না।'

জেটির চেয়ে লাইটহাউসটা কাছে। কোন রকম দ্বিধা না করে ওটার দিকেই সাঁতরাতে শুরু করল রবিন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই পানি থেকে

উঠে এল। ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে এসে দাঁড়াল লাইটহাউসের দরজার কাছে। ফিরে তাকিয়ে ব্রিজটা দেখল। ভাঙা ব্রিজের এক মাথা পানিতে পড়ে ঢেউয়ে দোল খাচ্ছে। আটকা পড়ে গেছে, বুঝল সে। ওপারে যেতে হলে ভয়ঙ্কর ওই ঠাণ্ডা পানি আবার সাঁতরে পেরোতে হবে।

'রবিন, দেখো তো তোমার পা দুটো আস্ত আছে নাকি?' চেঁচিয়ে বলল রোডা।

'আছে,' রোডার ফালতু কথা শুনতে শুনতে বিরক্ত হয়ে গেছে রবিন। 'গায়ের সঙ্গে ঠিকমতই লেগে আছে। অনেক ধন্যবাদ তোমাকে।'

'দরজা খোলার চেষ্টা করো,' কিশোর বলল। 'ভিতরে দড়িটড়ি পাও নাকি দেখো। পেলে আমাদের দিকে ছুঁড়ে দাও।'

দরজায় তালা দেয়া। অবাক হলো না রবিন। বাড়ি মেরে ভেঙে ফেলার জন্য একটা পাথর খুঁজতে লাগল। শীতে কাঁপছে। কাপড়চোপড় সব ভেজা। ভিতরে ঢুকে গা শুকানো দরকার।

পাথর দিয়ে দরজার নবে বাড়ি মারতে শুরু করল সে। কয়েক ঘা দিতেই ভেঙে খুলে পড়ল নব। পুরানো হয়ে গিয়েছিল বলেই এত সহজে খুলতে পারল।

দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে পড়ল সে। অন্ধকার। একটা টর্চ থাকলে ভাল হতো। কয়েক পা এগোল। বুকের মধ্যে আবার বাড়ি মারতে শুরু করেছে হৃৎপিণ্ডটা।

ভ্যাপসা গন্ধ বাতাসে। বহুকাল বন্ধ থাকার কারণে। কাঠের মেঝেতে পুরু ধুলোর আস্তরণ। পায়ের ছাপ পড়ে যাচ্ছে। কাপড় থেকে ফোঁটা ফোঁটা পানি ঝরছে। ভিজে গিয়ে খুদে বল হয়ে যাচ্ছে ধুলো। দরজা দিয়ে আসা আলোয় একটা ঘোরানো সিঁড়ি চোখে পড়ল ওর। ঘুরে ঘুরে লাইটহাউসের চূড়ায় উঠে গেছে সিঁড়িটা। ওপরে অন্ধকার। সিঁড়ির শেষ মাথা দেখা যায় না। মনে হয় ওপরে উঠতে উঠতে আজব এক অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে।

'হ্যালো,' ডাক দিল রবিন।

প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে এল ডাকটা: হ্যালো! হ্যালো! হ্যালো!

ভূতুড়ে প্রতিধ্বনি।

গায়ে কাঁটা দিল ওর। মনে হলো, মুখ ভ্যাংচাচ্ছে ওকে ভূতটা।

বাঁয়ে ছোট একটা স্টোর রুম চোখে পড়ল। একটা বেলচা, এক চাকার

একটা ঠেলাগাড়ি, কেরোসিনের গন্ধ লেগে থাকা কয়েকটা টিন আর এক বান্ডিল দড়ি দেখা গেল সেখানে। টেনেটুনে দড়িটা দেখল। শক্তই আছে। কাজ চলবে। দড়িটা নিয়ে বেরিয়ে এল সে।

'তুমি চলে আসতে চাও?' ডেকে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'না।'

'তাহলে আমরা আসছি।'

অস্বস্তিভরা চোখে পানির দিকে তাকাল রোডা। 'দড়িটা ছিঁড়লে হাঙরের পেটে যাব আমরা সবাই।'

'তোমরা বরং এখানে দাঁড়াও। আমি যাচ্ছি,' কারিনা বলল।

'না, আমরা সবাই যাব।' রোডার দিকে তাকাল কিশোর। 'তবে কারও যেতে ইচ্ছে না করলে যেয়ো না। রবিন, দড়িটা বাঁধো কোন কিছুর সঙ্গে।'

ঘোরানো সিঁড়িটার দিকে ফিরে তাকাল রবিন। যথেষ্ট লম্বা দড়ি। সিঁড়ির গোড়ায় বাঁধার পরেও ওপারে পৌঁছবে। চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'জেটিতে বাঁধার মত কিছু আছে?'

পাথরগুলোর দিকে তাকাল কিশোর। জবাব দিল, 'আছে। তবে নিচু হয়ে যাবে। পানি ছুঁয়ে ঝুলে ঝুলে যেতে হবে। এছাড়া অবশ্য আর করারও কিছু নেই।'

'আমি ভাবছি, পানির কতটা ওপর থেকে শিকার ধরতে পারে হাঙর?' বিড়বিড় করল রোডা।

দড়ির একটা মাথা ছুঁড়ে দিল রবিন। হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলল সেটা মুসা। একটা পাথরের গায়ে পেঁচিয়ে বাঁধতে শুরু করল।

রবিন ঢুকল লাইটহাউসের ভিতর। সিঁড়ির রেলিঙে দড়ির অন্য মাথাটা শক্ত করে বাঁধল। বিস্মিত হয়ে শুনল, একটু আগের তার 'হ্যালো' শব্দটা এখনও যেন অস্পষ্টভাবে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে লাইটহাউসের ভিতর। একটা অদ্ভুত গোঙানির মত শব্দ 'ও-ও-ও!'

আবার বাইরে বেরিয়ে এল সে। পাথরের সঙ্গে ততক্ষণে দড়িটা বেঁধে ফেলেছে মুসা। পানির বেশ কিছুটা উপরে টান টান হয়ে আছে। রবিন জিজ্ঞেস করল, 'প্রথম কে আসছ?'

খপ করে দড়িটা চেপে ধরল কারিনা, 'আমি। কিশোর, কীভাবে যেতে হবে আমাকে বলো তো?'

'হাতে-পায়ে ভর দিয়ে বানরের মত ঝুলে পড়ো,' কিশোর বলল। 'পানির ওপর গিয়ে পা নামাবে না। হাঙর থাকলেও তাহলে আর ধরতে পারবে না তোমাকে। খবরদার, যত কষ্টই হোক, হাত ছাড়বে না।'

'আমি যাই,' মুসা বলল। 'কীভাবে যেতে হয় দেখিয়ে দিই ওকে।'

'না, ও যখন যেতে চাইছে, যাক। তোমার চেয়ে ওর ওজন কম। তুমি ঝুলতে গিয়ে যদি ছিঁড়ে ফেলো, মুশকিল হবে।'

'আমার ওজন তো একটা মুশকিল বাধাল দেখছি! আমি পরে গেলেও তো ছিঁড়তে পারে?'

'পরেরটা পরে। কারিনা, যাও।'

কিশোরের কথামত দড়ি ধরে ঝুলে পড়ল কারিনা। ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগিয়ে চলল। পানির উপর গিয়ে দুই পা উপরে তুলে দিয়ে দড়ি আঁকড়ে ধরল। অনেক নীচে নেমে গেছে দড়ি। কারিনার লম্বা চুলের ডগা ঢেউ ছুঁই ছুঁই করছে। তবে শেষ পর্যন্ত নিরাপদেই অন্য পাড়ে পৌঁছে গেল সে।

কারিনা একেবারে কাছে চলে এলে রবিন বলল, 'আর একটু এগিয়ে পা নামাও।'

পাথরের কাছে পৌঁছে পা নামিয়ে দিল কারিনা। পরিশ্রমে হাঁপাচ্ছে। 'উফ্, কী ভয়টাই না লাগছিল!'

এরপর রোডার পালা।

কারিনার সঙ্গে কথা বলছে রবিন, এই সময় রোডার হাঁক শোনা গেল, 'এই, আমি যে পানির ওপরে চলে এসেছি সে-খেয়াল আছে? প্যাঁচাল বাদ দিয়ে আমাকে দেখো। আমি পড়ে গেলে সাথে সাথে তুলে নেবে।'

এপারে আসতে কারিনার চেয়ে বেশি সময় লাগিয়ে দিল রোডা। দড়িতে ঝুলে থেকেও সারাটা পথ বকবক করতে করতে এল। কথা বলতে এত ভাল লাগে মেয়েটার, ভেবে অবাক লাগল রবিনের।

নিরাপদেই ওদের কাছে এসে দাঁড়াল রোডা। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'আর ফিরে যেতে পারব না। বাপরে, যা কষ্ট!'

'তা পারবে,' রবিন বলল। 'তোমার গায়ে ভূতের জোর! তুমিও মানুষের রূপ ধরে থাকা ডেথ সিটির ভূত কিনা, খোদাই জানে!'

রোডার পর এল কিশোর। মুসাকে আসতে বলল।

দড়ি ধরে ঝুলে পড়ল মুসা। পানির উপর এসে একেবারে ছুঁই-ছুঁই

অবস্থা হলো। কিশোরের মনে হলো এই বুঝি ছিঁড়ল দড়ি। অস্বস্তিটা দূর করার জন্য কারিনার দিকে তাকাল। 'গোল্ডেন ডোর সিটিতে কতদিন ধরে আছো তোমরা?'

'দুই মাস। তুমি?'

'আমরা এখানে থাকি না। বেড়াতে এসেছি। আমার চাচার একটা র‍্যাঞ্চ হাউস আছে। ওখানে উঠেছি।'

'ও। আমরাও আসতাম না, আমার বাবা মারা না গেলে। যে বাড়িটাতে উঠেছি, সেটা আমার দাদুর বাড়ি। একমাত্র সন্তান হিসেবে উত্তরাধিকার সূত্রে বাবা পেয়েছে। আর কোথাও যাবার জায়গা নেই আমাদের।'

'কী নাম ছিল তোমার বাবার?'

'ভিটোরি। ভিটোরি টেলার।'

'নিকু ছাড়া তোমার আর কোন ভাইবোন নেই?'

'না।'

নিরাপদেই পার হয়ে এল মুসা। দড়িটা ছিঁড়ল না দেখে হাঁপ ছাড়ল সবাই। মুসার ভারে যখন ছেঁড়েনি, বোঝা গেল খুব শক্ত। তবে মজাটা হলো, এতজন পানির উপর দিয়ে পার হয়ে এল ওরা, রোডার একটা 'সাদা হাঙরের'ও দেখা মিলল না। হাঙরের ভয় অনেকটা কাটল ওদের।

দল বেঁধে লাইটহাউসে ঢুকল সবাই। স্টোর রুমের জিনিসগুলো বাদ দিলে নীচতলাটা পুরো শূন্য। মাকড়সার জালে ভর্তি। সবখানেই অতিরিক্ত ধুলো। ঘোরানো সিঁড়িটা যেন ওদের অপেক্ষাতেই দাঁড়িয়ে আছে। ব্যঙ্গের হাসি হেসে নীরবে চ্যালেঞ্জ করছে, সাহস থাকলে এসো, আমার গা বেয়ে উঠে যাও উপরের ওই রহস্যময় অন্ধকারে।

উপর দিকে হাত তুলল রবিন। 'টর্চ আনা উচিত ছিল।'

'হ্যাঁ, ভুলই হয়ে গেছে।' একটা সিঁড়ির ধাপ দুই হাতে ধরে টান দিয়ে দেখল কিশোর। 'শক্ত আছে। খুলবে না। ওপরে উঠলে দরজা পাওয়া যাবে। ট্র্যাপডোর জাতীয় কিছু। তবে সেটা বন্ধ।'

'কী করে জানলে?' রোডার প্রশ্ন।

'লাইটহাউসের জানালাগুলোতে বোর্ড লাগানো নেই। জেটি থেকেই দেখেছি। তা হলে আলো আসছে না কেন? দরজা আটকানো বলে, এ তো সহজ কথা।' সিঁড়িতে উঠল কিশোর।

'আমরাও আসব?' ভয়ে ভয়ে সিঁড়িটার দিকে তাকাল রোডা।

'তোমার ভয় লাগলে তুমি এখানে থাকতে পারো,' মুসা বলল। 'অন্ধকারে কোন মানুষ একা থাকলে ভূতগুলো কী করে হরর ফিল্মে দেখেছ না?'

'রাতে ঘুমাতে যাবার আগে হরর ফিল্ম না দেখলে আমার ঘুমই আসে না,' রোডা জবাব দিল। সিঁড়িতে পা রেখে চাপ দিল। 'ভেঙে পড়বে না তো?'

'পড়লে তো আমার ভারেই পড়ত,' কিশোর বলল।

'খোদা, আমার ভাইটাকে যদি এখানে পেয়ে যেতাম!' কারিনা বলল।

এধরনের খাড়া সিঁড়ি বেয়ে ওঠা কষ্টকর। অল্পক্ষণেই হাঁপিয়ে উঠল ওরা। অন্ধকার সমস্যা সৃষ্টি করছে। না দেখে মাঝে মাঝেই মাকড়সার জাল লাগছে মুখে। চমকে দিচ্ছে। রবিন ভাবছে, সাথে একটা লাইটার থাকলেও হতো। কোথায় যাচ্ছে জ্বেলে দেখে নেওয়া যেত। যতই উপরে উঠছে, অন্ধকার বাড়ছে। সেই সঙ্গে বাড়ছে তাপমাত্রা।

থামবে কিনা কিশোরকে জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল রবিন, এই সময় 'আঁউ!' করে উঠল কিশোর। মাথা ডলতে ডলতে জানাল, 'চূড়ায় পৌঁছে গেছি আমরা।'

'দরজা আছে?' রবিন আর কারিনার মাঝখান দিয়ে গলা বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করল রোডা।

'আছে। ট্র্যাপডোর। ওটাতেই মনে হয় বাড়ি খেলাম,' কিশোর বলল। 'তোমরা নোড়ো না। দেখি, আমি খোলার চেষ্টা করি।'

ঠেলেঠুলে দেখল কিশোর। খুলতে পারল না।

'তালা নেই তো?' রবিনের প্রশ্ন।

'মনে হয় না,' জবাব দিল কিশোর। 'অনেক দিন তোলা হয় না তো। জ্যাম হয়ে আটকে গেছে। মুসা, এসো তো। হাত লাগাও। আমি একা পারছি না।'

রবিনের পাশ কাটিয়ে উঠে এল মুসা। অন্ধকারে কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছে না। কেবল অস্পষ্ট কতগুলো ছায়া।

মুসা আর কিশোর ট্র্যাপডোর খোলার চেষ্টা করতে লাগল। অন্ধকারে শুধু হাতড়ানোর শব্দ কানে আসছে অন্য তিনজনের। হঠাৎ ট্র্যাপডোর

তোলার শব্দ হলো। আলো এসে ধাক্কা মারল যেন সবার চোখে মুখে। জানালা দিয়ে আসছে।

ট্র্যাপডোরের ফোকর দিয়ে একে একে উপরে উঠে এল ওরা। লাইটহাউসের চূড়ার ঘর।

এখানেও নীচের মতই ধুলো। মাকড়সার জাল ছড়িয়ে আছে সর্বত্র। ঘরের ঠিক মাঝখানে দাঁড়ানো বিশাল সার্চলাইট। সামনের কাঁচটা নেই। দুটো বাল্‌ব লাগানো। ধুলোয় মাখামাখি।

সার্চলাইটটা দেখল কিশোর। ওটা থেকে বেরিয়ে যাওয়া তারগুলো পরীক্ষা করল। বাল্‌বের আশেপাশে আঙুল বোলাল। গভীর দাগ পড়ে গেল ধুলোতে। গম্ভীর স্বরে জানাল সে, 'বহুকাল জ্বালানো হয়নি এটা।'

প্রতিবাদ জানাল কারিনা, 'কিন্তু দুদিন আগেও তো জ্বলতে দেখেছি।'

'এটাই জ্বলেছিল?'

'তা জানি না। তবে লাইটহাউসের চূড়ার জানালা দিয়ে বেরিয়েছিল। এটা ছাড়া আর কোন্‌টা জ্বলবে?'

কিন্তু কিশোরের সন্দেহ গেল না। 'তোমার কথা বিশ্বাস না করেও পারছি না। কিন্তু তারগুলোর অবস্থা দেখো। কাটা। ছেঁড়া। এগুলোর ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হবে কীভাবে?'

'কিন্তু আমি যে আলো দেখেছি তাতে কোন সন্দেহ নেই,' জোর দিয়ে বলল কারিনা। ঘরের চারপাশে চোখ বোলাল। 'নিকু কই?'

'সবে তো এলাম। খুঁজি। দেখি। তারপর বোঝা যাবে। লাইটহাউসে না থাকলে অন্যখানে খুঁজব।'

'অন্য কোন্‌খানে?'

'পরে ভাবব।'

লাইটটা বাদে ঘরে আছে সাধারণ একটা টেবিল, একটা চেয়ার, একটা চৌকি। বাথরুম দেখে বোঝা যায় বহুকাল এটা ব্যবহার করেনি কেউ। সিংকের উপরের ট্যাপটা বাতিল। চাবিতে মোচড় দিতে পানির বদলে বেরোল আটকে থাকা গ্যাস। গ্যাসের হালকা গন্ধ এসে নাকে লাগল।

টেবিলের কিনারে একটা জিনিস চোখে পড়ল রোডার। পুরানো টেবিলের কাঠ কেটে আঁকা একটা হৃৎপিণ্ডের মত ছবি। তার দুই পাশে দুটো শব্দ লেখা: 'মাম্মি' ও 'টোরি'। দেখে মনে হয় বাচ্চা ছেলের কাজ। মাকে

যে ভালবাসে, সেটা বোঝাতে চেয়েছে।

রোডার দিকে তাকাল কিশোর। 'শেষ কে লাইটহাউসটার দায়িত্বে ছিল, জানো তুমি?'

'জানি,' মাথা ঝাঁকাল রোডা। 'রক্তলোভী এক গলাকাটা নাবিক।'

'আহ্, ইয়ার্কি না। ঠিক কথাটা বলো।'

'আমি ঠিক জানি না। তবে টম বলেছে, লাইটহাউসটার শেষ কেয়ারটেকার ছিল এক মহিলা।'

'টমটা কে?'

'ভবঘুরে। গোল্ডেন ডোর সিটির আদি বাসিন্দাদের একজন। এশহরের এমন কোন তথ্য নেই, যা তার অজানা।'

'তা হলে তো তার কাছেই যাওয়া উচিত। মহিলা কি বেঁচে আছে?'

'না। তার ছেলে নাকি সাগরে ভেসে গিয়েছিল। শোক কাটাতে না পেরে কিছুদিনের মধ্যেই মহিলা মরে যায়।'

'মহিলার নাম কী?'

'জানি না। টমকে জিজ্ঞেস করিনি।'

'হুঁ, টমের কাছে যাওয়াটা জরুরি।'

'গেলেই যে তাকে পাবে, তার কোন নিশ্চয়তা নেই। ভবঘুরে। কখন কোথায় থাকে, ঠিক-ঠিকানা নেই।'

মাথা দোলাল কিশোর। 'হুঁ! তাহলে লাইব্রেরিতেও খোঁজ নিয়ে দেখা যেতে পারে, লাইটহাউসের শেষ কেয়ারটেকারের কোন রেকর্ড আছে কিনা।'

মুখ বাঁকাল রোডা। 'লাইব্রেরি? ওয়াক!'

'কেন, কী হয়েছে লাইব্রেরিতে?'

'লাইব্রেরিতে কিছু হয়নি, তবে লাইব্রেরিয়ান লোকটা আজব! না না, উদ্ভট! সবাই ডাকে মিস্টার স্কেলিটন। কারণ আছে। লাইব্রেরিতে কেউ কার্ডের জন্য গেলে ছবি তোলার ছুতোয় লুকানো এক্স-রে মেশিন দিয়ে দেহের ভিতরের কঙ্কালের ছবি তুলে নেয়। হাড়গুলো দেখে বোঝার চেষ্টা করে ওগুলো সুস্থ আছে কিনা। মরার পর সংগ্রহে রেখে লাভ হবে কিনা। রেফারেন্স রুমে কেউ বই কিংবা পত্রিকা পড়তে ঢুকলে বাইরে থেকে তালা আটকে দেয়। খোদাই জানে, কেন! শেষবার যখন গিয়েছিলাম, আমাকে

দুদিন দুরাত আটকে রেখেছিল। বসে বসে কী আর করব। গত দশ বছরের টাইম ম্যাগাজিনের সমস্ত কপি পড়ে ফেলেছিলাম।'

'ভালই তো,' হেসে বলল কিশোর। 'পড়তে বাধ্য করেছে। এমনিতে তো পড়তে না।'

'লাইব্রেরিতে ঢুকলেই দুধ খাওয়ার জন্য চাপাচাপি শুরু করে,' রোডা বলল। 'কানের কাছে ঘ্যানর ঘ্যানর করতে থাকে, হাড় দেহের খুব মূল্যবান জিনিস। হাড় নষ্ট কোরো না। হয়তো ভাবে, মরার পর ওগুলো তার সম্পত্তি হবে। একবার ওকে চুরি করে কবর থেকে হাড় তুলতেও দেখেছি। শুনেছি, ওর বাড়িতে এক আলমারি হাড় জমিয়েছে লোকটা। অবসর সময়ে খুলে খুলে দেখে।'

'কঙ্কাল নিয়ে গবেষণা করে হয়তো,' উদ্বিগ্ন হলো না কিশোর।

সার্চলাইটের ঘরটা বাদে লাইটহাউসে আর কোন জায়গা দেখতে পেল না ওরা, যেখানে একটা ছেলেকে লুকিয়ে রাখা যায়।

বিষণ্নকণ্ঠে কারিনা বলল, 'নিকুকে কোথায় নিয়ে গেল, বলো তো?'

'সেটা বোঝার জন্য তথ্য দরকার,' কিশোর বলল। 'চলো, বেরোই। টমকে খুঁজব প্রথমে। না পেলে লাইব্রেরিতে যাব।'

সিঁড়িতে নেমে গেল কিশোর। কারিনা পা বাড়িয়েছে, নামতে যাবে ঠিক এসময় জ্বলে উঠল সার্চলাইট। আলোটা সাগরের দিকে তাক না করে করেছে সিঁড়ির দিকে। ফিরে তাকাল কারিনা। তীব্র আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেল। তার বাড়ানো পা'টা ফসকে গেল। পড়ে যেতে শুরু করল। ঠিক পিছনেই ছিল মুসা। থাবা মারল কারিনাকে ধরার জন্য।

নিভে গেল আলো। যেন দুর্ঘটনাটা ঘটানোর জন্যই আলোটা জ্বলেছিল।

হঠাৎ আলো জ্বলে নিভে যাওয়াতে চোখে প্রায় কিছুই দেখছে না মুসা তবে কারিনার একটা হাত ধরেছে, সেটা ছাড়েনি। শূন্যে ঝুলছে কারিনা। উঠে আসার জন্য ছটফট করছে। মুসা এখন হাত ছেড়ে দিলে, কিংবা কোনমতে হাতটা ছুটে গেলে তিরিশ ফুট নীচে গিয়ে পড়বে কারিনা। সাহায্যের জন্য চিৎকার করে কিশোরকে ডাকল মুসা, 'কিশোর, ওকে সিঁড়িতে নামাও!'

'দেখতেই তো পাচ্ছি না কিছু!' জবাব দিল কিশোর। 'আলোটা চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছে।'

ট্র্যাপডোরের পাশ দিয়ে সিঁড়ির বাইরে চলে গেছে কারিনা। পা দিয়ে ধাপ নাগাল পাচ্ছে না।

কিশোরের চোখে ধীরে ধীরে অন্ধকারটা সয়ে এল। উপরের জানালা দিয়ে আসা আলোয় কারিনার ঝুলন্ত পা দুটো অস্পষ্ট দেখতে পেল। সিঁড়ির ধাপ খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে পা ছুঁড়ছে কারিনা।

মুসার পাশে বসে পড়ল রবিন। নীচের দিকে হাত বাড়াল কারিনার হাত ধরার জন্য। রোডাও এসে নীচে ঝুঁকে হাত বাড়াল। 'ভয় নেই কারিনা, তোমাকে আমরা তুলে আনব!'

চেঁচিয়ে উঠল কারিনা, 'আরে করছ কী! আমার হাত ছুটিয়ে দিচ্ছ!'

তাড়াতাড়ি হাত সরিয়ে আনল রোডা। মুসা যে হাত ধরেছে, সেটাই ধরেছিল রোডা। তাড়াতাড়ি সরিয়ে আনল, 'অ্যাঁ, সরি! অন্য হাতটা কই?'

'রবিন, ধরো না!' মুসা বলল। 'পিছলে যাচ্ছে তো! কিশোর, ওর পা ধরো!'

'কারিনা, পা নাড়া বন্ধ করো,' কিশোর বলল। 'হ্যাঁ, ধরেছি।'

'শক্ত করে ধরেছ তো?' মুসা জিজ্ঞেস করল।

'একটা পা ধরেছি। এখনই হাত ছেড়ো না। জায়াগমত এনে নিই,' কিশোর বলল। 'রবিন, দেখো তো অন্য হাতটা ধরতে পারো কি না?'

'চেষ্টা তো করছি। খুঁজে পাচ্ছি না। দেখতেই পাচ্ছি না ভালমত।' পরক্ষণে শোনা গেল রবিনের উল্লসিত চিৎকার। 'ধরেছি!'

'আমিও সিঁড়িতে পা রেখেছি!' প্রায় একই সময় বলে উঠল কারিনা।

মুসা আর রবিন মিলে টেনেটুনে কারিনাকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে আনল। সিঁড়িতে দুই পায়ের ভরই রেখেছে কারিনা। পা ছেড়ে দিল কিশোর। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

এতক্ষণে ওর হাত ছাড়ল মুসা। ফুসফুসে চেপে রাখা বাতাসটা ফোঁস করে ছেড়ে দিয়ে বলল, 'আরেকটু হলেই গেছিল!'

রবিন কারিনার হাতটা ছেড়ে দিয়ে সার্চলাইটের দিকে ঘুরল। 'কিশোর, তুমি বলেছ সার্চলাইটের তার দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হবে না।'

কারিনার পাশ কাটিয়ে সিঁড়ি বেয়ে আবার ঘরে উঠে এল কিশোর। ভালমত পরীক্ষা করল তারগুলো। ঘন ঘন চিমটি কাটছে নীচের ঠোঁটে। আনমনে মাথা নাড়তে লাগল। দেখা শেষ করে সহকারীদের দিকে ঘুরল

সে। 'আমি এখনও বলছি, বিদ্যুৎ প্রবাহিত হওয়া সম্ভব না।'

'জ্বলল কী করে তাহলে?'

'আলো জ্বলার আগে কোন কিছুতে হাত দিয়েছিলে?'

মাথা নাড়ল রবিন। 'না।'

'রোডা?'

'উঁহু!'

'আমিও দিইনি,' মুসা জানাল।

'আর আমি তো নেমেই যাচ্ছিলাম, ধরার প্রশ্নই ওঠে না,' কারিনা বলল।

'তবে একটা শক্তি আছে, যে ওটাকে জ্বালাতে পারে,' রোডা বলল। 'লাইটহাউসের ভূত!'

যেন তার কথাকে সত্যি প্রমাণিত করতেই হঠাৎ শুরু হলো চিৎকার।

হারিকেনের শব্দের মত।

আরেকটা চাপা চিৎকার কানে এল সেই শব্দকে ছাপিয়ে।

'খাইছেরে, ভূত!' বলে এক চিৎকারে সবার পিলে চমকে দিয়ে সিঁড়িতে লাফিয়ে পড়ল মুসা। অন্ধকারে সিঁড়ি থেকে পড়ে ঘাড় ভাঙার পরোয়া করল না। দুপদাপ করে নেমে যেতে শুরু করল।

বাকি কারওই আর থাকার সাহস হলো না। মুসার পিছনে রোডা, তার পিছনে কারিনা, তারপর রবিন, সবার শেষে কিশোর সিঁড়ি বেয়ে দৌড়ে নামতে শুরু করল।

নীচে নামার আগে আর থামল না কেউ। লাইটহাউসের দরজা দিয়ে ছুটে বেরোল। এক এক করে দড়িতে ঝুলে চলে এল জেটিতে। তারপর হাঁপ ছাড়ল।

তবে রহস্যটা খোঁচাতেই থাকল কিশোরকে। এভাবে চলে আসাতে এখন পস্তাচ্ছে। রাগ লাগছে নিজের উপরই। চিৎকারটা তো নিকুও করে থাকতে পারে! ভূতের ভয়ে মাথা গরম না করে দেখে আসা উচিত ছিল।

পাঁচ

টমকে খুঁজে পাওয়া গেল না কোথাও। সুতরাং লাইব্রেরিতে চলে এল তিন গোয়েন্দা। সঙ্গে রোডা ও কারিনা। এজায়গাটাকেও ভূতের বাড়ি বললে ভুল হবে না, মুসার অন্তত সেরকমই লাগছে। রবিনও অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে বাড়িটার দিকে। এত পুরানো যে, মধ্যযুগীয় বলে মনে হচ্ছে।

দরজায় দেখা মিস্টার স্কেলিটনের সঙ্গে। সরু আর লম্বা হতে হতে বাঁকা হয়ে গেছে দেহটা। হাড়গুলো যেন ফেটে বেরিয়ে চলে আসবে কুঁচকানো চামড়ার ভিতর থেকে। বিশাল থাবা। নখগুলো সরু, লম্বা আর ঈগলের নখের মত বাঁকানো। গায়ে বহু পুরানো একটা কালো ওয়েইস্টকোট। এ-ডিজাইন আজকাল আর কেউ পরে না। মাথা নুইয়ে বাউ করে নাটকীয় ভঙ্গিতে লাইব্রেরিতে স্বাগত জানালেন, 'হ্যালো, ছেলেমেয়েরা, এসো এসো। আশা করি তোমাদের হাত দুটো পরিষ্কার আছে, আর মনে কোনও ময়লা নেই। দুধ খাবে এক গ্লাস করে?'

'না, থ্যাংক ইউ,' রোডা বলল। 'জরুরী কিছু তথ্য জানতে এলাম।'

'রোডালিন ওয়ারনার,' উঁকি দিয়ে তাকানোর মত করে রোডার দিকে তাকালেন লাইব্রেরিয়ান। 'আবার তোমাকে দেখে ভীষণ খুশি হলাম।' ঈগলের থাবার মত হাত দিয়ে রোডার একটা হাত চেপে ধরলেন। 'তোমার দেহের হাড়গুলোর অবস্থা এখন কেমন?'

এক পা পিছিয়ে গেল রোডা। 'ভাল। থ্যাংক ইউ। দুধ লাগবে না। দুধ ছাড়াই যথেষ্ট শক্ত আছে আমার হাড়।'

'তা কী মনে করে?'

'আপনার পুরানো খবরের কাগজগুলো দেখতে চাই। যদি দেন। আরেকটা কথা, দয়া করে আমরা রেফারেন্স রুমে ঢুকলে বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে দেবেন না।'

চোখ সরু করে শকুনের মত ঘাড় বাঁকিয়ে ওদের দেখতে লাগলেন মিস্টার স্কেলিটন। চোখে সন্দেহ। 'কাগজ দেখে কী করবে?'

'শুধু পড়ব,' কিশোর বলল। মিস্টার স্কেলিটনের সন্দেহ দূর করার জন্য বলল, 'আরেকটা কথা, দুধ খেতে আপত্তি নেই আমার।'

'আমারও না,' জানিয়ে দিল মুসা।

'তোমরা?'

'ওরা আমার বন্ধু,' রোডা বলল। 'ও কিশোর পাশা, ও রবিন মিলফোর্ড, আর ও মুসা আমান। রকি বীচ থেকে বেড়াতে এসেছে। আর এ হলো কারিনা টেলার। গোল্ডেন ডোর সিটিতে থাকতে এসেছে।'

ভুরু কুঁচকে কারিনার দিকে তাকালেন। 'নামটা চেনা। তোমার ভাইই সেদিন সাগরে পড়ে গেছে না?'

'সাগরে পড়েনি, ভূতে নিয়ে গেছে,' বলতে যাচ্ছিল কারিনা, কিন্তু কিশোরকে ওর দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে ইশারা করতে দেখে থেমে গেল।

ঈগলের থাবা বাড়িয়ে তিন গোয়েন্দার সঙ্গে হাত মেলালেন মিস্টার স্কেলিটন। হাসিমুখে কিশোরকে বললেন, 'তুমি বুদ্ধিমান ছেলে। দুধ না খেলে শিওর অস্টিওপোরোসিসে ভুগবে।' কারিনার দিকে তাকালেন। 'রোগটা কি, জানো?'

'না,' মাথা নাড়ল কারিনা।

'জানতে চাইও না,' রোডা বলল।

মিস্টার স্কেলিটন বললেন, 'হাড়গুলো যখন সব গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাবে, তখন জানতে চাইবে। তখন আর আমার কাছে এসে কোন লাভ হবে না।'

লাইব্রেরির দোতলায় একটা প্রায় অন্ধকার ঘরে ওদেরকে নিয়ে এলেন মিস্টার স্কেলিটন। দুধ আনতে চলে গেলেন। কিশোর আর মুসাকে বকতে লাগল রোডা। তার স্থির বিশ্বাস, দুধের মধ্যে বিষ মিশিয়ে দেবেন মিস্টার স্কেলিটন।

গোল্ডেন ডোর সিটির দৈনিক পত্রিকা 'গোল্ডেন ডিজাস্টার'। এত ছোট একটা শহরে এত বেশি উদ্ভট ঘটনার বহর দেখে অবাক হয়ে গেল কিশোর। প্রতিটি পত্রিকার প্রায় অর্ধেক জায়গা জুড়ে রয়েছে নানা ধরনের দুর্ঘটনার খবর। রোডার একটা কথা অন্তত ঠিক। গোল্ডেন ডোর সিটিতে খুব বেশিদিন কেউ টিকতে পারে না। বেশির ভাগ মৃত্যুর ঘটনাকেই মৃত্যু বলার উপায় নেই, কারণ লাশই পাওয়া যায় না। তাই 'অদৃশ্য হয়ে গেছে' বলে লিখে দেয়া হয়।

অকারণ ঘাঁটাঘাঁটি করে সময় নষ্ট না করে তিরিশ বছর আগের লাইটহাউসের খবর দিয়ে শুরু করতে চাইল কিশোর।

'আসলে কী খুঁজতে এসেছি আমরা?' গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞেস করল রোডা। 'কাগজে ভূতের কথা লেখে না। গোল্ডেন ডিজাস্টারের মত পত্রিকাতেও না।'

দুধ নিয়ে এলেন মিস্টার স্কেলিটন। ট্রে'তে করে পাঁচটা গ্লাস। মনে ক্ষীণ আশা, না না করেও যদি শেষ মুহূর্তে খেতে আগ্রহী হয় রোডা। হাসিমুখে টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। মুখে দিয়েই মুখ বিকৃত করে ফেলল কারিনা। 'কী আছে এর মধ্যে? খড়িমাটি?'

'না, ক্যালসিয়াম পাউডার,' বড় বড় দাঁত বের করে হাসলেন মিস্টার স্কেলিটন। 'হাড় এতটাই শক্ত করে দেবে, কবরে দিয়ে আসার বিশ বছর পরেও নষ্ট হবে না। নতুনের মতই শক্ত আর সাদা থাকবে তোমার হাড়। দেখার মত একটা কঙ্কাল হবে। দুধ খাওয়া মানুষের কঙ্কাল খুব ভাল হয়। টেকে অনেক দিন। সংগ্রহে রাখার মত জিনিস।'

তাড়াতাড়ি গ্লাসটা নামিয়ে রাখল কারিনা। 'আর খাব না। দুধে আমার অ্যালার্জি।'

পুরো একটা ঘণ্টা খবরের কাগজে খুঁজে বেড়াল ওরা। ইতিমধ্যে আরও দু'বার এসে দুধ খাওয়ার জন্য সাধাসাধি করে গেছেন মিস্টার স্কেলিটন। তবে একবার খেয়েই আক্কেল হয়ে গেছে তিন গোয়েন্দার। মানা করে দিয়েছে।

মিস্টার স্কেলিটন শেষবার এসে চলে যাওয়ার সামান্য পরেই লাইটহাউসের খবরটা খুঁজে পেল রবিন।

চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সাগরে
দুটো মর্মান্তিক দুর্ঘটনা

গত শনিবার লাইটহাউসে হঠাৎ করে বিদ্যুৎ চলে গিয়েছিল। ওই সময় 'গার্নি বে' নামে একটা জাহাজ পথ ভুল করে গোল্ডেন ডোর সিটির উপকূলে এসে চোরা পাথরে ধাক্কা খেয়ে ডুবে যায়। ক্যাপ্টেনের নাম মরিস ক্যামেরুন। জাহাজের সঙ্গে ক্যাপ্টেনও ডুবে গিয়ে প্রাণ হারান। তাঁর লাশ খুঁজে পাওয়া যায়নি। লাইটহাউসে কেন বিদ্যুৎ চলে গিয়েছিল তারও কারণ

জানা যায়নি। তবে ধারণা করা হচ্ছে, লাইটহাউসের বাতির নির্দেশনা না দেখাতেই দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিল জাহাজটা।

দ্বিতীয় ঘটনাটা ঘটেছে তার পরদিন বিকেলে। লাইটহাউসের কীপার মিসেস জোয়ানা ট্যাইওরের একমাত্র পুত্র টোরি জেটিতে খেলা করার সময় বিশাল এক ঢেউ এসে ওকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। পাঁচ বছরের টোরিকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। পুলিশের ধারণা ডুবে মারা গেছে ছেলেটা।

খবরটা পড়ে রোডা বলল, 'ক্যাপ্টেনের কাজ!'

কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'ক্যাপ্টেনের কাজ মানে?'

'মানে ক্যাপ্টেনের ভূতের কাজ!' উত্তেজিত হয়ে উঠেছে রোডা। 'বুঝতে পারছ না? ক্যাপ্টেন ক্যামেরুনের ভূত এসে তুলে নিয়ে গিয়েছিল টোরিকে। টোরির মা লাইটহাউসের কীপার থাকা অবস্থায় বিদ্যুৎ চলে গিয়েছিল। আলো না থাকাতে দুর্ঘটনায় পড়েছিল জাহাজটা। নিজের অপঘাতে মৃত্যুর প্রতিশোধ নিয়েছিল ক্যাপ্টেনের ভূত।'

'টোরিকে নিয়েছে প্রতিশোধ নেয়ার জন্য, কিন্তু কারিনার ভাই নিকুকে নিল কেন?'

'তাই তো,' সুর মেলাল কারিনা। 'নিকু তো কিছু করেনি।'

'করেনি, কিন্তু তার বয়েস পাঁচ,' রোডা বলল। 'টোরির বয়েসও ছিল পাঁচ। কোনও কারণে ক্যাপ্টেনের ভূতটার চোখ পড়েছে পাঁচ বছর বয়েসী বাচ্চাদের ওপর। যাকে পাচ্ছে তাকেই তুলে নিয়ে যাচ্ছে। কিংবা হয়তো টোরিকে নেয়ার কথা ভুলেই গিয়েছিল। নিকুকে পেয়ে টোরি ভেবে আরেকবার কিডন্যাপ করেছে। আরও একটা ব্যাপারে মিল আছে। দুজনকে একই সময় কিডন্যাপ করা হয়েছে। সূর্য ডোবার সময়।'

'বড়ই কাকতালীয়!' আনমনে বিড়বিড় করল রবিন।

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

'ভূতের কারবারের চুলচেরা বিশ্লেষণ কিংবা ব্যাখ্যা খুঁজে লাভ নেই,' রোডা বলল। 'তবে বাচ্চা ছিনতাইকারী ভূতের বিরুদ্ধে লেগেছি আমরা, আমার সুনাম বাজি রেখে বলতে পারি।'

'তোমার সুনাম? তাইলে ভরসা কম,' ফোড়ন কাটল মুসা।

রোডাও কড়া জবাব দিতে যাচ্ছিল, বাধা দিল রবিন, 'রোডা, তোমার

কথা ঠিক হলে ভূতটা এখন গার্নি বে জাহাজে থাকার কথা, তাই না? লোকে বলে অপঘাতে মরার পর কেউ ভূত হয়ে গেলে যেখানে মরে সে-জায়গা ছেড়ে যেতে চায় না, কিংবা যেতে পারে না।'

'তা তো ঠিকই?' জবাব দিতে দেরি করল না রোডা।

'কিন্তু জাহাজটা তো এখন পানির নীচে,' যুক্তি দেখাল রবিন। 'ওখানে নিকুকে কোথায় রাখবে?'

'ডুবন্ত জাহাজের ভিতরও বাতাস আটকে থাকতে পারে, যেখানে দম নিয়ে অনেক সময় কয়েক দিনও বেঁচে যায় মানুষ। এর রেকর্ড আছে। তা ছাড়া টাইটানিকের কথা শোননি, জাহাজটায় এমন অনেক কামরা ছিল, যেগুলোতে সামান্যতম পানি ঢুকতে পারেনি। অথচ টাইটানিক ডুবেছিল সেই কতকাল আগে।'

ঘন ঘন নীচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর। রবিন জিজ্ঞেস করল, 'কিশোর, কী ভাবছ?'

'ভাবছি, জাহাজটায় গিয়ে দেখে আসব নাকি একবার?'

'ভূত খুঁজতে? তা যাওয়া যায়। কিন্তু স্কুবা যন্ত্রপাতি লাগবে তো।'

'তা তো লাগবেই। জোগাড় করে নেব। সুপারমার্কেটে নিশ্চয় ভাড়া পাওয়া যাবে।'

'একা যাবে?'

'কেন, যেতে চাও? চলো। আমরা তিনজনে যাই, মেয়েরা থাক। মুসা, তোমার কোন আপত্তি আছে?'

'আছে। আমার ভয় লাগে।'

'হাঙর?'

'না। ভূতের। ভূতুড়ে জাহাজে যেতে আমি রাজি না।'

'কিন্তু ভূতুড়ে লাইটহাউসে তো গেছ।'

'গেছি...কিন্তু...!' যুক্তি খুঁজে না পেয়ে শেষে রাজি হয়ে গেল মুসা, 'আচ্ছা, ঠিক আছে, চলো।'

'ভূতের চেয়ে হাঙরও কিন্তু কম ভয়ানক না,' রোডা বলল।

বাতাসে থাবা মারল কিশোর। 'ধূর, হাঙর! একটাও তো দেখলাম না এখন পর্যন্ত।' দুই সহকারীকে বলল, 'চলো, ডুবুরির পোশাক নিয়ে আসি।'

ইতস্তত করছে রবিন।

কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'কী হলো?'

'হাঙরের কথায় মনে হলো...আচ্ছা, দেখো তো,' প্যান্টের নীচটা উঁচু করে দেখাল রবিন। গোড়ালির কাছে কাটা। রক্ত বেরিয়ে শুকিয়ে আছে। 'ব্রিজ ভেঙে পড়ে গিয়েছিলাম যে, তখন কেটেছে। এই কাটা নিয়ে সাগরে নামা কি উচিত হবে? হাঙর তো বহুদূর থেকে রক্তের গন্ধ পায়। ডাইভিং কোচও বলেছেন, শরীরে কাটাকুটি নিয়ে সাগরে নামা নিরাপদ না...'

গম্ভীর ভঙ্গিতে মাথা নাড়াল কিশোর, 'আসলেই নিরাপদ না। থাক, তোমার নামার দরকার নেই। অকারণ ঝুঁকি নেয়ার কোন মানে হয় না। আমি আর মুসাই যাব।'

নিরাশ মনে হলো রবিনকে। তবে আর কিছু বলল না।

ছয়

ঘণ্টাখানেক পর জেটিতে এনে বোঝা নামাল কিশোর ও মুসা। দুটো স্কুবা ইক্যুইপমেন্ট ভাড়া করে এনেছে সুপারমার্কেটে রোডার পরিচিত এক দোকান থেকে। পুরানো মডেলের জিনিস। এয়ার ট্যাংক সহ সব কিছুই অতিরিক্ত ভারি।

ওয়েট সুট পরতে পরতে মুসার দিকে তাকাল কিশোর। 'কী হলো? পরছ না কেন?'

'দাঁড়াও না, জিরিয়ে নিই। এত ভারি। হাঁপিয়ে গেছি।' হাঙর, ভূত, কোনটার কথাই মন থেকে দূর করতে পারছে না মুসা। ভূতে ধরলে ঘাড় মটকাবে। আর হাঙরে ধরলে হয়তো পা হারাবে। অ্যালান শার্কের মত চিরকাল খোঁড়াতে চায় না সে। ভয়টা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে রোডা।

'জিরানোর অত সময় নেই,' কিশোর বলল। 'এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে। দেখো। রোদ থাকতে থাকতে ফিরে আসতে চাই। যত তাড়াতাড়ি পারব ততই ভাল।'

দ্রুত ডুবুরির পোশাক পরে নিতে লাগল দুজনে। সাহায্য করল রবিন, রোডা ও কারিনা।

সাগরের একশো গজ দূরে হাত তুলে দেখাল কিশোর। 'ওই যে জায়গাটা দেখতে পাচ্ছ, ঘন ঘন রঙ বদলাচ্ছে?'

'হ্যাঁ,' হালকা নীল পানির দিকে তাকিয়ে জবাব দিল মুসা।

'বোঝা যাচ্ছে ওখানেই ডুবো পাহাড়ের শুরু,' কিশোর বলল। 'আর আমার ধারণা ওটার কাছেই কোনখানে ডুবেছে জাহাজটা। অনেকটা জায়গা খুঁজতে হবে আমাদের।'

পুরানো মডেলের গজটার দিকে তাকিয়ে মুসা বলল, 'তিন হাজার পিএসআই রিডিং দিচ্ছে। তারমানে বেশি গভীরে ডুব না দিলে ঘণ্টাখানেকের মত চলবে।'

'হাঙর এলে প্রার্থনা কোরো,' রোডা বলল। 'এছাড়া আর কিছু দিয়েই বাঁচতে পারবে না।'

মুসাকে ভয় পেতে দেখে কিশোর বলল, 'ও তোমাকে ভয় দেখাতে চাইছে। বাদ দাও ওর কথা। নামো।'

পানিতে নামল মুসা। কোমরে বাঁধা ওয়েইট বেল্টের ভারে সঙ্গে সঙ্গে পানিতে ডুবে গেল। কিশোরও নামল। পানি পরিষ্কার। সূর্যের আলোর বর্শাগুলো অনেক গভীরে নেমে গেছে। প্রচুর রঙিন মাছ ঘুরে বেড়াচ্ছে নীচে।

দ্রুত নামছে দুজনে। তিরিশ ফুট নামার আগে থামল না। উপরের তুলনায় এখানে অন্ধকার অনেক বেশি। তবে ডেপ্‌থ্ গজ পড়তে পারছে মুসা। দু'দিকে তিন গজের বেশি নজর চলে না। পাশে ভেসে থেকে হাত তুলে ডুবুরিদের কায়দায় 'ও-কে' সঙ্কেত দিল কিশোর। মুসাও একইভাবে জবাব দিল।

এত ভারি পোশাক পরেছে, কিন্তু পানির নীচে বিস্ময়কর রকম হালকা লাগছে। মনে হচ্ছে মহাশূন্যে ভেসে আছে সে।

গভীর পানির দিকে আঙুল তুলল কিশোর। জেটি থেকে দূরে, ডুবো পাহাড়ের দিকে। মুসাকে অনুসরণ করতে বলল। মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানাল মুসা।

সামনে এগোল ওরা। হাত না নেড়ে শুধু ফ্লিপার নাড়লে দ্রুত এগোনো যায়। ওদের মুখের কাছ থেকে রূপালী বুদবুদ উঠে যাচ্ছে উপরে। মুসা ভাবছে, ওদের এই বুদবুদ জেটিতে যারা রয়েছে, তাদের চোখে কি পড়বে?

দুই মিনিট পর ডুবো পাহাড়ের কাছে পৌঁছে গেল ওরা। পঞ্চাশ ফুট পানির নীচে রয়েছে। গোধূলির মত আলো এখানে। পাথরে তৈরি প্রাচীর এখানে। খোঁচা খোঁচা ধারাল পাথর বেরিয়ে আছে। তার ওপর দিয়ে ভেসে যাবার সময় মুসার মনে হলো চাঁদের পিঠে রয়েছে।

টর্চ জ্বালতে ইশারা করল কিশোর। ছোট টর্চ। আলো অত উজ্জ্বল নয়। সেই আলোতে পাথরের টিলার বড় বড় খাঁজগুলোতে জাহাজটা খুঁজতে লাগল মুসার চোখ।

তিরিশ মিনিট পেরোল। হঠাৎ মুসার মনে হলো, তার পা ঘেঁষে চলে গেল কিছু। চমকে উঠল। ধড়াস করে এক লাফ মারল হৃৎপিণ্ড। হাঙর!

নীচে তাকাল।

হাঙর না। ওয়েইট বেল্টের বাড়ি লাগছে পায়ে। ঠিকমত লাগানো হয়নি বোধহয়, কোমর থেকে খুলে গিয়ে ঝুলছে। পড়ে যাবে। সর্বনাশ হবে তাহলে। পানির নীচে ডুবে থাকতে সাহায্য করে ওই ভার। বেল্ট না থাকলে দেহটা দ্রুত উঠে যাবে উপরে। আর ওভাবে উঠলে ফুসফুস ফেটে যাবে। আতঙ্ক যেন ঢেউয়ের মত ছড়িয়ে গেল ওর শরীরে। তাড়াতাড়ি থাবা দিয়ে ধরতে গেল বেল্টটা। পারল না। যেটুকু লেগেছিল, নড়াচড়ায় তা-ও গেল খুলে। ভারি পাথরের মত নীচে পড়তে শুরু করল।

ভারমুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁকি খেয়ে উপরে উঠতে শুরু করল মুসার দেহ।

এতক্ষণে ব্যাপারটা চোখে পড়ল কিশোরের। জাহাজ খোঁজায় মগ্ন না থাকলে আরও আগেই পড়ত।

মুসাকে ধরে ফেলল সে। নীচে টেনে ধরে রাখল। মুসাও নীচে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। অনেক চেষ্টায় পাথরের দেয়ালের উপর নেমে এল দুজনে। পাথর তুলে তুলে মুসার পকেট ভর্তি করতে লাগল কিশোর। অনেকটা কাজ হলো। আরও কিছু পাথর পকেটে ঠেসে মুসাকে ছেড়ে দিল সে। একই জায়গায় ভেসে রইল মুসা। উপরে উঠছে না আর তার দেহ।

ইঙ্গিতে নীচে দেখাল কিশোর। বোঝাল, ওয়েইট বেল্টটা আনতে যাচ্ছে সে। ইশারায় মুসাকে নড়াচড়া করতে মানা করল।

নীচের অন্ধকার পানিতে অদৃশ্য হয়ে গেল কিশোর।

রীফের কিনারে বসে বসে ভাবতে লাগল মুসা। হাঙরে ভর্তি এরকম

একটা জায়গায় ভূত খুঁজতে আসা কতটা ঠিক হলো! রোডার কথা যদি কিছুমাত্রও ঠিক হয়, সাদা হাঙর যদি থাকে এখানকার পানিতে, তো ভয়ঙ্কর বিপদের সম্ভাবনা। তিন হাজার পাউন্ডের বেশি ওজনের ওই দানবগুলো এক কামড়েই ওকে দিয়ে নাস্তা সেরে ফেলবে। কিশোর যেদিকে গেছে সেদিকে তাকাল সে। এত দেরি করছে কেন?

দশ মিনিট গেল।

পনেরো।

কিশোরের দেখা নেই।

এয়ার গজ পরীক্ষা করল মুসা। পাঁচশো পিএসআই। বাতাসও প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। তাড়াতাড়ি করা দরকার। কিন্তু কিশোরকে রেখে যাওয়াটা ঠিক হবে না। ফিরে এসে ওকে না দেখলে দুশ্চিন্তায় পড়ে যাবে কিশোর। খুঁজতে গিয়ে কোন বিপদে পড়ে কে জানে।

চারশো পিএসআইতে নেমে গেল গজের কাঁটা। তিনশো পিএসআই।

যেটুকু বাতাস অবশিষ্ট আছে এখন ওপরে উঠতেই সেটুকু লেগে যাবে।

কিশোর এল না।

হাঙরে ধরেনি তো ওকে?

কথাটা মনে পড়তে মাস্কের ভিতরে নিজের অজান্তেই গোঙানি বেরিয়ে এল মুসার মুখ থেকে।

এদিক ওদিক তাকাতে গিয়ে চোখে পড়ল ওটা।

জিনিসটা কী প্রথমে নিশ্চিত হতে পারল না সে। ভূতুড়ে কালচে-নীলের মাঝে কেমন সাদা একটা ঝিলিমিলি। ডুবো পাহাড়ের ঢালে কাত হয়ে আছে একটা জাহাজ। বেশি দূরে নয়। ওর বাঁ দিকে। ওটার দিকে পিছন দিয়ে আছে বলেই চোখে পড়েনি এতক্ষণ। ওয়েইট বেল্ট নিয়ে ফিরে আসার সময় কিশোরের চোখে পড়ল নাকি? নিশ্চয় পড়েছে। দেখতে গেছে। আর সেকারণেই ফিরতে দেরি করছে।

দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল মুসা। এক মিনিটের বেশি সময় নেবে না। এর মধ্যে দেখা শেষ করে ফেলবে। তারপর ওপরে উঠতে শুরু করবে। কিশোরকে ওখানে পাক বা না পাক।

ধীরে ধীরে জাহাজটার দিকে সাঁতরে চলল সে।

যতই কাছে যাচ্ছে, বড় লাগছে আরও। একটা মোটর ইয়ট, ষাট-

পঁয়ষট্টি ফুট লম্বা। জাহাজের সামনের দিকের খোলে লম্বা চেরাটা চোখে পড়ল। ধারাল পাথরে ঘষা খেয়ে কেটেছে। ওভাবে কেটে যাওয়াতেই ডুবে গেছে জাহাজটা। পাথরের ওপর পড়ে আছে। এগোতে গিয়ে আরেকটা জিনিস লক্ষ করল মুসা, আলো বাড়ছে। তারমানে উপরের দিকে উঠছে সে। জাহাজের একপাশের অস্পষ্ট লেখাগুলোও এখন পড়তে পারছে। গার্নি বে। জাহাজের নাম। তিরিশ বছরেও পানি পুরোপুরি মুছে ফেলতে পারেনি নামটা।

বাতাস চেক করল মুসা। দুশো পিএসআই।

উপরে ভেসে ওঠা দরকার। এখনই।

উপরের দিকে উঠতে যাবে, এই সময় জাহাজের খোলের কাটা জায়গাটা দিয়ে বুদবুদ বেরোতে দেখল। প্রায় সাড়ে তিন ফুট লম্বা কাটা। বুদ্‌বুদ্‌ কিসের? কিশোরের স্কুবা মাস্কের? জাহাজের ভিতরে ঢুকে আটকে গেল না তো? তাহলে ভীষণ বিপদের মধ্যে রয়েছে কিশোরও। এতক্ষণে তারও বাতাস ফুরিয়ে যাবার কথা।

আরেকটা কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়ে বসল মুসা।

ওই কাটা জায়গা দিয়ে ঢুকে দেখবে।

বুদ্‌বুদ্‌ কিসের, একবার উঁকি দিয়ে দেখেই বেরিয়ে আসবে।

মনে মনে দ্রুত হিসাব করে ফেলল। প্রায় দুশো ফুট পানির নীচে আছে এখন সে। উপরে ওঠার সময় প্রতি পনেরো ফুট উঠে উঠে থামতে হবে। পানির চাপের সঙ্গে সইয়ে নিতে হবে ফুসফুসকে। কিন্তু ট্যাংকে বাতাস যা অবশিষ্ট আছে, তাতে ফোকরে ঢুকে বেরিয়ে এসে উপরে ওঠার সময় পাবে বলে মনে হয় না।

হঠাৎ বেপরোয়া হয়ে উঠল সে। ভয়ডর চলে গেল। যা হয় হোকগে! বন্ধুকে বাঁচানোটাই এখন প্রথম ভাবনা। বেশি জরুরী। মাথা নিচু করে ডাইভ দিয়ে সাঁতরে ঢুকে পড়ল ফোকর গলে।

টর্চটা সামনে বাড়িয়ে রেখেছে। গলুইয়ের কাছে ঢুকেছে সে। স্টোর রুম জাতীয় কোন ঘরে। চারপাশ থেকে তাকে ঘিরে রেখেছে ধাতব দেয়াল। নাড়া লেগে একটা ঝাড়ু আর বালতি উপরে উঠে গেল। টর্চের আলো কমে গেল। টর্চটা কিশোর দিয়েছে ওকে। ব্যাটারি চেক করে নিয়েছিল কিনা কে জানে! যত তাড়াতাড়ি পারা যায় কিশোরকে খুঁজে বের করা দরকার। স্টোর রুমের অনেকখানিই ধ্বংস হয়ে গেছে। ঘরটা থেকে

বেরিয়ে সরু প্যাসেজ ধরে সামনে এগোল সে। নড়াচড়ার জায়গা কম। এখানে আটকে গিয়ে ঘুরতে না পারলে কী ঘটবে ভেবে পেটের ভিতর মোচড় দিয়ে উঠল ওর। জোর করে তাড়াল ভাবনাটা।

লাফ দিয়ে তার সামনে চলে এল কী যেন।

ধারাল দাঁত। বড় বড় চোখ। কুৎসিত মুখ।

চিৎকার করে উঠল মুসা।

হাত থেকে ছুটে গেল টর্চ লাইটটা।

সবকিছু অন্ধকার। ঘন অন্ধকার।

বাঁচার আশা শেষ! মুসার মনে হলো, ভয়ঙ্কর ওই প্রাণীটা এখন তার মুখ খুবলে খাবে। ফোকর বানিয়ে পৌঁছে যাবে মগজের কাছে। খুঁটে খুঁটে বের করে এনে মগজ খাবে। কয়েকটা ভয়ঙ্কর মুহূর্ত যেন বরফ হয়ে গিয়ে ভেসে রইল সে। সাগরের গভীর অতল থেকে উঠে আসা ভয়ানক প্রাণীটার আক্রমণের অপেক্ষা করছে।

কিন্তু সেকেন্ডের পর সেকেন্ড পেরিয়ে গেল, কিছুই ঘটল না। অবশেষে চোখ মেলল সে। দেখল, টর্চটা জ্বলছে। নেভেনি। আতঙ্কে সে চোখ বুজে ফেলাতেই অন্ধকার লাগছিল। তার পায়ের কাছে প্রায় খাড়া হয়ে উপর দিকে মুখ করে ভাসছে ওটা। আলো গিয়ে পড়েছে একটা আলমারির গায়ে।

নিচু হয়ে টর্চটা তুলে নিল মুসা।

আগের জায়গায় ফেলল।

সেই প্রাণীটাকে দেখতে পেল আবার।

আবার চিৎকার করে উঠল।

তারপর চিনতে পারল।

সাগরের তলদেশ থেকে উঠে আসা কোন ভূতুড়ে দানব নয় ওটা। তিন ফুট লম্বা একটা ইলেকট্রিক ঈল, অর্থাৎ বৈদ্যুতিক বাইন। দেখতে অনেকটা সাপের মত। ও যতখানি ভয় পেয়েছে, ওকে দেখে ছোট প্রাণীটা তারচেয়ে বেশি ভয় পেয়েছে। হাত নাড়তেই ছুটে পালাল। তারও বেরিয়ে যাওয়া দরকার। কিশোর যদি এখানে ঢুকেও থাকে, এখন নেই।

সাঁতরে এগোল সে।

ভেবেছিল যেদিক দিয়ে ঢুকেছে সেদিক দিয়েই বেরিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কীভাবে যেন ভুল হয়ে গেল। সাগরে না বেরিয়ে ঢুকে পড়ল আরেকটা বড়

ঘরে।

টর্চের আলো ফেলে দেখল।

কীভাবে করল ভুলটা? অন্য প্যাসেজ দিয়ে ঢুকেছে? তাই তো মনে হচ্ছে। নইলে এখানে এল কেন?

নিশ্চয় চোখ বুজে যখন চিৎকার করছিল, তখনই ঘুরে গিয়েছিল ভুল প্যাসেজটার দিকে। তারপর কোন চিন্তাভাবনা না করে সামনে যে প্যাসেজে দেখেছে সেটা দিয়েই ঢুকে পড়েছে।

মস্ত ঘরটায় অদ্ভুত একটা জিনিস লক্ষ করল সে। বাতাসে ভর্তি। নিজের ট্যাংকে কতখানি বাতাস আছে মিটারে দেখল। সর্বনাশ! ফুরিয়ে গেছে বাতাস। বাইন মাছটা দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল, আতঙ্কিত অবস্থায় স্বাভাবিকের তুলনায় অক্সিজেন বেশি খরচ করেছে দেহ, দ্রুত শেষ হয়েছে সেই কারণেই।

গজে দেখা যাচ্ছে শূন্য পিএসআই।

মুখে লাগানো রেগুলেটরের সাহায্যে জোরে জোরে শ্বাস টেনে বাতাস নেওয়ার চেষ্টা করল।

লাভ হলো না। এক বিন্দু অক্সিজেন পেল না।

মুখ থেকে মাস্কটা টেনে খুলে ফেলল সে। লম্বা দম নিল। ঘরের আটকে পড়া বাতাস তিরিশ বছরের পুরানো। আঁশটে গন্ধ। কিন্তু নষ্ট হয়নি। ফুসফুসকে অক্সিজেন সরবরাহ করতে পারছে। এরকম জটিল অবস্থার মধ্যে পড়ে যাবে কল্পনাই করেনি। ষাট ফুট পানির নীচে আটকা পড়ে আছে। অক্সিজেন ট্যাংক শূন্য। সবচেয়ে খারাপ কথা, ও যে এখানে আছে কেউ জানে না।

টর্চের আলোয় খানিকক্ষণ খুঁজে বেড়াল মুসা।

চোখে পড়ল ভয়ঙ্কর আরেকটা জিনিস। বৈদ্যুতিক বাইন এর কাছে কিছু না।

অনেক অনেক গুণ খারাপ।

একটা পিচ্ছিল খুলি। শ্যাওলায় ঢাকা আস্ত একটা কঙ্কাল।

দুলে দুলে এগিয়ে আসছে ওর দিকে।

চিৎকার করে উঠল মুসা।

থামল না কঙ্কালটা। এগিয়েই আসছে।

সাত

'মুসাকে হারিয়ে ফেলেছি,' জেটিতে উঠে বলল কিশোর।

'কী?' চেঁচিয়ে উঠল রোডা। 'হারালে কী করে?'

একটা পাথরের উপর বসে মাস্ক টেনে খুলল সে। 'ওর ওয়েইট বেল্ট খুলে পড়ে গিয়েছিল। তুলতে গিয়েছিলাম। পাথরের খাঁজে এমনভাবে আটকে গিয়েছিল ওটা, খুলতে দেরি হয়ে গেল। ফিরে এসে যেখানে রেখে গিয়েছিলাম ওকে সেখানে আর দেখলাম না।' চারপাশে তাকাল সে। 'ও এসেছে?'

'আসেনি!' রোডা জানাল।

'বেঁচে আছে তো?' কারিনার মুখ দেখে মনে হলো কেঁদে ফেলবে।

কিশোরও গম্ভীর। বিষণ্ন স্বরে বলল, 'আমার বাতাস ফুরিয়ে গেছে। তারমানে মুসার ট্যাংকেও বাতাস নেই। বাঁচার তো কথা না।' সাগরের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে।

'কিন্তু জায়গা ছেড়ে চলে গেল কেন সে?' রবিনের প্রশ্ন।

'সেটাই তো বুঝতে পারছি না।'

'হাঙরে নেয়নি তো?' রোডা জিজ্ঞেস করল।

'কিছুই জানি না!' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর, 'চলে যাওয়ার একটা কারণই হতে পারে, জাহাজটা চোখে পড়া। এ ছাড়া আর কোন কারণেই জায়গা ছেড়ে নড়বে না সে। হাঙরে নিয়ে যাওয়াটা বিশ্বাস হয় না আমার।'

'তুমি জাহাজটা দেখেছ?'

'না। আমি ওয়েইট বেল্ট নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। ওটা তুলে আনতে আনতেই বাতাস ফুরিয়ে গেল।'

পায়চারি শুরু করল রোডা। ফিরে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তাহলে কী করবে এখন?'

'আমার ধারণা, জাহাজটা চোখে পড়ায় দেখতে গিয়ে ভিতরে ঢুকেছে। আটকে পড়া বাতাস পেলে বেঁচে যাবে। যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে

এখন আমাদের। ওকে উদ্ধার করতে যেতে হবে।'

'আমি যাব,' রোডা বলল।

'না, আমি যাব,' রবিন বলল।

'যেতে পারো, কিন্তু লাভ নেই। কোনখান থেকে হারিয়েছে ও, তোমরা জানো না। আমি জানি। সুতরাং আমারই যাওয়া উচিত। তারচেয়ে তোমরা বরং এক কাজ করো। দৌড়ে গিয়ে আরেকটা এয়ার ট্যাংক নিয়ে এসো। আমি ততক্ষণ জিরিয়ে নিই। সাঁতরে এসে ক্লান্ত হয়ে গেছি।'

একটা সেকেন্ডও দেরি না করে শহরে ছুটল রবিন, রোডা ও কারিনা।

চিৎকার থামিয়ে দিয়েছে মুসা। বুঝল, তার নিজের দোষেই কঙ্কালটা তার দিকে এগোতে শুরু করেছিল। উত্তেজনা আর আতঙ্কে ঘরের বদ্ধ পানিকে নড়িয়ে দিয়েছিল সে, তাতে নড়ে উঠেছিল কঙ্কালটা। পানির ধাক্কা লেগে দুলতে শুরু করেছিল। আর ও মনে করেছিল নিজে নিজে নড়ছে ওটা। পানির দুলুনি থামতেই আবার স্থির হয়ে গেছে ওটা। ভাবল, মিস্টার স্কেলিটনের চোখে পড়লে মহানন্দে এখন পরীক্ষা করতে বসে যেত। বুড়ো নাবিকের তিরিশ বছরের পুরানো শক্ত হাড়গুলো নিশ্চয় খুব পছন্দ হবে লাইব্রেরিয়ানের।

কেউ তাকে উদ্ধার করতে আসছে কিনা জানে না মুসা। মনেপ্রাণে কামনা করছে, আসুক। সামনের ওই কঙ্কালটার সঙ্গী হয়ে তার কঙ্কালও এখানে পানির নীচে বছরের পর বছর ধরে পড়ে থাকবে, কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না সে। কী করলে তার বন্ধুরা তাকে খুঁজে পাবে বুঝতে পারছে না। ইস্, আগে জানলে ফ্লেয়ার গান নিয়ে আসত। আরেকটা ট্যাংক ছাড়া কোনভাবেই উপরে পৌঁছতে পারবে না সে। সুতরাং অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।

কিছুই না করে চুপচাপ বসে থাকলে ভয় চেপে ধরবে। ঘরের মধ্যে কী আছে দেখতে শুরু করল সে। নাবিকের স্বাভাবিক জিনিসপত্র যেমন বই, চেয়ার, খাবারের বাক্স, সুপের টিন এসব আছে। তবে সবচেয়ে বেশি আছে যে জিনিসটা, তা হলো মদ। কেবিন বোঝাই মদ নিয়েছিলেন ক্যাপ্টেন। তাঁর কঙ্কালের আঙুলে এখনও শক্ত করে চেপে ধরা একটা হুইস্কির বোতল। বেঁচে থাকতে বোধহয় সারাক্ষণই ধরে রাখতেন, মৃত্যুর পরও ছাড়েননি।

নতুন ভাবনাটা মাথায় এল মুসার। গার্নি বে জাহাজটার দুর্ঘটনার জন্য কী লাইটহাউসের আলোহীনতাই দায়ী ছিল? নাকি এই মদ? তিরিশ বছর আগের সেই অন্ধকার রাতে নিশ্চয় এতটাই মাতাল ছিলেন ক্যাপ্টেন, তাঁর জাহাজ কোথায় যাচ্ছে, হুঁশ ছিল না। সার্চলাইটটার আলোও হয়তো সেদিন এই দুর্ঘটনাটা বাঁচাতে পারত না। আলো দেখার অবস্থায়ই ছিল না ক্যাপ্টেন। কিন্তু নিজের দোষে দুর্ঘটনা ঘটিয়ে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য নিকুকে যদি তুলে নিয়ে এসে থাকে তাঁর ভূত, মোটেও ন্যায়সঙ্গত হয়নি সেটা।

কিন্তু নিকু কই? এমুহূর্তে জাহাজে আছে বলে মনে হলো না মুসার। কখনও ছিলও না। বেশি কথা বলে ওদের মগজে সন্দেহটা ঢুকিয়েছে রোডা। উফ্, এত প্যাঁচাল পাড়ে মেয়েটা! মাথা গরম করে দেয়! স্বাভাবিক ভাবনাও ভাবতে দেয় না। এখন তার মনে হতে লাগল, ক্যাপ্টেন ক্যামেরুন নিকুর উধাও হওয়ার ব্যাপারে জড়িত নন। উত্তেজিত হয়ে উঠল মুসা। তার এই মূল্যবান আবিষ্কারের কথা বন্ধুদের জানানো দরকার। কিন্তু এখান থেকে বেরোতে পারলে তবে তো জানাবে।

সময় কাটছে। ঠাণ্ডা হয়ে আসছে মুসার শরীর। পরনে ওয়েট সুট আছে বটে, কিন্তু এখন সাঁতার কাটছে না। পরিশ্রমও নেই, গা-ও গরম হচ্ছে না। তাই ঠাণ্ডা পরিবেশে দ্রুত শীতল হয়ে আসছে দেহ।

আরেকটা সমস্যা দেখা দিল। ফুরিয়ে এসেছে টর্চের ব্যাটারি। ডুবন্ত এই জাহাজের কামরাটাকে আলোর মধ্যেও ভূতুড়ে লাগে, আর অন্ধকারে যে কী ভয়ঙ্কর লাগবে কল্পনা করে গায়ে কাঁটা দিল ওর। মানসিক চাপ সহ্য করতে পারবে কিনা সন্দেহ আছে। ঠাণ্ডা যেন বাতাসের সঙ্গে চুইয়ে ঢুকতে আরম্ভ করেছে ফুসফুস আর হৃৎপিণ্ডে। মনে হচ্ছে স্তব্ধ করে দেবে যন্ত্র দুটোকে। সাহায্যের জন্য চিৎকার করার শক্তি পাবে না। বেরিয়ে গিয়ে উপরে ভেসে উঠার চিন্তাটা মাথায় এল আবার। ফুসফুসটা যদি নষ্টই হয়ে যায়, খুব দ্রুত হোক, এভাবে ধীরে ধীরে কষ্ট পেয়ে মরার চেয়ে ভাল।

কিন্তু চিন্তাটা বাস্তবে রূপ দেওয়ার মত বোকামি কিংবা সাহস, কোনটাই করল না সে। যেখানে ছিল, বসে রইল। ফুসফুস ফাটাতে সায় দিল না তার মন। নিশ্চয়ই খুবই কষ্টকর হবে ব্যাপারটা।

আরও সময় গেল। কেঁপে উঠল টর্চের আলো। নিভে গিয়ে আবার জ্বলল।

আবার নিভল। আর জ্বলল না।

'খাইছে!' কথাটা আপনাআপনি বেরিয়ে গেল মুসার মুখ দিয়ে। টর্চটা জোরে জোরে ঝাঁকাতে লাগল। সুইচটা বার বার আগে পিছে করে দেখল জ্বলে কিনা। কিন্তু জ্বলল না।

অন্ধকারে সে একা। সঙ্গী এক মরা নাবিকের কঙ্কাল।

ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি। নানারকম উদ্ভট ভাবনা খেলে যাচ্ছে মগজে।

সময় কাটছে। অসাড় হয়ে আসছে হাত-পা। ঠাণ্ডায় অনুভূতি হারিয়ে ফেলছে সে। ঝিমুনি আসছে। বুঝতে পারছে, মোটেও স্বাভাবিক নয় এটা। যে কোন সময় বেহুঁশ হয়ে যেতে পারে। মাছেরা ওকে ঠুকরে খাবার কথা ভাবতে গলার কাছে কেমন আটকে আসা অনুভূতি হলো। অদ্ভুত আবেগ। পৃথিবীটা বড় নিষ্ঠুর!

মায়ের কথা মনে এল মুসার। বাবার কথা। কেউ কোনদিন জানবে না কোথায় পাওয়া যাবে ওর কঙ্কাল।

বিচিত্র হলুদ আলো চোখে পড়ল তার। এর মানেটা কী? সত্যি আলো দেখছে, নাকি মারা গেছে সে? পরপারের আলো দেখছে?

আলোটা বাড়ছে। উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। খুব উজ্জ্বল। একটা প্রাণী নড়াচড়া করছে। হলুদ আলোওয়ালা এ কোন প্রাণী?

প্রাণীটা মাথা তুলল তার পাশে।

মানুষ!

'কিশোর?' মৃদু স্বরে বলল মুসা। 'তুমি এখানে? তুমিও কি মরে গেছ?'

রেগুলেটর আর মাস্কটা খুলে নিল কিশোর। 'তোমাকে নিতে এলাম।'

বিশ্বাস করতে পারছে না মুসা। ছুঁয়ে দেখল কিশোরকে। 'সত্যি তুমি এসেছ! কল্পনা করছি না তো আমি?'

'না।'

'এত দেরি করলে কেন?'

'রবিন, রোডা আর কারিনা গিয়েছিল এয়ার ট্যাংক আনতে। দোকানদার ভুল করে অন্য গ্যাসের ট্যাংক দিয়ে ফেলেছিল। বদলে আনতে দ্বিগুণ সময় লেগে গেল।' টর্চের আলোয় চারপাশটা দেখল কিশোর। ক্যাপ্টেন ক্যামেরুনের কঙ্কালটা দেখল।

কিশোরকে ক্যাপ্টেনের হাতের হুইস্কির বোতলটার দিকে তাকাতে

দেখে মুসা বলল, 'কিশোর, আমার মনে হয় ক্যাপ্টেন ক্যামেরুন নিকুকে কিডন্যাপ করেননি। ভূতটা লাইটহাউসের ভূতই। আমরা বেরিয়ে আসার সময় আলো জ্বলে উঠেছিল। জেনারেটর বন্ধ ছিল। বিদ্যুৎ পেল কীভাবে? আসলে ভূতে জ্বেলেছিল। বাতি জ্বালানোর জন্য বিদ্যুতের দরকার হয় না ভূতের। অদ্ভুত গর্জনও শুনেছি সেসময়। ওটা ছিল ভূতের গর্জন।'

মাতাল দিশেহারা ক্যাপ্টেনের দোষেই গার্নি বে জাহাজটা ডুবেছে, লাইটহাউসের আলোহীনতার জন্য নয়, মুসার এযুক্তির সঙ্গে একমত হলো কিশোর। কঙ্কালটা সঙ্গে করে নিয়ে যাবে ঠিক করল সে।

'কেন?' মুসার প্রশ্ন।

'এখানে ফেলে যেতে ইচ্ছে করছে না, তাই। নিয়ে গিয়ে মিস্টার স্কেলিটনকে দিয়ে দেব। গবেষণার কাজে লাগবে। মানুষের উপকার হবে। এখানে পড়ে পড়ে নষ্ট হওয়ার চেয়ে ভাল।'

অবাক দৃষ্টিতে কিশোরের দিকে তাকাল মুসা। হাই তুলে বলল, 'ঠিক আছে, তোমার ইচ্ছে হয়েছে, নাও। কিন্তু আগেই বলে দিচ্ছি, আমি ওটা হাতে নিতে পারব না। বাড়তি ট্যাংক আননি?'

'লাগবে না। অকারণ বোঝা টানা। একটাই দুজনে ভাগাভাগি করে নিতে পারব।'

আট

মুসাকে নিয়ে কিশোরকে ফিরতে দেখে খুশিতে আত্মহারা হলো ওদের সঙ্গীরা। পাথরের উপর বসে অধীর হয়ে অপেক্ষা করছিল তিনজনে। লাফ দিয়ে উঠে এল কারিনা। চোখে পানি। তাড়াতাড়ি চোখ মুছল। ভালই লাগল মুসার। কারিনা যে ওর জন্য এত মন খারাপ করবে কল্পনা করেনি। হিরো হওয়ার ঝুঁকি যেমন আছে, পুরস্কারও আছে।

'আমি না থাকলে এখনও তোমাকে মাছের সঙ্গে বাস করতে হতো,' শুরু হয়ে গেল রোডার বকবকানি। 'কিশোর তো যেতেই চায়নি, আমিই বলে কয়ে জোর করে ওকে পাঠালাম। তুমি বেঁচে নেই, ও আশা ছেড়ে

দিয়েছিল। আমি ছাড়িনি। কারিনা আর রবিন তো তোমার শেষকৃত্যের জন্য তৈরি হচ্ছিল।'

'মিথ্যে কথা!' প্রতিবাদ করল কারিনা।

কারিনার কথায় সুর মিলিয়ে রবিন বলল, 'রোডার কথা ঠিক না। আমি জানতাম, তুমি বেঁচে আছো। কিশোর তোমাকে না দেখে ফিরে এসেছিল ট্যাংকের বাতাস ফুরিয়ে গিয়েছিল বলে। নতুন ট্যাংক নিতে এসেছিল।'

মুচকি হাসল কিশোর। 'তর্কাতর্কি বাদ। আমরা ঠিকমত ফিরে আসতে পেরেছি, এটাই আসল কথা। এই দেখো, কাকে নিয়ে এসেছি। মুসা ওকে জাহাজের ভিতর খুঁজে পেয়েছে।'

কিশোরের হাতের কঙ্কালটার দিকে তাকাল রবিন। শ্যাওলা লেগে আছে। চোখের কোটর থেকে ছোট একটা কাঁকড়া বেরোতে দেখে গা গুলিয়ে উঠল ওর। তাড়াতাড়ি চোখ সরাল। 'কার কঙ্কাল?'

'ক্যাপ্টেন ক্যামেরুন।'

'নিকুর কোন খোঁজ পেলে?'

'না,' মুসা জানাল। 'তবে ভুল জায়গায় খুঁজতে গিয়েছিলাম আমরা। ভূতের বাড়ি আসলে জাহাজে না, লাইটহাউসে।'

'কিন্তু ওখানে তো খুঁজে এসেছি আমরা,' রোডা বলল। 'কারিনার ভাইকে দেখিনি।'

'ভালমত খুঁজিইনি, দেখব কীভাবে,' কিশোর বলল। 'ভূত আর সার্চলাইট নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম আমরা। আমরা বেরিয়ে আসার আগে চাপা চিৎকার শুনেছি। ভয় পেয়ে পালিয়ে না এসে দেখা উচিত ছিল। নিকুর চিৎকারও তো হতে পারে। আমি শিওর, সার্চলাইটের ঘরের ওপরে চিলেকোঠা আছে। ওখানেই নিকুকে আটকে রেখেছে ভূতটা।'

'তারমানে আবার যেতে চাও?' কারিনা জিজ্ঞেস করল

'না গেলে পাব কীভাবে?'

লাইটহাউসের দিকে তাকাল কিশোর। টাওয়ারের মত বিল্ডিংটার চূড়াটা দেখছে। 'সার্চলাইটের ঘরের ওপরে খুদে আরেকটা ঘর থাকার জায়গা আছে। দূর থেকেও বোঝা যাচ্ছে। আগেই খেয়াল করা উচিত ছিল আমাদের। অনেক ঝামেলা বাঁচত। যত নষ্টের মূল ভয়। মাথা গুলিয়ে দেয় ঠিকমত ভাবতে দেয় না।'

গায়ে কাঁটা দিল মুসার। 'কিন্তু আমার খিদে পেয়েছে। আর সহ্য করতে পারছি না। নিকুকে কাল খুঁজতে গেলে হয় না? আমার এখন খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে।'

'উঁহু, কাল হয়তো অনেক দেরি হয়ে যাবে,' কিশোর বলল। 'একটা বাচ্চা ছেলেকে ভূতের কাছে ফেলে রাখাটা উচিত হবে না। কখন কী করে ফেলে কে জানে! কষ্ট করেছ। আরেকটু করো। চলো, এখনই যাই। অন্ধকার হওয়ার আগেই।'

'কঙ্কালটা?'

'এখানেই রেখে যাব। অকারণে বোঝা বয়ে লাভ কী?'

'জোয়ারের পানিতে ভেসে যাবে।'

'ওপরে রাখব, পানি সেখানে নাগাল পাবে না।'

'কিন্তু একটা কঙ্কাল নিয়ে এত ভেজাল করছ কেন বুঝতে পারছি না!'

জবাব দিল না কিশোর। স্কুবা ইক্যুইপমেন্ট খুলতে শুরু করল। মুসাকেও খুলতে বলল। ভারি যন্ত্রপাতিগুলো গা থেকে খুলে নামিয়ে রেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল দুজনেই।

আবার দড়িতে ঝুলে জেটি থেকে লাইটহাউসের কাছে চলে এল রোডা, কারিনা ও রবিন। এয়ার ট্যাংক আর অন্যান্য যন্ত্রপাতিগুলো গা থেকে খুলেছে মুসা ও কিশোর, কিন্তু ওয়েট সুট পরাই আছে। দড়ি বাওয়ার চেয়ে পানিতে নেমে সাঁতরে যাওয়া সহজ। কষ্ট অনেক কম। রোডার 'শ্বেত হাঙরের' ভয় মন থেকে দূর করে পানিতেই নেমে পড়ল দুজনে। সাঁতরে নিরাপদে পার হয়ে এল অন্যপাশে।

সূর্য ডুবে গেছে। তবে দিনের আলো আছে এখনও। রোডা ওদের মনে করিয়ে দিল, যত রকমের অঘটন, গোল্ডেন ডোর সিটিতে গোধূলির এসময়টাতেই বেশি ঘটে থাকে। বলল, 'এখানে ভূত দেখার জন্য দুপুর রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় না। দিনের আলোতেও দেখা মেলে ওদের।'

লাইটহাউসের ভিতরে ঢুকে অনেকটা আরাম পেল মুসা। জেটিতে বাতাসের মধ্যে ঠাণ্ডা বেশি লাগে। ঘরের উষ্ণ আবহাওয়ায় কাঁপুনি বন্ধ হলো ওর। লাইটহাউসে ঢুকে এখন আর আগের মত ভয় লাগছে না। নিজেরই অবাক লাগল মুসার। কারণটাও বুঝতে পারল। পানির নীচে অন্ধকারে জাহাজের খোলে কাটানোর পর কোন ভয়কেই আর ভয় মনে

হচ্ছে না ওর।

লম্বা ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল ওরা। পরিশ্রমে অল্পক্ষণেই হাঁপিয়ে গেল সবাই। ঘাম বেরিয়ে এল। কিন্তু কেউ থেমে বিশ্রাম নিতে রাজি নয়। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজ সেরে রাত নামার আগেই বেরিয়ে যেতে চায়।

মিনিট দশেকের মধ্যে ট্র্যাপডোরের কাছে পৌঁছে গেল ওরা। হাত তুলে থামার ইঙ্গিত করল কিশোর। 'শোনো, হঠাৎ করে আবার যদি সার্চলাইট জ্বলে ওঠে, স্রেফ চোখ বুজে ফেলবে। ভয় পেয়ে দৌড় দিতে গিয়ে সিঁড়িতে পা ফসকানো চলবে না। কোনও শব্দ হলে, সেটা কোনখান থেকে আসছে, না দেখে বেরোব না কেউ। ঠিক আছে?'

সবাই একমত হলো।

সার্চলাইটের ঘরে নিরাপদেই উঠে এল ওরা। সার্চলাইট থেকে বেরিয়ে যাওয়া তারগুলো আরও একবার পরীক্ষা করল কিশোর। বাকি সবাই ঘরটাতে খুঁজে দেখতে লাগল। আগের বার চোখ এড়িয়ে গেছে, এমন কিছু চোখে পড়ে কিনা দেখছে। কাঠের গায়ের খাঁজগুলো টর্চের আলোয় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পরীক্ষা করছে রবিন।

হঠাৎ উপরের দিকে দেখিয়ে বলে উঠল, 'কিশোর, তোমার কথাই ঠিক! ট্র্যাপডোর আছে মনে হচ্ছে।'

'কিন্তু উঠব কী করে ওখানে?' রোডার প্রশ্ন। 'খুলব কী করে দরজাটা? নব, হাতল, কোন কিছুই তো নেই।'

টেবিল আর চেয়ারটার দিকে তাকাল কিশোর। 'মুসা, ধরো তো এসে টেবিলটা নিয়ে আসি। তার ওপর চেয়ার তুলে দিয়ে দাঁড়িয়ে দেখি।'

ছাতের দিকে তাকিয়ে আছে রবিন। 'তারপরেও নাগাল পাবে না

'পাব, যদি মুসা চেয়ারের ওপর দাঁড়ায়, আর আমি তার কাঁধে উঠে যাই।'

'পড়লে ঘাড় ভাঙবে,' মুসা বলল। 'আমাকে নিয়ে পড়লে, আমারও

'এ ছাড়া ওপরে ওঠার আর কোন উপায় নেই ঝুঁকিটা নিতেই হবে

'তোমাদের যতই দেখছি, অবাক হচ্ছি আমি,' বিড়বিড় করে বলল কারিনা। 'তিনজনই দুঃসাহসী। তিনজনেই হিরো।'

'আর আমি?' রোডা প্রশ্ন করল।

হাসল কারিনা। 'তোমার দুঃসাহসও কম না।'

'বরং বলো ওদের চেয়ে বেশি,' নিজের প্রশংসা নিজেই করল রোডা।

টেবিলটা টেনে এনে জায়গামত বসানো হলো। উপরে উঠে গেল মুসা আর কিশোর। চেয়ারটা মুসার হাতে দিল রবিন। সাবধানে টেবিলের ঠিক মাঝখানে চেয়ারটা বসিয়ে ঠেলেঠুলে দেখল মুসা, নড়ে কিনা। তারপর উঠে দাঁড়াল। কিশোরকে বলল, 'পড়লে একলা পোড়ো। আমাকে নিয়ে পোড়ো না বলে দিলাম। আর টর্চটা ভাল করে কোমরে গুঁজে নাও।'

টর্চটা কোমরের বেল্টে গুঁজল কিশোর। মুসার দিকে তাকাল। 'তোমার কাঁধে চড়ব কীভাবে?'

'সেটা তুমি জানো,' জবাব দিল মুসা। 'এক কাজ করো। আমার পাশে চেয়ারে চড়ো।' রবিন আর রোডাকে বলল, 'এই, তোমরা দুজন চেয়ারটা ধরে রাখো। কারিনা, তুমি টেবিলটা ধরো। কোনমতেই যেন না নড়ে।' রবিনের দিকে তাকাল। 'উঠেছ। গুড। এখন একটা পা তোলো তো দেখি। আমার হাতের তালুতে রেখে মাথা ধরে বেয়ে উঠে যাও।' দুই হাত দিয়ে একটা ধাপমত বানাল সে। 'খবরদার, আবারও বলছি, পড়লে একলা পড়বে, আমাকে নিয়ে না।'

'সামলাতে না পারলে কী করব?' কিশোর বলল, 'চুল থাকলেও আঁকড়ে ধরতে পারতাম। কান দুটো অবশ্য ধরার চেষ্টা করে দেখতে পারি।'

'ধরলে এমনভাবে ধরবে যাতে না ছেঁড়ে,' সাবধান করে দিল রোডা। 'হাসপাতালে গিয়ে সেলাই করে জোড়া লাগানোর আশা থাকলে ভুলে যাও। গোল্ডেন ডোর সিটির হাসপাতালটা গোরস্থানের পাশে। ওখানে হাসপাতাল বানানোর যথেষ্ট কারণ আছে। যে সার্জন হাসপাতালটা চালান, তাঁর কাজই হলো রোগী গেলে পেটের ভিতরের যন্ত্রপাতিগুলোকে বের করে যখন যেটা সম্ভব কেটে নেয়া। এই তো, কদিন আগে কিটি নামে একটা ছেলে গিয়েছিল টনসিল অপারেশন করাতে। সার্জন তার একটা ফুসফুস কেটে ফেলে দিলেন। শ্বাস নিতে খুব কষ্ট হয় বেচারার। এখন তাকে আমরা দম আটকানো কিটি ডাকি।'

'সার্জনের নাম কী?' মুসা জানতে চাইল।

'ডাক্তার হেনরি মরগানসন,' রোডা বলল। 'তবে হাসপাতালের কর্মচারীরা নাম দিয়েছে ডক্টর কাটার। রোগীর শরীরের যন্ত্রপাতি কেটে

ফেলে দেন তো। মানানসই নাম।'

'গোল্ডেন ডোর সিটির ইতিহাস বাদ দিয়ে একটু কাজে মনোযোগ দিলে কেমন হয়?' অধৈর্য হয়ে বলল কিশোর।

অপমানিত বোধ করল রোডা। 'দেখো, কিশোর, তুমি এশহরে আসা যেহেতু শুরু করেছ একবার, আরও আসবে, জানা কথা। এই আরেক সমস্যা। কী জানি কেন, মানুষকে বড় বেশি আকর্ষণ করে এই শহর। একবার কেউ এলে বার বার আসতে থাকে। না এসে পারে না। তাই বলছিলাম, ডেথ সিটি সম্পর্কে যত বেশি জানবে, তত ভাল, প্রাণ বাঁচাতে সুবিধে হবে। দাঁড়াও, ওই ট্রোলটার গল্প শোনাই...'

'আমি উঠছি,' বাধা দিয়ে রোডাকে থামিয়ে দিল কিশোর। 'মুসা, রেডি?'

হাতের সিঁড়িটাকে শক্ত করল মুসা। 'রেডি। আমার কাঁধের ওপর দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে ছাতে হাত ঠেকিয়ে দেবে। দাঁড়িয়ে থাকতে সুবিধে হবে তাতে, পড়ে যাবে না।'

'দেখো, আবার হাঁচিটাচি দিয়ে বোসো না,' সতর্ক করল কিশোর।

'দেব না।'

'ঠিক আছে।' মুসার হাতে পা রেখে উঠে গেল কিশোর। কাঁধে উঠতে বহু কসরৎ করতে হলো, তবে উঠতে পারল। সোজা হয়ে দাঁড়াতে গিয়ে এমনভাবে দুলতে শুরু করল, আরেকটু হলেই মুসাকে সহ চেয়ার থেকে পড়ত। মেঝেটা মনে হচ্ছে এখন বহু নীচে।

'ছাত ধরো, ছাত ধরো!' উপর দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠল রবিন

ডান হাতটা ছুঁড়ে দিল কিশোর। ছাতে ঠেকাল। মসৃণ ছাতে ধরার মত কিছু পেল না। তবে দুলুনি বন্ধ হয়ে গেল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'গেছিলাম!'

'উহ্, এত্তো ভারি!' নীচ থেকে বলল মুসা। 'জলদি করো। বেশিক্ষণ ভার রাখতে পারব না।'

পরীক্ষা করে দেখার আর প্রয়োজন হলো না কিশোরের খাঁজকাটা জায়গাটায় হাতের তালুর চাপ বাড়াতেই চার ফুট চওড়া একটা ট্র্যাপডোর খুলে উপর দিকে উঠে গেল। ফোকরের কিনারে আঙুল বাধিয়ে চেপে ধরল সে। এক হাতে ধরে রেখে অন্য হাতে কোমর থেকে টর্চটা খুলে আনল

খোলা জায়গাটার ওপাশে আলো ফেলল।

'কিছু দেখতে পাচ্ছ?' উদ্বিগ্নকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল কারিনা।

'অন্ধকার। ভিতরে কী আছে দেখতে হলে ঢুকতে হবে,' জবাব দিল কিশোর।

'সাবধান!' ফিসফিস করে বলল রবিন।

'সাবধান হওয়ার সময় পার হয়ে গেছে,' রোডা বলল। 'এখন আর হয়েও লাভ নেই।'

তার কথায় কান দিল না কিশোর। টর্চটা আবার কোমরে গুঁজে রাখল। দুই হাতই মুক্ত এখন। মুসাকে সোজা হয়ে দাঁড়াতে বলে দুই হাতে ফোকরের কিনারা চেপে ধরল। হাতের উপর ভর দিয়ে টেনে তুলল শরীরটা। কিন্তু পা দুটো ফোকরে ঢোকাতে পারল না। মুসার কাঁধেও রাখতে পারল না আর। শূন্যে ঝুলতে থাকল। কারণ মুসা নেমে গেছে চেয়ার থেকে।

'কী হলো? নামলে কেন?' ঝুলে থাকতে কষ্ট হচ্ছে কিশোরের।

'লাথি লাগবে মাথায়,' মুসা জবাব দিল।

এভাবে বেশিক্ষণ ঝুলে থাকা সম্ভব নয়। হাতের পেশিতে ব্যথা আরম্ভ হয়ে গেছে কিশোরের। আবার ওঠার চেষ্টা করল। বহু কষ্টে একটা পা বাধাতে পারল এবার। ঠেলে দিল ভিতরে। কয়েক সেকেন্ড পরেই অন্ধকার কুঠুরিটার মেঝেতে উঠে বসল সে। জানালা নেই। চাঁদের আলো কিংবা তারার আলো ঢোকার পথ নেই। নীচে উদ্বিগ্ন হয়ে অপেক্ষা করছে সবাই।

'আমার ভাই কি আছে ওখানে?' জিজ্ঞেস না করে আর পারল না কারিনা।

'আরে দাঁড়াও না, দেখে নিই,' কিশোর বলল। টর্চের আলো ফেলে দেখতে লাগল ঘরটা। আলো গিয়ে পড়ল একটা রকিং-চেয়ারের উপর। থেমে গেল ওর হাতটা। কেঁপে উঠল। পলকের জন্য একটা কঙ্কালকে চেয়ারে বসে দোল খেতে দেখল। আলো পড়তেই লাফ দিয়ে উঠে ওর দিকে এগিয়ে এল। চমকে গেল কিশোর। হাত থেকে টর্চ পড়ে গেল। আর পড়ল ট্র্যাপডোরের ফোকর দিয়ে নীচের ঘরে।

ভাগ্যিস টর্চটা পড়তে দেখে সময়মত হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল রবিন। মেঝেতে পড়ার আগেই লুফে নিল।

'কী, ভূত দেখলে নাকি?' জানতে চাইল রোডা।

ফোকরের কিনার খামচে ধরে কান পেতে আছে কিশোর। কঙ্কালের পদশব্দ শোনার জন্য। অভিজ্ঞতা থেকে জানে সে, গোল্ডেন ডোর সিটিতে প্রচুর খারাপ ভূত আছে, যেগুলো মানুষের সঙ্গে শয়তানি করে মজা পায়। বুকের মধ্যে ধড়াস ধড়াস করছে হৃৎপিণ্ডটা। দম আটকে ফেলেছে।

'কী হলো, জবাব দিচ্ছ না কেন?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জানতে চাইল কারিনা।

'সত্যিই ভূত আছে!' কোলা ব্যাঙের স্বর বেরোল কিশোরের মুখ দিয়ে।

'আর কেউ নেই?' রোডা জানতে চাইল।

'ভূতটা তোমার গলা টিপে ধরতে আসছে নাকি?' মুসার প্রশ্ন।

'অন্ধকারে দেখতে পাচ্ছি না,' জবাব দিল কিশোর। নীচে চেয়ার-টেবিল পাতা না থাকলে, ট্র্যাপডোরের ফোকর দিয়ে নীচে লাফিয়ে পড়ত সে। চেয়ারের উপর লাফ দিয়ে উল্টে পড়ে ঘাড় ভাঙবে। ফোকরের কিনার ধরে বসে রইল সে। ঘাড়ের মাংস খোয়ানোর অপেক্ষায় আছে। কিন্তু মিনিটখানেক প্রচণ্ড আতঙ্কের মধ্য দিয়ে পার করে দেওয়ার পরও যখন হাড়সর্বস্ব আঙুলগুলো তার ঘাড় খামচে ধরল না, কঙ্কালের নড়াচড়া শুনল না, কিছুটা সাহস ফিরে পেল সে। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে এল।

'কী হলো, তোমাকে ধরেনি এখনও?' রোডা জিজ্ঞেস করল।

'না, আমি ভাল আছি,' জবাব দিল কিশোর।

'ও নাকি ভাল আছে,' নীচের তিন সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে রোডা বলল। 'ভয়ে প্যান্ট খারাপ করে ফেলেছে, তারপরেও নাকি ভাল আছে।'

রোডার কথায় কান দিল না কিশোর। ডেকে বলল, 'রবিন, টর্চটা ছুঁড়ে দিতে পারবে?'

'দিচ্ছি।' সাবধানে ফোকরের দিকে তাক করে টর্চটা ছুঁড়ে দিল রবিন। প্রথম চেষ্টাতেই ধরে ফেলল কিশোর। রকিং চেয়ারের দিকে আলো ফেলতে ভয় হচ্ছে। কিন্তু প্রবল কৌতূহল এড়াতে পারল না। চেয়ারের দিকে তাক করে টিপে দিল টর্চের সুইচ। একটা মুহূর্ত দ্বিধা করে আবার টর্চ জ্বেলে চেয়ারের দিকে আলো ফেলল সে। আগের মতই চেয়ারে বসে আছে ভূতটা।

ভূতের মধ্যেও খারাপ চেহারার ভূত। মহিলা। লম্বা, খাড়া খাড়া শনের মত চুল। শনের গায়ে সাদা রঙ করে শুকানোর জন্য যেন মাথার চারপাশে

ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। বেগুনি রঙের একটা গাউন পরনে। তেনা হয়ে গেছে। তিরিশ বছর ধরে পোকায় খুঁটে খেয়ে নিশ্চয় ওই চেহারা করেছে। কাঠের চেয়ারটার ভঙ্গুর দশা দেখে মনে হয় যে কোন সময় ধসে পড়বে।

সবচেয়ে ভীতিকর হলো ভূতের মুখটা। নীচের পুরোটা চোয়াল নেই। অবশিষ্ট যা আছে, খুলে ঝুলে রয়েছে নীচের দিকে। দাঁত নেই সবগুলো। যে ক'টা হলদে দাঁত আছে, ফাটা। ময়লা লাগা। শূন্য অক্ষিকোটর দুটো যেন জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে রয়েছে কিশোরের দিকে। কোটরের ভিতরের অন্ধকারটুকু কেমন গভীর আর শীতলতায় ভরা। সেদিক থেকে চোখ সরানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো কিশোর। ওর মনে হতে লাগল, ভূতটা সম্মোহিত করে ফেলেছে তাকে।

মিসেস জোয়ানা ট্যাইওরের ভূত!

লাইটহাউসের শেষ কীপার-কাম-কেয়ার টেকার। হারানো টোরির মা।

'আমার ভাই আছে ওখানে?' নীচ থেকে আবার জিজ্ঞেস করল কারিনা।

'দেখতে পাচ্ছি না,' জবাব দিল কিশোর। 'কিন্তু...'

'কিন্তু কী?' কিশোরের বাক্যটা শেষ করতে দিল না রোডা।

এক পাশে মাথা কাত করল কিশোর। 'একটা শব্দ শুনলাম।'

'কীসের?' নীচ থেকে একসঙ্গে জানতে চাইল চারজনে।

'বুঝতে পারছি না।'

খুব মৃদু শব্দ। বেশি দূরে না। চাপা চিৎকার। সন্দেহজনক মনে হলো কিশোরের। গোল্ডেন ডোর সিটির ক্ষুধার্ত কোন দানব নয় তো? ওত পেতে আছে ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য!

পায়ের শব্দ কানে এল মনে হলো। মুহূর্তের জন্য।

শব্দ লক্ষ্য করে টর্চের আলো ফেলল সে। কেউ নেই মিসেস ট্যাইওরের পাশে।

'কী, হচ্ছেটা কী ওখানে?' অস্থির হয়ে জানতে চাইল রোডা।

'কিছু না,' বিড়বিড় করল বিস্মিত কিশোর।

'ও বলছে কিছু না,' রোডা বলল। 'অথচ টেনশনে রেখে মেরে ফেলার জোগাড় করেছে আমাদের।'

'আমি যাব,' কারিনা বলল।

'তোমার ওজন কত?' কাঁধ ডলতে ডলতে জিজ্ঞেস করল মুসা।

'কিশোর তো আমার কাঁধের বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে।'

'বেশি না। কিশোরের চেয়ে অনেক কমই হবে।'

'তুমি এসে আর কী করবে?' উপর থেকে কারিনাকে বলল কিশোর। 'অতি জঘন্য একটা কঙ্কালকে শুধু বসে থাকতে দেখবে চেয়ারে।'

'নীচে, জেটিতে যেটা ফেলে এসেছি ওটার মত?' রোডার প্রশ্ন।

'ওটার চেয়ে অনেক খারাপ।'

'আমি যাব,' আবার বলল কারিনা। 'আমাকে যেতেই হবে।'

'যাও,' কাঁধ পেতে দেওয়া ছাড়া তার নিস্তার নেই বুঝে দীর্ঘশ্বাস ফেলল মুসা। 'তবে যদি পড়ে যাও, দয়া করে আমার কান খামচে ধরে টেনে ছিঁড়ে নিয়ো না!'

আবার চেয়ারে উঠল মুসা। আগের বারের মতই রোডা ধরে রাখল চেয়ারটা। রবিন ধরল টেবিলটা। মুসার হাতের ধাপে ভর রেখে কাঁধে উঠে গেল কারিনা। উঠতে কিশোরের মত সমস্যা হলো না তার। কারণ ফোকরের কিনারাটা এখন খোলা, ধরতে সুবিধে। তা ছাড়া নিচু হয়ে কিশোর তো হাত বাড়িয়েই রেখেছে।

কিশোরের সহযোগিতায় কারিনাও উঠে গেল। পাশাপাশি বসল দুজনে। চেয়ারে টর্চের আলো ফেলল কিশোর। পুরানো কঙ্কালটার দিকে দম বন্ধ করে তাকিয়ে রইল কারিনা। ফিসফিস করে বলল, 'সত্যিই কুৎসিত!'

'মারা গেলে সবাই কুৎসিত হয়ে যায়,' কিশোর বলল। 'তুমিও হবে।'

'তা ঠিক।'

ঠিক এই সময় একসঙ্গে ঘটে গেল অনেকগুলো ঘটনা।

দড়াম করে লেগে গেল চিলেকোঠার ট্র্যাপডোরের ঢাকনাটা।

খোলার চেষ্টা করল কারিনা।

পারল না। শক্ত হয়ে আটকে গেছে।

নীচে, মুসা, রবিন আর রোডার চোখের সামনে নড়তে শুরু করল সার্চলাইটটা। ধীরে ধীরে উপরে তাক করল। ছাতের দিকে।

'কী হচ্ছে?' চিৎকার করে উঠল রোডা।

জ্বলে উঠল সার্চলাইট।

চোখ ধাঁধানো আলো। দ্রুত পিছিয়ে গেল তিনজনে। সবারই হাত চলে

এল চোখের কাছে। আলোটা এতই তীব্র, ওদের মনে হলো, ছাত ফুঁড়ে চলে যাবে। গেলও তাই। আশ্চর্য! তক্তার ভিতর দিয়ে আলো চলে এল অন্যপাশে। চোখ ধাঁধিয়ে গেল কিশোর আর কারিনারও। ওদের পায়ের কাছে একটা সূর্য জন্ম নিয়েছে যেন। একটানে আলোর কাছ থেকে কারিনাকে সরিয়ে নিল কিশোর।

বাতাসের গর্জন শোনা গেল।

বাড়তে লাগল শব্দটা।

যেন সাইক্লোনের বাতাস ঢুকতে আরম্ভ করেছে চিলেকোঠায়।

কিংবা জেগে উঠছে একটা ভূত।

'ট্র্যাপডোরটা তুমি বন্ধ করেছ?' কিশোর জিজ্ঞেস করল।

'না,' কারিনা জবাব দিল। 'আপনাআপনি বন্ধ হয়েছে।'

হাঁটুতে ভর দিয়ে উবু হয়ে ঢাকনাটা খোলার চেষ্টা করল কিশোর। কারিনার মতই ব্যর্থ হলো। নড়লও না ঢাকনা। এমন করে আটকে গেছে, মনে হচ্ছে যেন পেরেক গেঁথে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

মুসা, রবিন আর রোডার নাম ধরে ডাকতে লাগল কিশোর। জবাব এল না। কিংবা ওরা জবাব দিলেও বাতাসের গর্জনে চাপা পড়ে গেল, শোনা গেল না। উঠে দাঁড়িয়ে চারপাশে তাকাল কিশোর। বাতাসের গর্জনের মত মনে হলেও বাতাসের শব্দ নয়। কারণ চিলেকোঠার ধুলো উড়ছে না। কঙ্কালটার দিকে তাকাল সে।

চোখ ধাঁধানো আলোক রশ্মি যেন ধুয়ে দিচ্ছে ওটার গা। বিচিত্র একটা অবয়ব রূপ নিতে শুরু করল। মনে হচ্ছে ধুলো আর আলোর তৈরি। ধুলোর সঙ্গে যা কিছু পাচ্ছে টেনে নেওয়ার চেষ্টা করছে নিজের ভিতরে। তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠছে গর্জনের শব্দ। কানফাটা পর্যায়ে পৌঁছে গেল। কাঁপতে শুরু করল চিলেকোঠার দেয়াল।

ভূতটাকে ঘিরে তৈরি হচ্ছে একটা ভূতুড়ে আলোর আভা। কোটর থেকে বেরিয়ে আসছে যেন বেগুনি আগুনের শিখা, তবে তাপ নেই ওতে, যেন শীতল আগুন। হাত দুটো লম্বা করে সামনে বাড়িয়ে দিল ভূত। আঙুলগুলো ঈগলের বাঁকা নখের মত ছড়ানো। আঙুলের মাথায় ব্লেডের মত ধারাল নখ। চমকে গেল কারিনা। চিনতে পেরেছে হাত দুটো। নিকুকে তুলে নেওয়ার সময় আলোর মধ্যে ওই নখওয়ালা থাবাই দেখেছে সে।

'ওই ভূতটাই আমার ভাইকে চুরি করেছে!' চেঁচিয়ে উঠল কারিনা।

'তাতে আমি অবাক হইনি।' ঢোক গিলল কিশোর।

উঠে দাঁড়িয়েছে ভূতটা।

কারিনার হাত ধরে ভূতের কাছ থেকে ওকে টেনে সরিয়ে নিল কিশোর।

একটা মুহূর্ত পুরো ঘরটায় খুঁজে বেড়াল যেন ভূতটার জ্বলন্ত চোখ দুটো। তারপর স্থির হলো ওদের উপর। এক পা এগোল। কারিনার হাতটা এখনও কিশোরের হাতে ধরা। টের পেল কারিনা কাঁপছে। তার নিজের অবস্থাও খুব একটা ভাল না।

'কী চায় ওটা?' দম আটকানো গলায় জিজ্ঞেস করল কারিনা।

'আমাদের একজনকে,' জবাব দিল কিশোর। 'কিংবা হয়তো দুজনকেই।'

ঠিক এই সময় একটা চাপা চিৎকার কানে এল ওদের। আগেও দুই-দুইবার শুনেছে ওই চিৎকার। তবে এখন আর অন্য কিছুর চিৎকার বলে ভুল করল না। ছোট্ট ছেলের চিৎকার, কোন সন্দেহ নেই। বন্ধ জায়গা থেকে আসাতে অন্য রকম লাগছে।

মাথার উপর থেকে এসেছে চিৎকারটা।

চিলেকোঠার উপরেও চিলেকোঠা আছে।

'নিকু!' ককিয়ে উঠল কারিনা। 'আমার ভাইয়ের গলা!' কিশোরের হাত থেকে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে ভূতের দিকে এগোল। রাগে চেঁচিয়ে উঠল, 'কুচ্ছিত বুড়ী ভূতনী কোথাকার! আমার ভাইকে ফিরিয়ে দাও!'

'ওকে রাগিয়ে দিয়ো না,' কিশোর বলল। 'অনুরোধের সুরে কথা বলো।'

কিন্তু রাগে মাথা গরম হয়ে গেছে কারিনার। উপরের চিলেকোঠায় একনাগাড়ে চিৎকার করছে তার ভাই। দেয়ালের গায়ে লাগানো মইটা এতক্ষণে চোখে পড়ল কিশোরের। উপরে তুলে ভাঁজ করে রাখা। নিশ্চয় এটা দিয়েই দ্বিতীয় চিলেকোঠাটায় ওঠে। ওটার কাছে পৌঁছতে পারলে হতো। কিন্তু মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে ভূতটা। মেজাজ ভীষণ খারাপ।

ভূতের মুখের কাছে আঙুল তুলে শাসাতে লাগল কারিনা। 'ওকে আটকে রাখার কোন অধিকার নেই তোমার। ও তোমার কোন ক্ষতি

করেনি।' ছাতের দিকে মুখ তুলে চেঁচিয়ে বলল, 'নিকু, চুপ কর্। আমরা আসছি।'

'ওটার পাশ দিয়ে ঘুরে পিছনে যাওয়ার চেষ্টা করো, ভূতটাকে দেখিয়ে কিশোর বলল।

ফিরে তাকাল কারিনা। 'কেন?'

'যা বলছি করো।'

তর্ক করল না কারিনা। ভূতের দিকে ফিরল আবার। ভূতটা রেগেছে। তবে ওদের নিয়ে কী করবে বুঝতে পারছে না যেন। কিশোরের ডান পাশে সরে এল কারিনা। ভূতের নজর ওর দিকে। এই সুযোগ বাঁয়ে কাটার চেষ্টা করল কিশোর।

'নিকুকে ছেড়ে দিন,' কিশোরের পরামর্শমত সুর নরম করল কারিনা। 'তা হলে আর আদালতে যাব না আমি। আপনার বিরুদ্ধে কেস করব না। পুরো ব্যাপারটা ভুলে যাব। ভাব দেখাব যেন কিছুই ঘটেনি।'

কারিনার দিকে মনোযোগ ভূতটার। এমনকী ও নড়লে ভূতও নড়ছে। ও যেদিকে যাচ্ছে, ওটাও যাচ্ছে। সুযোগটা কাজে লাগাল কিশোর। তিন লাফে পৌঁছে গেল মইটার কাছে। নীচের দিকটা ধরে টেনে নামাল। মসৃণভাবে নিঃশব্দে খুলে গেল মইটা। সামান্যতম শব্দও করল না। আনন্দে দুলে উঠল কিশোরের বুক। কোনমতে এখন দ্বিতীয় চিলেকোঠায় উঠে নিকুকে নামিয়ে আনতে পারলে হয়। এক মুহূর্তও দেরি না করে বেরিয়ে যাবে এখান থেকে। হয়তো রাতের খাবারের আগেই পৌঁছতে পারবে বাড়িতে। মইয়ের গোড়াটা মেঝেতে ঠেকিয়ে বেয়ে উঠে যেতে শুরু করল সে। মইয়ের শেষ মাথায় ছাতে লাগানো আরেকটা ট্র্যাপডোরের ঢাকনা। তাতে হুড়কো লাগানো। খুলতে কোনই অসুবিধে হলো না।

উঠে যাচ্ছে কিশোর। আর মাত্র দুটো ধাপ পেরোলেই ঢুকে যাবে চিলেকোঠায়। কিন্তু ভূতটাও অন্ধ নয়।

শক্ত কতগুলো আঙুল চেপে বসল কিশোরের গোড়ালিতে।

নীচে তাকাল সে। কীসে ধরেছে দেখতে চায় না। তারপরেও তাকাতে বাধ্য হলো।

ভূতের জ্বলন্ত চোখ তাকিয়ে আছে তার দিকে। অক্ষিকোটরে যেন বেগুনি আগুনের টুকরো জ্বলছে। অন্য হাতে কিশোরের দ্বিতীয় গোড়ালিটাও

চেপে ধরল ভূত। টানতে শুরু করল। পড়ে যাচ্ছে কিশোর। পা দুটো সরে গেল মইয়ের ধাপ থেকে।

দড়াম করে মেঝেতে পড়ল সে। তীক্ষ্ণ ব্যথা ছড়িয়ে গেল দেহের ডান পাশে। দম নিতে পারছে না। সামলে নেওয়ার আগেই ভূতটা তার উপর এসে ঝুঁকে দাঁড়াল। তিরিশ বছর আগে মরে যাওয়া প্রৌঢ়া মহিলার তুলনায় অতিরিক্ত শক্তি ওটার গায়ে।

হাত ধরে হ্যাঁচকা টানে কিশোরকে মাটি থেকে তুলে নিল ভূতটা। একটা মুহূর্ত সরাসরি ওটার চেহারার দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। বাধা পাচ্ছে না দৃষ্টি। ভূতের মুখ ভেদ করে অন্যপাশে চলে যাচ্ছে। দুর্গন্ধ লাগছে কিশোরের নাকে। ভূতের গা থেকে আসছে। মাথাটা সামান্য পিছনে সরাল ভূত। মুখ হাঁ করল। বিকট গর্জনে কাঁপিয়ে দিল চিলেকোঠা।

'শুনুন,' কিশোর বলল, 'আমি আলোচনা করতে রাজি আছি। আসুন, একটা সমঝোতা করি।'

কিন্তু আলোচনার মেজাজ নেই ভূতের। কিশোরকে প্রায় বয়ে নিয়ে এল দেয়ালের কাছে। এক লাথিতে চিলেকোঠার দেয়ালে গর্ত করে ফেলল। ঠাণ্ডা বাতাস এসে লাগল কিশোরের গায়ে। আবার লাথি মেরে গর্তটা আরও বড় করে ফেলল ভূত। কিশোরকে ঠেলে দিল গর্তের বাইরে। একশো ফুট নীচে ধারাল চোখা পাথরের গায়ে ঢেউ আছড়ে ভাঙতে দেখল কিশোর। বাতাসে চুল উড়ছে তার। ধীরে ধীরে তার হাত থেকে মুঠি খুলে নিচ্ছে ভূতটা। আর বাঁচার উপায় নেই, এবার মরতে হবে!–ভাবছে কিশোর। এত উপর থেকে পড়লে ভর্তা হয়ে যেতে হবে। বাঁচার কোন আশা নেই।

'কিশোর!' ককিয়ে উঠল কারিনা।

কিশোরকে ছেড়ে দিল ভূতটা।

নয়

রবিন, মুসা আর রোডাও বসে নেই তখন। অতিরিক্ত ব্যস্ত। সার্চলাইটটা যখন প্রথম জ্বলেছিল, প্রায় অন্ধ হয়ে গিয়েছিল ওরা, হোঁচট খেয়ে পড়তে

পড়তে বেঁচেছে। এবার রোডা পড়তে যাচ্ছিল ট্র্যাপডোরের ফোকরে। কিন্তু মুসার গায়ে ধাক্কা লাগায় বেঁচে গেছে। ট্র্যাপডোরের ঢাকনাটা লাগিয়ে দেওয়া দরকার।

'ঘটনাটা কী?' রোডার প্রশ্ন। 'কীসের গর্জন?'

'ভূতটা বোধহয় জেগে গেছে,' মুসা বলল। চোখের সামনে হাত তুলে আলো আড়ালের চেষ্টা করছে।

মাথার উপরে চিৎকার শুনতে পেল। কী বলছে বুঝল না। রোডা বলল, 'কিশোরকে বাঁচানো দরকার।'

'আর কারিনাকে?' রবিন জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ, ওকেও বাঁচানো দরকার। চিলেকোঠায় উঠতে হবে। জলদি!'

'না,' বাধা দিল রবিন। 'ভূতটা আছে ওখানে। ভূতের সঙ্গে আটকা পড়েছে ওরা। আমরা গেলে আমরাও আটকা পড়ব।'

'তুমি একটা কাপুরুষ,' রেগে গেল রোডা। 'ওখানে থাকলে মরবে ওরা। ফেলে যেতে পারি না।'

'কে বলল ফেলে যাব? আমি বলছি, ভূতটা খুব শক্তিশালী। নিকুকে জেটির কাছ থেকে তুলে এতদূর নিয়ে এসেছে। ওটার ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে আঘাত হানতে হবে আমাদের।'

'সেটা আবার কী?'

চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বল আলোটা দেখাল রবিন। 'এটা। যতবার ভূতটা আসে, সার্চলাইট জ্বলে ওঠে। এটার জ্বলার সঙ্গে ভূতের আগমনের সম্পর্ক রয়েছে। নিভিয়ে দিলে হয়তো ভয় পাবে ভূতটা। চলে যেতে পারে।'

'তাই তো! ঠিকই তো বলেছ!' চেঁচিয়ে উঠল রোডা। 'বাল্‌বটা ভেঙে দিই।'

বলা খুব সহজ। কিন্তু চেয়ার তুলে বাড়ি মেরে যখন ভাঙতে চাইল মুসা, সার্চলাইটের কাছেই নিতে পারল না। আলোকরশ্মির গায়ে এমনভাবে গিয়ে লাগল চেয়ারটা, মনে হলো কঠিন কোন জিনিসে বাড়ি খেল। নিজের দুর্বল জায়গাটার চারপাশে অদৃশ্য শক্ত আবরণ তৈরি করে রেখেছে ভূতটা। ভেঙে ছড়িয়ে পড়ল কাঠের টুকরো। তাল সামলাতে না পেরে পড়ে যাচ্ছিল মুসা, দুদিক থেকে ধরে ফেলল রোডা ও রবিন।

'সার্চলাইটটাও ভূতুড়ে,' রোডা বলল।

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মাথা ঝাঁকাল মুসা। 'ভূতের সার্চলাইট ভূতুড়েই তো হবে।'

'কিন্তু নষ্ট করার কোন উপায় তো নিশ্চয় আছে,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল রবিন।

'ভূতের সঙ্গে পারা যাবে না,' হতাশকণ্ঠে বলল মুসা।

'কিন্তু আমি তা মনে করি না। নীচের স্টোর রুমে কেরোসিনের টিন আছে। আমি তখন দেখার সুযোগ পাইনি, কিন্তু আমার ধারণা লাইটহাউসের জেনারেটরটা কেরোসিন দিয়ে চালানো হয়। হয়তো ওই স্টোর রুমেই আছে ওটা। ওটা থেকে তার এসে ঢুকেছে মেঝের নীচ দিয়ে সার্চলাইটের ভিতর।'

'তো কী করতে চাও?' রোডা জানতে চাইল।

'নীচে নেমে জেনারেটরটা নষ্ট করে দেব। তাতে হয়তো সার্চলাইট নিভবে। থামিয়ে দেবে ভূতটাকে।'

'ভাল বুদ্ধি। তুমি জেনারেটর নষ্ট করতে গেলে আমরা ততক্ষণ কী করব?'

ছাতের দিকে তাকাল রবিন। অনেক বেশি শব্দ হচ্ছে। তারমানে চুপ করে বসে নেই কিশোর আর কারিনা, নিশ্চয় ভূতটার সঙ্গে লড়াই করছে।

'ভূতটাকে বাধা দেবার চেষ্টা করতে পারো,' রবিন বলল। 'আমি জেনারেটরটা নষ্ট না করা পর্যন্ত ওদের বাঁচিয়ে রাখো।'

'কীভাবে?' রোডার প্রশ্ন।

'যেভাবেই হোক, করো!' তাড়াহুড়া করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল রবিন।

চেয়ারটা ভেঙে গেছে। শুধু টেবিলে দাঁড়িয়ে ট্র্যাপডোর নাগাল পাবে না। চিলেকোঠায় ওঠার অন্য পথ খুঁজতে শুরু করল মুসা। যে জানালাটা দিয়ে বাইরে সার্চলাইটের আলো ফেলা হয়, সেটার বাইরে একটা কাঠের ব্যালকনি। বাইরে দাঁড়িয়ে আগেই ওটা দেখেছিল সে, কিন্তু এসব হই-হট্টগোল আর ঝামেলায় ভুলে গিয়েছিল। ব্যালকনির রেলিঙে দাঁড়িয়ে ওখান থেকে চিলেকোঠায় উঠতে পারবে কিনা ভাবল। চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে।

ভাঙা চেয়ারটা দিয়ে জানালার কাঁচে বাড়ি মারল সে। ঝনঝন করে ভেঙে পড়ল সমস্ত কাঁচ। জানালা দিয়ে নিরাপদেই ব্যালকনিতে চলে এল,

বেরিয়ে থাকা চোখা কাঁচে খোঁচা লাগল না শরীরের কোথাও। চোখে পড়ল ব্যালকনিতে বেরোনোর দরজাটা। শুধু শুধু জানালাটা ভাঙতে গিয়ে কষ্ট করেছে। ভাঙার প্রয়োজন ছিল না।

গার্ড রেইলটা টেনেটুনে দেখতে লাগল সে। ভার রাখতে পারবে কিনা বোঝার চেষ্টা করল। হঠাৎ উপর থেকে কাঠের টুকরো আর প্লাস্টারের গুঁড়ো ঝরে পড়তে লাগল মাথায়। উপরে তাকিয়ে অবাক হয়ে মুসা দেখল, একটা ফোকর দিয়ে বেরিয়ে আসছে কিশোর। হাত-পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে নীচে পড়তে লাগল।

থাবা মারল মুসা। ধরে ফেলল কিশোরের একটা হাত। ব্যালকনির বাইরে ঝুলে রইল কিশোর। পা দুটো ঝুলছে একশো ফুট নীচের পাথরগুলোর উপর।

'কিশোর!' চিৎকার করে উঠল মুসা। 'নোড়ো না! আমি তোমাকে তুলে আনছি। বাইরে ঝাঁপ দিলে কেন?'

মুসার দিকে তাকাল কিশোর। চোখ দুটো বড় বড় হয়ে গেছে।

'আমি মনে করেছিলাম আর বাঁচব না!' খসখসে কণ্ঠে কিশোর বলল। 'তোলো আমাকে! তুলে আনো! জলদি!'

'চেষ্টা তো করছি। কিন্তু এত ভারি তুমি!'

'অনেক ওপরে থাকাতে মাধ্যাকর্ষণের জন্য বেশি লাগছে।'

কথাবার্তা শুনে ইতিমধ্যে জানালা দিয়ে ব্যালকনিতে উঁকি দিয়েছে রোডা। কিশোরকে দেখে মুসার চেয়ে কম অবাক হলো না। তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে এল। কিশোরকে তুলতে মুসাকে সাহায্য করল।

রেলিং ডিঙিয়ে কিশোরকে ব্যালকনিতে তুলে আনল দুজনে। ব্যালকনির কাঠের মেঝেতে পা রাখল কিশোর। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে দম নিল। তারপর বলল, 'ভূতটার পরিচয় আমি জেনে গেছি।'

ভুরু কুঁচকাল রোডা। 'ভূতের পরিচয়? কে সে?'

'লাইব্রেরিতে পত্রিকায় পড়া প্রতিবেদনটার কথা মনে করে দেখো। ওতে লাইটহাউসের কেয়ারটেকারের নাম লেখা আছে, জোয়ানা ট্যাইওর। আর তার ছেলের নাম টোরি।'

'তো?'

'এমন যদি হয়, ভুল করে নাম থেকে "এল" অক্ষরটা বাদ দিয়ে বসে

প্রতিবেদক? টেলারের উচ্চারণ হয়ে যাবে ট্যাইওর।'

উত্তেজিত হয়ে উঠল রোডা। 'কারিনা টেলার হয়ে যাবে কারিনা ট্যাইওর। নিকু টেলার নিকু ট্যাইওর!'

'হ্যাঁ। কারিনা বলেছে তার বাবার নাম ভিটোরি। ছেলেকে নিশ্চয় শুধু টোরি বলে ডাকতেন তাঁর মা জোয়ানা টেলার।'

বিস্ময় ফুটল রোডার চেহারায়। 'তারমানে তুমি বলতে চাও, কারিনার বাবাই সেই ছেলেটি, তিরিশ বছর আগে ঢেউ যাকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল? মা কেয়ারটেকার থাকতে লাইটহাউসে যেতেন বাচ্চা টোরি? টেবিল কেটে হৃৎপিণ্ড এঁকে তিনিই দুই পাশে লিখেছেন মাম্মি ও টোরি শব্দ দুটো?'

'হ্যাঁ।'

'কারিনা আর নিকু তারমানে ভূতের নাতি-নাতনী!'

'খাইছে!' বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেছে মুসা।

'কিশোর, তুমি একটা জিনিয়াস!' রোডা বলল।

হাসল কিশোর।

'কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারছি না,' মুসা বলল। 'পত্রিকায় তো লিখেছে টোরির লাশ খুঁজে পাওয়া যায়নি।'

'বেঁচে যে ছিল এটাই তো তার প্রমাণ,' কিশোর বলল। 'নিশ্চয় ঢেউ তাঁকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল এই এলাকার বাইরে অন্য কোন শহরের সৈকতে। এত দূরে, যেখান থেকে বাড়ি ফেরা সম্ভব হয়নি পাঁচ বছরের ছোট্ট ছেলেটার।'

'ছেলের শোক কাটাতে না পেরে মারা গেলেন মিসেস টেলার,' আপনমনে মাথা দোলাতে লাগল রোডা। 'আর মনে হাহাকার পুষে মরার কারণেই তিনি ওই জঘন্য ভূতে পরিণত হয়েছেন।'

'হ্যাঁ। আর মৃত্যুর সময় লাইটহাউসে ছিলেন। তাই ভূত হয়েও লাইটহাউস আঁকড়ে পড়ে আছেন।'

ধুড়ুম করে শব্দ হলো উপরে।

চমকে গেল তিনজনে। উপরের দেয়ালের গায়ের ফোকর যেখান দিয়ে পড়েছে সেটা দেখিয়ে কিশোর বলল, 'ওখান দিয়ে চিলেকোঠায় ঢুকতে পারব আবার। দেরি করলে দুই নাতিকে নিয়ে কী করবে ভূতটা, কে জানে!'

'নিকুকে দেখেছ?' জিজ্ঞেস করল রোডা।

'হ্যাঁ। ওপরের চিলেকোঠাতেই আছে। আমি রেলিঙের ওপর দাঁড়াচ্ছি। আমাকে ধরো।'

রেলিঙে উঠে দাঁড়াল কিশোর। ওকে ধরে রাখল মুসা ও রোডা, যাতে পড়ে না যায়। ওখান থেকে ফোকরে পৌঁছাতে অসুবিধে হলো না কিশোরের। সবার যাওয়ার দরকার নেই। মুসা আর রোডাকে ব্যালকনিতেই দাঁড়াতে বলল সে।

ভিতরে এসে এক ভয়ঙ্কর দৃশ্যের মুখোমুখি হলো কিশোর। কারিনাকে দ্বিতীয় চিলেকোঠাটায় টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে ভূতটা। হয়তো ভাইয়ের সঙ্গে ওকেও তালা আটকে রেখে দিতে চায়। কিন্তু যেতে রাজি না কারিনা। ধস্তাধস্তি করছে। আচমকা হাত বাড়িয়ে ভূতের চুল খামচে ধরে হ্যাঁচকা টান মারল। ব্যাপারটা মোটেও পছন্দ হলো না ভূতের। রাগে গর্জন করে উঠল। সেই শব্দকে ছাপিয়ে চিৎকার করে বলল কিশোর, 'মিসেস টেলার, কারিনাকে মারবেন না! কারিনা আপনার নাতনী!'

থমকে গেল ভূতটা। কাঁধের উপর দিয়ে ফিরে তাকাল। কারিনাও তাকাল। চিৎকার করে উঠল, 'এই কুৎসিত দানবটার সাথে কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না আমার!'

ভূতের কাছে এগোল কিশোর। ভূতটাকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনার ছেলের নাম কী ছিল, মিসেস টেলার? ভিটোরি টেলার?'

কারিনার হাত ছেড়ে দিল ভূতটা। পাথরের মত স্থির। তাকিয়ে আছে কিশোরের দিকে। ম্লান হয়ে এসেছে চোখের আগুন। চেহারা ঘিরে যে আভা বিচ্ছুরিত হচ্ছিল, সেটার উজ্জ্বলতাও কমেছে। ফিকে হলুদ লাগছে এখন। গর্জন বন্ধ হয়ে গেছে।

মোলায়েম স্বরে কিশোর বলল, 'আমি জানি, আপনার ছেলের নাম ভিটোরি টেলার। আপনার নাতনী কারিনা টেলার আমাকে বলেছে তার বাবার নাম ছিল ভিটোরি টেলার। রীফের কাছে যে জাহাজটা ডুবেছে, ওটার ক্যাপ্টেন আপনার ছেলেকে চুরি করেনি। তাঁর জাহাজ ডুবেছে তিনি মাতাল ছিলেন বলে। লাইটহাউসের লাইট নিভানো থাকাতে নয়। আপনার ছেলে টোরি আসলে ঢেউয়ে ভেসে গিয়েছিল। এখান থেকে দূরে অন্য শহরের সৈকতে গিয়ে পড়েছিল। বাড়ি ফিরতে পারেনি তখন। কিন্তু তিরিশ বছর

আগের সেরাতে মারা যাননি, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ তারপর তিনি বিয়ে করেছেন, এক ছেলে আর এক মেয়ের বাপ হয়েছেন।' এক মুহূর্ত থামল কিশোর। 'হ্যাঁ, মিসেস টেলার, সত্যি বলছি, কারিনা আপনার নাতনী। আর আপনার ছেলের মত দেখতে যে ছেলেটাকে আপনি আপনার ছেলে টোরি ভেবে ভুল করে জেটি থেকে তুলে নিয়ে এসেছেন, সে আপনার ছেলে নয়, নাতি। ওর নাম নিকসন টেলার। ডাকনাম নিকু।'

কারিনার দিকে ফিরল ভূতটা। আস্তে করে তার চুল ছুঁয়ে দেখল। কিন্তু সন্দেহ যাচ্ছে না।

যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে, বুঝতে পারছে কিশোর। ভূতের সন্দেহ দূর করতে হবে। 'কারিনা, এমন কিছু বলো, যেটা শুধু তোমার বাবা আর তোমার দাদী জানেন।'

'আমি কিছু বুঝতে পারছি না,' বিড়বিড় করল কারিনা।

'এমন কিছু বলো,' আবার বলল কিশোর, 'যেটা তোমার দাদী তোমার বাবাকে শিখিয়েছিলেন। যা মনে আসে তোমার।'

কারিনা জবাব দিল, 'বাবা আমাকে একটা গান শিখিয়েছে। ছোটবেলায় নাকি তার মা তাকে শিখিয়েছে।'

'গুড! সেটাই বলো। জলদি করো!' অধৈর্য কণ্ঠে বলল কিশোর। 'জলদি!'

গান শুরু করল কারিনা:

সাগর যেন এক মহিলা,
কতই না তার দয়া,
কিন্তু ভয়ঙ্কর তার কালো মেজাজ,
শীতল পানি আর ঢেউয়ের দেয়াল,
যদি তাতে পড়ো,
মৃত্যু তোমার ঘটবে সুনিশ্চিত
মাছেরা এসে ছিঁড়ে খাবে দেহ।
সাগর যেন এক রাজকন্যে,
কতই না তার রূপ,
কিন্তু সেই রূপের গভীরে যদি ডোবো,
সেই অসীমতায়, যেখানে অক্টোপাসের বাসা

মৃত্যু তোমার ঘটবে সুনিশ্চিত
হাঙর এসে কামড়ে খাবে দেহ।

গান শেষ করে বলল, 'পচা গান।'

'মিসেস টেলরের সামনে পচা, কুৎসিত, জঘন্য, এসব শব্দগুলো বলবে না,' সাবধান করল কিশোর।

ধীরে ধীরে মাথা ঝাঁকানো শুরু করেছে তখন ভূতটা। এক চোখ থেকে পানি বেরিয়ে গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল। কিন্তু পানিটাকে পানির মত লাগছে না, শক্তিশালী সার্চলাইটের আলোয় হীরার মত জ্বলছে।

কারিনার মনে হলো তার কাছে কিছু যেন জানতে চায় তার দাদু। হাত বাড়িয়ে ভূতের কাঁধ ছুঁলো।

'আমার বাবা খুব ভাল লোক ছিল, দাদু,' কারিনা বলল। 'সুখী জীবন কাটিয়েছে। খুব ভাল একজন মহিলাকে বিয়ে করেছিল। আমাকে আর নিকুকে জন্ম দিয়েছে।' মুখ নামাল সে। তার চোখেও পানি। 'মাস দুই আগে এক দুর্ঘটনায় মারা যায় বাবা।' ফুঁপিয়ে উঠল কারিনা। 'আমি জানি, বাবার জন্য তোমার খুব খারাপ লাগে। আমারও লাগে।'

মনে রাখার মত একটা কাণ্ড করল ওই মুহূর্তে ভূতটা। কারিনাকে জড়িয়ে ধরল। শুধু জড়িয়ে ধরেই ক্ষান্ত হলো না, গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করতে লাগল। কয়েকটা সেকেন্ড দুজন দুজনকে জড়িয়ে ধরে রেখে কাঁদল। কারিনার ফোঁপানি শোনা যাচ্ছে, কিন্তু ভূতের কান্নার কোন শব্দ নেই।

কমে এল ট্র্যাপডোরের গর্ত দিয়ে আসা সার্চলাইটের আলোর উজ্জ্বলতা।

কারিনাকে ছেড়ে দিল ভূতটা। কারিনাও ছেড়ে দিল।

কারিনাকে বলল কিশোর, 'জেনারেটরটার কিছু করেছে রবিন। মনে হয় নষ্ট করে দিয়েছে।' ভূতের দিকে তাকিয়ে দুঃখ প্রকাশ করল সে। 'আপনি এতে রাগ করছেন কিনা জানি না। কিন্তু আমাদের বন্ধু আমাদের বাঁচানোর চেষ্টা করছে।'

কিশোরকে অবাক করে দিয়ে ভাঙা চোয়ালটা এমন করে ফাঁক করল ভূতটা, কিশোরের মনে হলো হাসল। মাথা নেড়ে যেন বোঝানোর চেষ্টা করল, কিছু মনে করেনি।

'আমার মনে হয় না জেনারেটর নিয়ে কোন মাথাব্যথা আছে দাদুর,' কারিনা বলল কিশোরকে। 'দাদু বোধহয় এখন যেতে চাইছে।' ভূতের হাত ধরে ঝাঁকি দিল সে। উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, 'বাবার সঙ্গে তো দেখা হবে তোমার, তাই না? তোমার ছেলের সঙ্গে!'

হাসিটা চওড়া হলো ভূতের। শেষবারের মত কারিনাকে জড়িয়ে ধরে ছেড়ে দিল। কিশোরের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল। যেন নীরবে ধন্যবাদ জানাল ওকে।

নিভে গেল সার্চলাইটের আলো। গভীর অন্ধকারে ঢাকা পড়ল ওরা।

অন্ধকারটা পাতলা হয়ে এল ধীরে ধীরে। টর্চের আলোয়। নিজের ফেলে যাওয়া টর্চটা চোখে পড়ল কিশোরের। মেঝেতে পড়ে আছে। এখনও জ্বলছে। তুলে নিল ওটা সে। সার্চলাইটের আলোর পর টর্চের আলোটাকে বড়ই মলিন আর সামান্য মনে হচ্ছে। তবু আলো তো। কাজে লাগছে।

ভূতটা চলে গেছে।

সিঁড়ি বেয়ে তাড়াতাড়ি দ্বিতীয় চিলেকোঠায় উঠে গেল কারিনা।

মুহূর্ত পরেই পাঁচ বছর বয়েসী একটা ছেলেকে জড়িয়ে ধরে বেরিয়ে এল আবার।

'আপু, ভূতটাকে মেরে ফেলেছিস?' নিকু জিজ্ঞেস করল।

'না,' কিশোর জবাব দিল। 'ওকে আমরা বাড়ি যাবার পথ দেখিয়ে দিয়েছি।'

'ভূতের কি বাড়ি থাকে?'

'বাড়ি থাকে কিনা জানি না। তবে যেখানে যাবার সেখানেই গেছে।'

কিন্তু অ্যাডভেঞ্চার তখনও শেষ হয়নি ওদের।

ধোঁয়ার গন্ধ পেল তিনজনেই।

দৌড়ে এসে ট্র্যাপডোরের ঢাকনা ধরে টান দিল কিশোর। সহজেই উঠে এল এখন ঢাকনাটা। কিন্তু নীচে তাকিয়ে খুশি হতে পারল না। সার্চলাইটের ঘরের ট্র্যাপডোর দিয়ে নীচে আগুন চোখে পড়ল। মুসা অস্থির ভঙ্গিতে পায়চারি করছে। রোডা তাকিয়ে আছে ফোকর দিয়ে নীচের দিকে। কিশোর ওদেরকে ডাকার আগেই সিঁড়ির মাথায় দেখা গেল রবিনকে। হাসিমুখে রোডা আর মুসাকে জানাল, 'জেনারেটরটা নষ্ট করে দিয়েছি?'

'কীভাবে?' জানতে চাইল রোডা।

'কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিয়েছি।' ঘরের ভিতর উঠে এল রবিন। রোডার পাশে দাঁড়াল। ওদের দিকে এগিয়ে গেল মুসা। ট্র্যাপডোর দিয়ে নীচের আগুনের দিকে তাকাল রবিন। দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে আগুন। হাসি মিলিয়ে গেল রবিনের। 'ফায়ার এক্সটিংগুইশার নেই! নিভাব কীভাবে?'

'এমন জায়গায় আটকা পড়েছি,' চেঁচিয়ে উঠল রোডা, 'বেরোতেও পারব না!'

'পুড়ে মরতে চাই না আমি,' চিলেকোঠায় কিশোরের কানের কাছে ককিয়ে উঠল কারিনা।

'আমরা মরব না,' কিশোর জবাব দিল। নীচে তাকিয়ে চিৎকার করে বলল, 'মুসা, রবিন, ব্যালকনি থেকে পানিতে লাফিয়ে পড়ব আমরা।'

'মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি তোমার!' রোডা বলল। 'একশো ফুট নীচে ঝাঁপ দিলে বাঁচব!'

'বাঁচব,' কিশোর বলল। 'অনেক ওপর থেকে ঝাঁপ দিলে সাধারণত পানির সারফেস টেনশন মানুষকে মেরে ফেলে। কিন্তু পানি ছোঁয়ার ঠিক আগ মুহূর্তে যদি সেটা এড়ানো যায়, তাহলে আর মরতে হবে না।'

'সারফেস টেনশন মানেটা কী?' নিকু জানতে চাইল তার বোনের কাছে।

চোয়াল ডলল কারিনা। 'কিশোরের কাছে আগে শুনে নিই, তারপর তোমাকে বুঝিয়ে দেব।'

'তুমি বলতে চাইছ,' কিশোরের দিকে তাকিয়ে আছে রবিন, 'আমরা পানি স্পর্শ করার আগেই তক্তা জাতীয় কিছু দিয়ে যদি পানির আঘাত ঠেকাতে পারি, তাহলে বেঁচে যাব?'

'এই তো বুঝেছ,' কিশোর বলল। দ্বিতীয় চিলেকোঠায় ওঠার মইটা খুলে আনল সে। ট্র্যাপডোর দিয়ে নীচে নামিয়ে দিল। একে একে নেমে গেল নিকু আর কারিনা। সবশেষে সে নামল। 'ব্যালকনি থেকে তক্তা খুলে নেয়ার চেষ্টা করব।' ব্যালকনির দিকে ছুটল কিশোর।

সবাই এসে দাঁড়াল ব্যালকনিতে। ঠাণ্ডা বাতাস এসে ঝাপটা মারল শরীরে। চুল টানতে লাগল। অনেক নীচে পাথরের গায়ে আছড়ে পড়ছে ঢেউ। জোয়ার এসেছে। গত কয়েক মিনিটে অনেকখানি ফুলে উঠেছে সাগর।

ব্যালকনির রেলিঙ তৈরি করা হয়েছে তক্তা দিয়ে। পুরানো ওই তক্তাগুলো টেনে টেনে খুলে নেয়া খুব একটা কঠিন হলো না। একেকজন দুটো করে তক্তা হাতে নিয়ে দাঁড়াল।

দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে সময়। সার্চলাইটের ঘরে পৌঁছে গেছে আগুনের শিখা। বিচিত্র শব্দ করে বিস্ফোরিত হলো লাইটের বাল্‌বগুলো। কাঁচের গুঁড়ো ছড়িয়ে পড়ল। কমলা রঙের আগুনে ভরে যাচ্ছে ঘর। উত্তাপ বাড়ছে।

'আমরা লাফ দেয়ার আগে তক্তাগুলো নীচে ছুঁড়ে মারব?' জানতে চাইল রোডা।

'না,' জবাব দিল কিশোর। 'না। লাফ দেয়ার পর পানিতে পড়ার ঠিক আগমুহূর্তে দেহের নীচে ছেড়ে দেবে তক্তাগুলো। পানির সারফেস টেনশন যেন ভেঙে যায়।'

'যদি তক্তার ওপর পড়ি, তাহলে কী হবে?'

'মরবে।'

আর কিছু বলার নেই রোডার। বলার সময়ও নেই। ঘরে ছড়িয়ে পড়া আগুন ব্যালকনিতেও বেরোতে শুরু করেছে। ধোঁয়ায় ভরে গেছে বাতাস। শ্বাস নেওয়াই কঠিন। কাশতে শুরু করল সবাই। রেলিঙের তক্তা খুলে যে ফোকরটা করেছে তার কাছ থেকে পিছিয়ে এল। লাফ দেয়ার আগে গতিবেগ তৈরি করা দরকার। দৌড়ে গিয়ে লাফ দেবে, নীচের পাথরগুলোকে এড়িয়ে যাতে দূরে পড়তে পারে। ব্যালকনিতে দৌড়ানোর জায়গা তেমন নেই, তবু যতটুকু পাওয়া যায়, সেটারই সদ্ব্যবহার করবে। নিজের গায়ের সঙ্গে নিকুকে শক্ত করে চেপে ধরল কারিনা। নিকুকে নিতে চাইল মুসা। কিন্তু ছাড়ল না কারিনা। মুসা শেষে নিজেরগুলোর সঙ্গে নিকুর তক্তা ছোঁড়ারও দায়িত্ব নিল।

একে অন্যের দিকে তাকিয়ে দৌড় দিল ওরা।

রেলিঙের ভাঙা জায়গাটা দিয়ে উড়ে বেরিয়ে এল।

দুঃস্বপ্নই বলতে হবে।

কিশোরের মনে হলো, পড়ছে তো পড়ছেই, অনন্তকাল ধরে পড়ছে। ঠাণ্ডা বাতাস চুল টানছে, গালের চামড়ায় যেন আঁচড় বসাচ্ছে। ঢেউ দেখতে পাচ্ছে সে, পাথর চোখে পড়ছে। সব তালগোল পাকিয়ে যেন একসঙ্গে উঠে আসছে ওকে গ্রাস করতে। কোথায় মাটি, কোথায় পানি আর কোথায়

আকাশ কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। একবার মনে হলো, নীচে না পড়ে উপরে উঠছে সে। তবে এত কিছুর মাঝেও একটা কথা ভুলল না, হাতের তক্তাগুলো সঠিক সময়ে সঠিক জায়গায় ফেলা দরকার।

আচমকা ভয়ঙ্কর এক ধাক্কা।

পানির ভিতর দিয়ে চলে যাচ্ছে। অতিরিক্ত ঘন মনে হচ্ছে পানিকে।

চারদিকে ভীষণ ঠাণ্ডা। আর ভয়াল অন্ধকার।

পানিতে তলিয়ে গেছে। কাউকে চোখে পড়ল না। ওই মুহূর্তে অন্য কাউকে নিয়ে ভাবার সময়ও নেই। দ্রুত সাঁতরে উপরে ওঠার চেষ্টা করল সে। কয়েক সেকেন্ড পর ভুস করে পানিতে মাথা তুলল। অন্ধকার সাগরের পানি থেকে ভেসে উঠে তাজা বাতাস টানল বুক ভরে। ভাল লাগল। সবার আগে সে-ই মাথা তুলেছে। তবে একে একে টুপটাপ করে আরও মাথা ভেসে উঠতে থাকল। ঢেউয়ের মধ্যে খুদে খুদে লাগছে কালো মাথাগুলো।

'সাঁতরাতে পারবে?' নিকুকে জিজ্ঞেস করল সে।

'আমি খুব ভাল সাঁতার জানি,' গর্বের সঙ্গে জবাব দিল নিকু।

নিরাপদেই পানিতে পড়েছে সবাই। কেউ মারা যায়নি। জেটির শেষ প্রান্তের দিকে সাঁতরে চলল ওরা, যেখানে দড়িটা বেঁধেছে। সাবধানে এগোলো যাতে ঢেউয়ের ধাক্কায় পাথরে গিয়ে বাড়ি না খায়। অবশেষে নিরাপদেই ডাঙায় উঠল সবাই। পাথরের স্তূপের উপর দিয়ে হেঁটে চলল বালির সৈকতের দিকে।

ভাইকে ফিরে পেয়ে ভীষণ খুশি কারিনা। সাংঘাতিক উত্তেজিত। কোনমতেই যেন আর হাতছাড়া করতে চাইছে না নিকুকে। জড়িয়ে ধরে রেখেছে। মাঝে মাঝেই মুখ নামিয়ে গালে চুমু খাচ্ছে। ছেলেটাকে মুক্ত করে আনতে পেরে খুব ভাল লাগছে তিন গোয়েন্দার। রোডারও লাগছে।

'নিকুকে দেখে চমকে যাবেন তোমার আম্মা,' কারিনাকে বলল মুসা।

'চমকে যাবে মানে!' কারিনা বলল, 'বিশ্বাসই করতে পারবে না। ভাববে স্বপ্ন দেখছে। ওহ্‌হো, মা'র সঙ্গে তো পরিচয়ই করানো হয়নি তোমাদের। চলো না আমাদের বাড়িতে, পরিচয় করিয়ে দেব।'

কারোরই আপত্তি নেই। রোডা বলল তিন গোয়েন্দাকে, 'এই নিয়ে দু'দুবার ডেথ সিটির ভূতের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো আমাদের। ভালয় ভালয় বেঁচেও ফিরলাম। পরের বার কী হবে?'

'পরেরবারও ফিরব,' গভীর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জবাব দিল কিশোর।

'টাওয়ারের ভূতটা যে আমার দাদী, ভাগ্যিস মাথায় এসেছিল তোমার,' কিশোরকে বলল কারিনা। 'নইলে আজ মরতাম।'

ডুবুরির পোশাক আর যন্ত্রপাতিগুলো তুলে নিচ্ছে মুসা ও কিশোর।

রোডা বলল, 'আশ্চর্য, একটা হাঙরও দেখলাম না আজ। তারমানে ডাঙায় দাঁড়িয়ে যতখানি ভাবা হয়, ততখানি ভয়ঙ্কর আর বিপজ্জনক নয় সাগরটা।'

রোডার কথা শেষও হলো না, পানিতে ভেসে উঠল বিশাল এক হাঙরের ত্রিকোণ পাখনা।

লাফিয়ে পানির কাছ থেকে সরে গেল ওরা। উঠে গেল উপরের পাথরের স্তূপে, যেখানে ক্যাপ্টেন ক্যামেরুনের কঙ্কালটা রেখে গিয়েছিল। ওভাবেই পড়ে আছে সেটা।

'তারমানে ডেথ সিটিতে কখনও নিজেকে নিরাপদ ভাবা চলবে না!' গম্ভীর ভঙ্গিতে বলল কিশোর। নিজের অজান্তেই ঘন ঘন চিমটি কাটল দু'বার নীচের ঠোঁটে।

'সেই কথাটাই তো সকাল থেকে বোঝানোর চেষ্টা করছি তোমাদের। ডেথ সিটিকে এক বিন্দু বিশ্বাস করি না আমি,' রোডা বলল। 'এখন নতুন কোন দৈত্যদানব কিংবা ভূতের খপ্পরে আর না পড়লেই হয়!'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, চলো চলো,' তাগাদা দিল কিশোর। 'এখানে আর দাঁড়িয়ে থাকার কোন মানে হয় না।' কঙ্কালটা তুলে নিল সে।

***

[কাজী শাহনূর হোসেনের লেখা 'আঁধারের আততায়ী' বইটি তিন গোয়েন্দার পাঠক-পাঠিকাদের জন্য 'রোবট-রহস্য' নামে রূপান্তর করেছেন শামসুদ্দীন নওয়াব।]

রোবট-রহস্য

কাহিনি রচনা: কাজী শাহনূর হোসেন

তিন গোয়েন্দায় রূপান্তর: শামসুদ্দীন নওয়াব

প্রথম প্রকাশ: ২০০৮

এক

রাতের আঁধার চিরে এগোচ্ছে ওটা। নিঃশব্দে। দ্রুত। ভারী দেহটা এক্ষেত্রে এতটুকু বাধার সৃষ্টি করতে পারেনি। কন্ট্রোল ব্রেইনে অবিরাম তথ্য জোগান দিচ্ছে জ্ঞানেন্দ্রিয়: পায়ের নিচে অসমান মাটি...আগাছা...কিছু যায় আসে না। সামনে মানুষ...সশস্ত্র গার্ড...রেডি হও...

বিশাল গেটটা বন্ধ। সাইনবোর্ড ঝুলছে ওটার ওপরে।

প্রতিরক্ষা অস্ত্র গবেষণা কেন্দ্র
বিনা অনুমতিতে প্রবেশ নিষেধ

পাহারাদার একঘেয়েমি আর ক্লান্তিতে ভুগছে। রাতের ডিউটি সব সময় ওরই ঘাড়ে চাপে কেন? সার্জেন্ট বরকত চাপিয়ে দেয় বলেই তো। চকিতে রিস্ট ওয়াচের দিকে চাইল। এখনও ঝাড়া একটি ঘণ্টা বাকি। এই হাড় কাঁপানো শীতে, ঘুটঘুটে অন্ধকারে বসে পার করতে হবে আরও ষাটটি মিনিট। কিন্তু কেন রে বাপু? আস্ত ট্যাঙ্কের পক্ষেও তো ভারী গেটটা ভেঙে ভেতরে ঢোকা প্রায় অসম্ভব। তবে আর গার্ড দেয়া কেন? গোমড়ামুখে পায়চারি করতে লাগল ও। হঠাৎ, থেমে দাঁড়াল। আঁধারে নড়াচড়া করছে কি একটা। চোখ সরু করে চাইল ও। গেটের চারপাশটা ওভারহেড ল্যাম্পের কারণে আলোকিত, কিন্তু আশেপাশের অন্ধকার এর ফলে জমাট বেঁধেছে আরও। কি ওটা...অতিকায়, ধাতব কিছু...রাইফেল তুলল গার্ড, চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেবে, ঠিক তখনই আঁধার ফুঁড়ে বেরিয়ে এল দেহটা। ভয়ে গলা বুজে গেল ওর।

অসাড় দাঁড়িয়ে রইল ও, নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না।

দুটো লম্বা পদক্ষেপে গার্ড আর নিজের মধ্যকার [illegible] আর্তচিৎকার করতে হাঁ করল গার্ড, কিন্তু [illegible] ধাতব হাত বিদ্যুৎগতিতে ওর গলাটা চেপে ধরে মুচড়ে দিল

লাশটাকে আলগোছে একপাশে শুইয়ে দিল ওটা [illegible] গেটের দিকে। এক মুহূর্ত জরিপ করে হাত বাড়াল। ছিঁড়ে [illegible] সিস্টেমের কেবল। নীল স্ফুলিঙ্গ জ্বলে উঠল সাঁড়াশির মত [illegible] ইস্পাতের মোটা চেইনগুলো ভেঙে ফেলল ওটা, তালাটা দুমড়ে মুচড়ে এক ধাক্কায় খুলে ফেলল গেট।

ফ্রন্ট ডোরের উদ্দেশে এগোনোর সময় পায়ের চাপে চূর্ণ হলো মাটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কম্পনে থমকে দাঁড়াল ওটা। প্রাণীর সাড়া পাওয়া যাচ্ছে···

একটা কালো রঙের অতিকায় ডোবারম্যান তেড়ে আসছে, গর্জাচ্ছে চাপা গলায়। অস্ত্রধারী লোককেও পরোয়া করে না এই হিংস্র জাতের কুকুর। কিন্তু আগন্তুককে দেখে স্কিড করে থেমে পড়ল, মাটিতে নখর দাবিয়ে দিয়ে গতি রোধ করতে প্রাণপণ চেষ্টা করছে। কেঁউ কেঁউ করে পিছিয়ে গেল কুকুরটা, তারপর ঘুরেই লেজ দাবিয়ে দিল দৌড়। এক ঘুসিতে ফ্রন্ট ডোর তুবড়ে দিল লৌহমানব, প্রবেশ করল বিল্ডিঙে।

করিডর ধরে হেঁটে চলেছে ওটা, ইনফ্রা-রেড ভিশনের জন্যে আঁধারে পথ চলতে একটুও অসুবিধা হচ্ছে না। শীঘ্রিই একটা খালি অফিসরুমে এসে ঢুকল ওটা, এককোণে স্টীলের একটা আলমারি। ওতে রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ সরকারী কাগজপত্র। ধাতব ডান হাতটা কব্জা থেকে খুলে নিল দরজার একটা পাল্লা। হলদে রঙের ফোল্ডারে ঠাসা আলমারির ভেতরটা। প্রত্যেকটার গায়ে একটা করে লাল টপ সিক্রেট স্ট্যাম্প সাঁটা। একটার পর একটা ফোল্ডার উল্টে যাচ্ছে ওটা, দক্ষ হাতে। শেষপর্যন্ত প্রয়োজনীয় ফোল্ডারটা খুঁজে পেয়ে টেনে নিল। বেরিয়ে পড়ল অফিস থেকে। বিল্ডিং থেকে বের হয়ে, গেট পেরিয়ে আঁধারে মিশে গেল ওটা। পেছনে পড়ে রইল গার্ডের লাশ।

তিন মিনিটেরও কম সময়ে গোটা ব্যাপারটা ঘটল।

'কেসটা কি, আজাদ চাচা?' জানতে চাইল কিশোর। অন্ধকূপ রহস্যের সমাধান করে ঢাকায় ফিরতে পারেনি ওরা। তার আগেই মেজর আজাদকে

জড়িয়ে পড়তে হয়েছে এই ফাইল চুরির তদন্তে। তিনিই ক'দিন থেকে যেতে অনুরোধ করেছেন হিরু চাচা আর কিশোরকে।

'সরকারী গবেষণা কেন্দ্র থেকে ক'টা প্ল্যান চুরি গেছে।'

'কিসের প্ল্যান?'

'একটা ডিসিনটিগ্রেটর গান তৈরির প্ল্যান।'

'এ ব্যাপারে "আবিষ্কার"-এর সঙ্গে যোগাযোগ করলে হয় না?' প্রশ্ন করল কিশোর।

'তাই তো করতে হবে,' প্রশংসার দৃষ্টিতে কিশোরের দিকে চাইলেন মেজর আজাদ। 'চুরি যাওয়া প্ল্যানগুলো সম্বন্ধে ওরাই সবচেয়ে ভাল বলতে পারবে।'

'আবিষ্কার' হচ্ছে সরকারী সহায়তাপ্রাপ্ত একটি বিজ্ঞান গবেষণা সংস্থা। অত্যন্ত গোপনীয় রিসার্চ করা হয় সেখানে। মুশকিল হচ্ছে, আবিষ্কার-এর কর্মীরা তাদের কার্যক্রম গোপন রাখতে বদ্ধপরিকর, বাইরের কারোর নাক গলানো বিশেষ পছন্দ করে না। উচ্চ পর্যায়ে হাত রয়েছে সংস্থাটির, এবং যে কোন প্রয়োজনে সাহায্য চাইতেও কসুর করে না। সেজন্যেই মেজর আজাদ বড় একটা ঘাঁটাতে চান না ওদের।

'আজাদ চাচা,' বলল কিশোর, 'আমাকে ওখানে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিন না। দেখি কিছু জানতে পারি কিনা।'

শূন্য দৃষ্টিতে এক মুহূর্ত চেয়ে থেকে মৃদু হাসলেন মেজর। 'ভিজিটর পাস চাইছিস?'

'হ্যাঁ।'

'তা দেবখন। আয়, আমার অফিসে।'

কিশোর তাঁর পেছন পেছন বেরিয়ে এল ল্যাবোরেটরী থেকে। 'হিরু চাচা কখন আসবে বলেছে?'

'উঁহুঁ।'

হিরু চাচা সার্জেন্ট হায়দারকে নিয়ে চন্দনপুর অভয়ারণ্যে পাখি দেখতে গেছে।

দুই

এবারের সাইনবোর্ডটিতে লেখা:

প্রতিরক্ষা স্টোরেজ গুদাম

বিনা অনুমতিতে প্রবেশ নিষেধ

তারের ভারী বেড়ার কংক্রিটের পোস্টে অন্যান্য নোটিশ টাঙানো। প্রতিটিতে মড়ার খুলি আর ক্রসবোন আঁকা।

বিপজ্জনক! বৈদ্যুতিক বেড়া!

স্পর্শ করবেন না। নিশ্চিত মৃত্যু।

একটা ফাঁকা মাঠের কোণ ঘিরে বেড়ার ব্যাপ্তি।

দুটো লম্বা, ধাতব হাত মোটা তারগুলোকে খবরের কাগজের মত অবলীলায় ছিঁড়ে ফেলল। নীল স্ফুলিঙ্গ ফটফট করে উঠল আঙুল ঘিরে। ফোকরটা দিয়ে শরীর গলিয়েছে অতিকায় একটি দেহ, এগিয়ে চলেছে নিচু বাড়িটার দিকে।

গুদামটা বাস্তবেই কংক্রিটের বাঙ্কার। আগে গোলাবারুদের ভাণ্ডার হিসেবে ব্যবহৃত হত। মন্ত্রণালয় পরে এটিকে স্টোরেজে পরিণত করেছে। বেড়ার তার কাটার ফলে গুদামে বেজে উঠেছে অ্যালার্ম বেল। পাহারারত জোয়ান গার্ড বেল শুনেই যা করণীয় করেছে। বন্ধ করে দিয়েছে সিকিউরিটি দরজা। স্থিরচিত্তে অপেক্ষা করছে ও। জানে, শক্তিশালী দেয়াল আর ইস্পাতের কঠিন দরজার পেছনে টপ-সিক্রেট যন্ত্রপাতি নিরাপদেই থাকবে। জরুরী সময় পেরিয়ে গেলে কেউ না কেউ জানাবে ওকে। ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ব আদেশানুযায়ী চুপচাপ বসে থাকবে ও।

আচমকা, দরজার ওপাশ থেকে একটা দুম দুম শব্দ কানে এল ওর। দানবীয় পদশব্দের মত শোনাচ্ছে। সিকিউরিটি-ডোরটাকে ভেতর দিকে ধীরে ধীরে হেলে পড়তে দেখে বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল ও। ধাতব ক্যাঁচকোঁচ শব্দের পরে হাট করে খুলে গেল দরজা। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা দৈত্যটাকে দেখে পুরোটা ভয় পাওয়ার আগেই গলায় একজোড়া

বজ্রমুষ্টি অনুভব করল বেচারা…ওর প্রাণপাখি উড়ে গেলে যত্ন করে লাশটাকে মেঝেতে শুইয়ে দিল দানব। জীবিত প্রাণীর ক্ষতি করতে চায় না ওটা, কিন্তু নিরূপায় যে! মসৃণ-গতিতে ঘুরে শেলফগুলোর সামনে চলে এল দানবটা। লেবেল লাগানো অসংখ্য বাক্সে বিভিন্ন ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশ থরে থরে সাজানো। শেলফগুলো দ্রুত স্ক্যান করছে ওটা, প্রয়োজনীয় যন্ত্রগুলো নেবে কেবল। একটা খালি বাক্সে বাছাই করা জিনিস ভরল, তারপর বাঙ্কার ত্যাগ করে উধাও হয়ে গেল শীত-কুয়াশার অন্ধকারে।

ক'ঘণ্টা বাদে একটা ল্যাণ্ডরোভারে চেপে ঘটনাস্থলে পৌঁছল হিরু চাচা, মেজর আজাদ আর মানস হালদার। চন্দনপুর থেকে কমলনগর আসতে দু'ঘণ্টার মত লেগেছে। ইলেকট্রিক ফেন্সের ভাঙা অংশের সামনে গাড়ি পার্ক করেছেন মেজর। তোবড়ানো বেড়ার দিকে আঙুল দেখালেন তিনি। 'লক্ষ লক্ষ ভোল্ট পাস করছে, তারপরও কিভাবে যে…' হিরু চাচাকে দেখতে না পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'হিরু, কোথায় গেলি রে?'

'ওইদিকে, স্যার,' বলল মানস। আঙুল দেখাল। হিরু চাচা গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে ভেজা ঘাসের ওপর বসে রয়েছে, হাতের তালুতে কি যেন তুলে পরীক্ষা করছে।

মেজরও ড্রাইভিং সীট থেকে লাফিয়ে নামলেন। এসে দাঁড়ালেন বন্ধুর পেছনে।

'কি রে?'

'ও, তুই? এই দেখ!' উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে দিল হিরু চাচা। দেখার জন্যে ঝুঁকলেন মেজর। হিরু চাচার তালুতে ক'টা ঘাস ফুল। চাপা খেয়ে চ্যাপ্টা হয়ে গেছে, বইয়ের ভেতর ফুল রাখলে যেমনটা হয় তেমনি।

'এগুলো দেখে কি করব?' প্রশ্ন করলেন মেজর।

'কিভাবে চেপ্টে গেছে দেখেছিস?'

ল্যাণ্ডরোভার থেকে নেমে এসে মানস যোগ দিল ওদের সঙ্গে। 'কেউ মাড়িয়ে দিয়েছে বোধহয়।'

'একজ্যাক্টলী। মনে হয় অন্তত সিকি টনের চাপ খেয়েছে।' তারের গর্ত দিয়ে ভেতরে পা রাখল হিরু চাচা। মেজর আর মানস তাকে অনুসরণ করে, কম্পাউণ্ড পেরিয়ে বাঙ্কারের ভাঙা দরজার সামনে চলে এল। ধাতব

দরজাটির ভাঙা কোণগুলো পরীক্ষা করল হিরু চাচা। 'কাটেনি, উড়িয়েও দেয়নি,' চিন্তিত কণ্ঠে বলল, 'ছিঁড়ে নিয়েছে!'

বাঙ্কারের ভেতর ঢুকে শেলফের সারির দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে।

সঙ্গে করে আনা রিপোর্টগুলো উল্টে যাচ্ছেন মেজর। 'আজব ব্যাপার হচ্ছে, ওরা অনেক টপসিক্রেট আর ভ্যালুয়েবল জিনিস ফেলে রেখে গেছে। যা যা নিয়েছে তার রিপোর্ট এই যে।'

লিস্টে দ্রুত চোখ বুলাল হিরু চাচা। 'হিসেবী চোর। ডিসিনটিগ্রেটর গান তৈরির মশলা নিয়েছে শুধু।' তালিকাটা ফিরিয়ে দিয়ে এগোল দরজার দিকে। 'ওরা আবারও ফিরে আসতে পারে, দোস্ত। চল, এখানে দেখার আর কিছু নেই।'

চন্দনপুর রিসার্চ সেন্টারে ফেরার পথে বললেন মেজর, 'আমরা তবে কি খুঁজছি?'

'এমন কাউকে, যে খুবই বুদ্ধিমান। যা দরকার তার বেশি কিছু নেয় না। অনায়াসে মানুষও খুন করতে পারে।'

শিউরে উঠল মানস। 'কে সে? মানুষ নাকি অন্য কিছু?'

'মানুষ নয় বলেই তো মনে হচ্ছে,' মাথা নেড়ে বলল হিরু চাচা।

মেজর বললেন, 'যাই হোক না কেন, ওকে খুঁজে বার করব কিভাবে?'

'ওটা কি কে জানে,' শান্ত শোনাল হিরু চাচার কণ্ঠ। 'তবে চুরি করেছে ডিসিনটিগ্রেটর গানের প্ল্যান, কন্ট্রোল সার্কিটরির যন্ত্রপাতি, আর অ্যাটমিক পাওয়ার। তারমানে অস্ত্রটা তৈরি করবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, থার্ড উপাদানটা কি?'

'কেন, ফোকাসিং জেনারেটর,' মুহূর্তে জবাব দিলেন মেজর।

'ঠিক!' মুচকি হাসল হিরু চাচা।

আর বলতে হলো না, মেজর ড্যাশবোর্ড থেকে ছোঁ মেরে তুলে নিলেন রেডিও-মাইক। 'মেজর আজাদ বলছি।'

সামান্য পরে ল্যাবোরেটরীর রেডিও অপারেটরের কণ্ঠ কড়কড় করে উঠল। 'শুনতে পাচ্ছি, স্যার।'

'সার্জেন্ট হায়দারকে দিন।'

মুহূর্ত পরে আরেকটি গলা শোনা গেল। 'সার্জেন্ট হায়দার বলছি, স্যার।'

'শিমুলগঞ্জের ফ্যাক্টরী, হায়দার,' সংক্ষেপে বললেন মেজর। 'যেখানে ফোকাসিং জেনারেটর বানানো হয়। জানা আছে?'

'জ্বী, স্যার।'

'সিল করুন। রেগুলারদের সঙ্গে যোগাযোগ করে লোক জড়ো করুন। এয়ার কভারও করতে হবে! এক ঘণ্টার মধ্যে ওখানে দেখা হবে আপনার সঙ্গে। ততক্ষণে দুর্গ বানিয়ে ফেলুন ওটাকে। মেজর আউট।'

মেজর যখন সশব্দে রেডিও মাইকটা রাখলেন, ল্যাণ্ডরোভার তখন চৌরাস্তার মোড়ে এসে পড়েছে। পুরোটা হুইল ঘুরিয়ে দিলেন তিনি। হিরু চাচা আর মানস হালদার ঢলে পড়ে যেতে যেতে সামলে নিল কোনমতে। ঝড়ের বেগে শিমুলগঞ্জের দিকে ছুটে চলেছে গাড়ি।

তিন

একটু আগে শেষ শীতের একপশলা খামখেয়ালি বৃষ্টি হয়ে গেছে। মিস তসলিমা নাসরীন অফিসে দাঁড়িয়ে জানালা দিয়ে চেয়ে রয়েছে। সুবিস্তৃত চত্বরে ছোট আকারের অনেকগুলো একতলা পাকা দালান। সাদা পোশাকধারী টেকনিশিয়ানরা হন্তদন্ত হয়ে ঢুকছে বেরোচ্ছে। ঢাকা শহরের ব্যস্ততার বাইরে, এই নিরিবিলি গ্রামীণ পরিবেশে, কাজ করতে পারছে বলে নিজেকে আবারও ভাগ্যবতী মনে হলো ওর।

পেছনে 'খুক' করে কাশির শব্দে ঘুরে চাইল তসলিমা। 'আবিষ্কার'-এর পাবলিক রিলেশন্স অফিসার সাবের আহমেদ দরজায় দাঁড়িয়ে। সাঁইত্রিশ-আটত্রিশের কাছাকাছি বয়সের ছিপছিপে লোকটি নার্ভাস প্রকৃতির। পাতলা হয়ে আসা চুলগুলো পরম যত্নে মাঝখানে সিঁথি করে। হাল ফ্যাশনের কাপড় পরতে ভালবাসে ও।

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল তসলিমা। সাবের এমনিতে কঠোর পরিশ্রমী, বাধ্য, কিন্তু কেন যেন ওকে দেখলেই বিরক্তি বোধ করে সে।

'মেজর আজাদের ছেলেটা এসেছে,' জানাল সাবের। 'ভিজিটর পাসও আছে সঙ্গে—ওর ব্যাপারে ফোন করেছিল রিসার্চ সেন্টার থেকে।'

তসলিমা নিশ্চুপ। অযথা কথা খরচ করে না ও।

'কি যন্ত্রণায় পড়া গেল,' হাসার চেষ্টা করে বলল সাবের। 'এ মুহূর্তে ঝামেলা হবে। ওর ভিজিটটা কাকতালীয় হলেই বাঁচোয়া।'

'রিসার্চ সেন্টার আমাদের ইনভেস্টিগেট করতে চাইলে অন্য লোক পাঠাত। কোন ছেলেমানুষকে না।'

'তাই যেন হয়। তাই যেন হয়। তবুও ভয় লাগে তো। এরকম একটা স্টেজে পৌঁছনোর পর...'

'এদের সামলানো আপনার কাজ,' দ্রুত বলল তসলিমা। 'কিন্তু আমি সঙ্গে থাকলে যদি স্বচ্ছন্দ বোধ করেন, থাকব।'

'থাকবেন?' পরম আগ্রহে প্রশ্ন করল সাবের। 'ও রিসেপশনে আছে।'

রিসেপশন এরিয়ায় অপেক্ষমাণ কিশোরের মনে হলো, আবিষ্কার-এর নিরাপত্তার জন্যে কারও বিন্দুমাত্র উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত নয়। কড়া শৃঙ্খলা এখানে। ওর পাসটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছে একজন মুশকো মত সিকিউরিটি গার্ড, ফোনে যোগাযোগ করেছে, এবং সব শেষে 'এক দিনের জন্যে বৈধ', সিল মেরে ফেরত দিয়েছে।

আরেকজন গার্ড রিসেপশনে নিয়ে এসেছে ওকে, সতর্ক করে গেছে, অফিশিয়াল গাইড ছাড়া কোথাও যাওয়া চলবে না। ডিরেক্টর শীঘ্রিই মিলিত হবেন ওর সঙ্গে—বলার ভঙ্গিতে বুঝিয়ে দিয়েছে ও অমন সম্মানের মোটেই উপযুক্ত নয়। এদের রকম সকম দেখে মেজাজ খিঁচড়ে গেছে কিশোরের। তবে মনকে বুঝ মানিয়েছে, দায়িত্ব পালন করছে লোকগুলো।

চওড়া সিঁড়ি বেয়ে দু'জন মানুষ নেমে আসছে ওর দিকে। একজন ফ্যাশনদুরস্ত পুরুষ আর একজন প্রায় সমবয়সী সুন্দরী মহিলা। ওরা এগিয়ে এলে উঠে দাঁড়াল কিশোর, হাত বাড়িয়ে দিল পুরুষটির উদ্দেশে। 'আমাকে এখানে অ্যালাউ করেছেন বলে অসংখ্য ধন্যবাদ, ডিরেক্টর,' বলল ও। এবং মুহূর্তে বুঝে গেল, মস্ত ভুল করেছে। লোকটি আড়ষ্ট ভঙ্গিতে সঙ্গিনীর দিকে চাইছে। মহিলার কণ্ঠে বিদ্রূপ ফুটল।

'তোমার কাছ থেকে কিন্তু নারীবিদ্বেষ আশা করিনি।'

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল কিশোর, 'মানে?'

'আমি তসলিমা নাসরীন। ডিরেক্টর। ইনি সাবের আহমেদ, আমাদের পাবলিক রিলেশন্স অফিসার।'

কিশোর ওদের আর নিজের ওপর খেপে উঠল। পুরুষটিকেই ডিরেক্টর ধারণা করে নেয়াটা বোকামি হয়ে গেছে। 'সরি,' অবস্থা সামাল দিতে চেষ্টা করল।

'ইটস অল রাইট। অনেকেই এ ভুলটা করে,' মিষ্টি করে বলল তসলিমা। 'এসো, ঘুরে দেখা যাক। তোমার ডাক নাম তো কিশোর, না? সুইট নাম।'

এক ঘণ্টা বাদে, পায়ের ব্যথায় মেজাজ তিরিক্ষে হয়ে গেল কিশোরের। সাবের আহমেদ আর তসলিমা নাসরীন ওকে ল্যাবোরেটরীর পর ল্যাবোরেটরী ঘুরিয়ে, বিরক্তিকর আর দুর্বোধ্য সব এক্সপেরিমেন্টের বর্ণনা শুনিয়েছে। নতুন ধরনের জ্বালানী, দালান নির্মাণ আর খাদ্যসামগ্রী সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন করতে করতে হাঁফিয়ে উঠেছে ও। কম্পিউটার, চার্ট, ডায়াল দেখতে দেখতে পচে গেছে চোখ। ওর যে সায়েন্টিফিক ট্রেনিং নেই, সেটা বুঝে যথাসম্ভব কঠিন করে সব ব্যাখ্যা করেছে ওরা। তবে সবচেয়ে বাজে ব্যাপার হচ্ছে, পুরো সময়টাই পানিতে গেছে। কিছুই জানতে পারেনি কিশোর। প্ল্যান চুরির কথা নাকি শোনেইনি ওরা। কে বা কারা কাজটা করেছে সে সম্বন্ধেও নাকি কোন ধারণা নেই।

কিশোর ক্লান্ত পায়ে মেইন গেটে ফেরার সময়ও বকবক করে কানের পোকা বের করে দিয়েছে গাইডরা।

'যার তার পক্ষে আমাদের রিসার্চ সম্পর্কে আইডিয়া করা সম্ভব নয়,' শেষ পর্যায়েও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের সুযোগ ছাড়েনি সাবের।

মসৃণভাবে কথা কেড়ে নিয়েছে তসলিমা। 'আমরা এখানে প্রাথমিক পর্যায়ের থিয়োরিটিকাল কাজ-কর্ম করি। প্র্যাকটিকাল স্টেজে পৌঁছলে সরকারের কাছে হ্যাণ্ডওভার করে দিই। বড় বাজেটের দরকার হয় তো, তাই।'

একটা লম্বা মত, নিচু দালানের পাশ দিয়ে এ মুহূর্তে যাচ্ছে ওরা। দরজা খোলা। দেখে মনে হয় পরিত্যক্ত। 'ওটায় কি?' কৌতূহল প্রকাশ করল ও। কেউ বাধা দেয়ার আগেই আগ বাড়িয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল।

একটা পরিচ্ছন্ন কংক্রিটের রুমে নিজেকে খুঁজে পেল ও। মাঝখানে রাখা লম্বা ওয়র্ক বেঞ্চটিতে ক্ল্যাম্প, লেজ, ভাইস আর অন্যান্য ধাতব যন্ত্রপাতি। উল্টোদিকের দেয়ালে ভারী একজোড়া ধাতব দরজা।

জানালাবিহীন ঘরটিতে ঠাণ্ডা আলো বিতরণ করছে ওভারহেড ফ্লুরেসেন্ট বাতি। গোটা ঘরটা ল্যাবোরেটরী নয় বরঞ্চ গ্যারাজের কথা মনে করিয়ে দেয়। সাবের আর তসলিমা ওকে অনুগমন করেছে। ওর দু'পাশে মাছির মত ভনভন করছে দু'জনে, ঠেলেঠুলে নিয়ে যেতে চাইছে দরজার দিকে। 'এখানে কি হয়?' পাত্তা না দিয়ে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'কিছু না,' ঠাণ্ডা গলায় বলল তসলিমা। 'কেন, দেখছ না, এই সেকশনটা এমনি পড়ে আছে?'

'একটু আগেই তো বলছিলেন ল্যাবোরেটরীর কমতি আছে আপনাদের। এ ঘরটা ইউয করছেন না কেন?'

সাবের আর তসলিমার দৃষ্টি বিনিময় হলো। ওদের ভেতরকার উত্তেজনা যেন অনুভব করতে পারল কিশোর। একটা বোর্ডের সামনে গিয়ে মলিন হয়ে আসা একটা নোটিশে চোখ রাখল ও। 'সালাম চৌধুরী, রোবটিক্স সেকশন,' জোরে জোরে পড়ল। ভ্রূ কুঁচকে স্মৃতি হাতড়াচ্ছে ও। 'ও হ্যাঁ, কিছুদিন আগে এখান থেকে চলে গেছেন উনি, তাই না? কাগজে এ নিয়ে বেশ লেখালেখি হয়েছিল।'

'হ্যাঁ, হয়েছিল,' বলল তসলিমা, বহুকষ্টে নিয়ন্ত্রণ করছে নিজেকে। 'প্রথাগত সাইন্সের বিরুদ্ধে চলে গিয়েছিলেন ভদ্রলোক।'

নার্ভাস হেসে যোগ করল সাবের। 'একদম। অলটারনেটিভ টেকনোলজি নিয়ে মেতে উঠেছিলেন।'

ধাতব দরজাগুলোর দিকে এগিয়ে গেল কিশোর। 'ওপাশে কি?' সাবের ওর সামনে শরীর গলিয়ে দিল, পথ রোধ করেছে। 'স্টোররুম,' দ্রুত বলল। 'প্রফেসর চৌধুরী কিছু মূল্যবান যন্ত্র রেখে গেছেন। উনি ওগুলো নিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত আমাদের দায়িত্বে থাকবে।'

তসলিমা দরজার দিকে আঙুল উঁচাল। 'এসো, কিশোর। আমাদের ট্যুর শেষ। তোমার নিশ্চয় আরও কাজ আছে—আমাদের কিন্তু আছে।'

কিশোর উপলব্ধি করল, বেশি ঘাঁটানো ঠিক হবে না। 'হ্যাঁ, অবশ্যই—আপনাদেরকে আবারও ধন্য—' একটা পা পিছলে গেলে কথা শেষ করতে পারল না। সাবের এক লাফে আগে বেড়ে ওর একটা কনুই চেপে ধরল, নইলে হেনস্থার শেষ থাকত না।

'এসব জায়গায় ঘোরাফেরা খুবই বিপজ্জনক,' বলল সাবের। প্রচ্ছন্ন

হুমকিটা বুঝতে বেগ পেতে হলো না কিশোরকে। তসলিমা খপ করে ওর আরেকটা কনুই ধরে বলল, 'ভাগ্য ভাল, চোট পাওনি।' দু'জনে দু'পাশ থেকে ধরে কিশোরকে নিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে।

আজাদ চাচার দেয়া গাড়িতে করে ফেরার পথে রাজ্যের কৌতূহল ভিড় জমাল কিশোরের মনে। ওই খালি ল্যাবোরেটরী আর প্রফেসর সালাম চৌধুরীর ব্যাপারে সন্দেহ হচ্ছে। সালাম চৌধুরী বেশ কিছুদিন হলো 'আবিষ্কার' ছেড়ে চলে গেছেন, তার পর থেকে জোর গলায় প্রচার চালিয়েছেন, প্রথাগত বিজ্ঞান মানবজাতিকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। কিন্তু তাঁর ওয়র্কশপটা অন্য কাউকে দেয়নি কেন ওরা? কাজ বন্ধ, তবে তাজা মেশিন অয়েলে পা হড়কে গেল কেন কিশোরের? প্রফেসরের পরিত্যক্ত ল্যাবোরেটরীতে ওর ক'মিনিটের অবস্থান, কী ভয়ঙ্কর উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল তসলিমা আর সাবেরের মধ্যে, ভেবে সন্দেহটা আরও গাঢ় হলো। কিছু একটা ঘটছে ওখানে।

রাস্তার পাশে একটা তিনতলা হোটেল দেখে ড্রাইভারকে গাড়ি থামাতে বলল কিশোর। কাউন্টারে দুটো টাকা দিয়ে ফোন করল চন্দনপুর রিসার্চ সেন্টারে। রিজভী করিমের কাছ থেকে জেনে নিল প্রফেসর চৌধুরীর বাড়ির ঠিকানা।

ল্যাণ্ডরোভারের প্যাসেঞ্জার সীটে বসে ঠাণ্ডায় হিড়হিড় করে কাঁপছে মানস হালদার। ওভারকোটটা নিয়ে আসেনি বলে আফসোস করছে। সঙ্গীদের দিকে চাইল। শীতে তাদেরকে কাবু করতে পেরেছে মনে হলো না। পাশে মেজর একটা ম্যাপ পরীক্ষা করছেন, গায়েই মাখছেন না মাঘের শীত। পেছনের সীটে চোখ মুদে শুয়ে আছে হিরু চাচা।

ছোট একটা ফ্যাক্টরীর কম্পাউণ্ডের বাইরে, এক ফালি জমিতে গাড়ি পার্ক করেছে ওরা। শেষ বিকেল। সাঁঝ ঘনিয়ে আসছে দ্রুত, অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে বাড়ি-ঘর আর গাছ-পালার আউটলাইন। চারপাশে বিষণ্নতার মধ্যে নড়াচড়ার শব্দ কানে এল মানসের। বুট জুতোর পদচারণা, লোহালক্কড়ের ঝনঝনাৎ, কখনও বা পাসওয়ার্ডের বিড়বিড়ানি শোনা যাচ্ছে। মাথার ওপরে একঘেয়ে আওয়াজ তুলে পাহারা দিয়ে যাচ্ছে হেলিকপ্টারগুলো। 'সামান্য একটা ইলেকট্রনিক্স ফ্যাক্টরীর জন্যে এত আয়োজন?' বলল ও। পেছন

থেকে হিরু চাচা কথা বলে উঠল। 'সামান্য বলছেন কেন? ডিসিনটিগ্রেটর গান টার্গেটের ওপর শক্তিশালী এনার্জি বিম ফোকাস করে। ওকাজে ফোকাসিং জেনারেটর ইউজ করতে হয়। যন্ত্রটা শুধুমাত্র এই কারখানাতেই তৈরি হয়। ঠিক বলেছি, দোস্ত?'

সায় জানালেন মেজর, চোখ সরালেন না ম্যাপ থেকে।

'সেজন্যেই আমার দোস্ত এই সামরিক মহড়ার ব্যবস্থা করেছে।'

ম্যাপ থেকে দৃষ্টি ফেরালেন মেজর। 'এখন কেউ, মানে কোন কিছুই এখানে আর ঢুকতে পারবে না।'

'তোর কথা সত্যি হলেই ভাল,' বলল হিরু চাচা।

'তুই শিয়োর হতে পারছিস না? চৌহদ্দির প্রতিটা ইঞ্চি পাহারা দিচ্ছে আর্মড গার্ড। হেলিকপ্টার টহল মারছে।' ম্যাপে টোকা দিয়ে বিষয়টিকে আরও উষ্ণ করে তুললেন মেজর। 'ফ্যাক্টরীর ভেতরে একটা ভল্ট আছে। সেফ নয়, ভল্ট। দরজার বাইরে গার্ড পাহারা দিচ্ছে। ভল্টের মধ্যে একটা সিলড মেটাল বাক্সে সব ক'টা ফোকাসিং জেনারেটর রাখা। বিশ্বাস কর, দোস্ত, এখানে ঢোকা অসম্ভব।'

চিন্তিত ভঙ্গিতে নাক চুলকে নিল হিরু চাচা। 'টাইটানিকের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে।'

'মানে?' অবাক হয়ে জানতে চাইল মানস।

'বলা হয়েছিল না ডুববে না? কিন্তু প্রথম রাতেই–টুপ্পুস!' মজার গলায় বলল।

অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এল এক দীর্ঘদেহী। স্যালুট ঠুকেছে। আগ্রহ নিয়ে চাইলেন মেজর। 'ও, হায়দার। সবাইকে রেডি রেখেছেন তো?'

'ইয়েস, স্যার। সবাই রেডি। একটা ইঁদুরও গলতে পারবে না।'

'শুনলি?' বিজয়ীর মত হিরু চাচার দিকে তাকালেন মেজর।

মাথা ঝাঁকাল হিরু চাচা। উঠে বসল হঠাৎ। নতুন একটা চিন্তা খোঁচা দিয়েছে তার মনে।

'তারপরও একটা ফাঁক রয়ে গেছে।'

'কি বলতে চাইছিস?'

নীরবে একটা লম্বা আঙুল তাক করল হিরু চাচা–মাটির দিকে।

ভল্টে পাহারারত যুবক গার্ডটিকে আশ্বস্ত করেছে হায়দার। ভয়ের কিছু নেই। চারদিক ঘিরে রেখেছি আমরা, এমনকি আকাশও তোমার কাছে কখনও আসতে হলে আগে আমাদের ডিঙাতে হবে। তখনকার মত বুকে বল পেয়েছে যুবক। কিন্তু এ মুহূর্তে, একাকী আধ ঘণ্টা ডিউটি দেয়ার পর নার্ভাস বোধ করছে ওজব মতে, ভয়ঙ্কর কারও আক্রমণের আশঙ্কা করা হচ্ছে—এবং ওটা যদি হয় তা প্রতিরোধ দেয়ার দায়িত্ব ওরই কাঁধে বর্তেছে।

হঠাৎ জমে গেল গার্ড, উৎকর্ণ। আওয়াজ, একটা চাপা দুম দুম আওয়াজ আসছে না ভল্টের ভেতর থেকে? শুনছে ও—নৈঃশব্দ্য। শুরু হলো আবারও। হলো কি? নিছক কল্পনা নয় তো? সার্জেন্টকে ডাকবে কিনা ভাবল ও। কিন্তু পুরোটাই যদি শুধু আজগুবী চিন্তা হয়? চেক করে দেখাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে—হাসির খোরাক হতে চায় না ও।

ভল্টের লক খুলল ও। দরজা খুলতে ভারী হুইলটা ঘুরিয়ে দিল। এবার সন্তর্পণে শরীর গলিয়ে দিল ভেতরে। কই, সবই তো স্বাভাবিক। মূল্যবান বাক্সটা ওই তো টেবিলে রাখা—আগের মতই। চাপা শব্দটা আরম্ভ হয়েছে আবার। বাড়ছে, বেড়েই চলেছে। ওর পায়ের তলা থেকে আসছে! অবিশ্বাসের চোখে, ভল্টের কংক্রিটের মেঝে নিচ থেকে বিস্ফোরিত হতে দেখল ও। একটা বাঁকাচোরা গর্ত তৈরি হয়েছে—লম্বা ধাতব একটা হাত ওকে ধরতে বেরিয়ে এল। ভীত-সন্ত্রস্ত গার্ড সাব-মেশিনগান থেকে অবিরাম গুলিবর্ষণ করতে লাগল…

চার

হিরু চাচা, মানস আর মেজর আজাদ ল্যাণ্ডরোভারে বসে গোলাগুলির শব্দ শুনতে পেলেন—একটু পরের তীক্ষ্ণ, শ্বাসরুদ্ধকর আর্তচিৎকারটাও কান এড়াল না। হিরু চাচা লাফিয়ে নেমে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল ফ্যাক্টরীর উদ্দেশে। তার পিছু পিছু ছুট লাগালেন মেজর আর মানস।

ভল্টের বাইরে, হায়দার একদল সৈন্যকে নিয়ে কঠিন দরজাটা ভাঙার চেষ্টা করছে, একটা ভারী ধাতব ওয়ার্কবেঞ্চ দিয়ে।

'বাইরে থেকে দরজা খোলা হয়েছিল, স্যার,' হাঁফাতে হাঁফাতে বলল সার্জেন্ট। 'তারপর আবার ভেতর থেকে বন্ধ করা হয়েছে। কিছু একটা আছে ওপাশে। বড় কিছু। হাঁটাহাঁটি করতে শুনেছি। এই, ঠেলা মারো সবাই।' সেনাবাহিনীর ছ'জন জোয়ানের বারোটা শক্তিশালী হাত সজোরে ধাক্কা মারল ভল্টের দরজায়, ভারী বেঞ্চটা দিয়ে। আরও দু'বার আঘাতের পর হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল দরজা। অস্ত্র বাগিয়ে ধরে, ছোট্ট গ্রুপটা হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়ল ভেতরে।

ফাঁকা—শুধু এক কোণে পড়ে আছে গার্ডের মৃতদেহ। মেঝের মধ্যখানে মস্ত একটা হাঁ। ধাতব বাক্সটা উধাও।

ভ্রূ কুঁচকে গর্তে চোখ রাখল হিরু চাচা। 'বড়সড় কোন ইঁদুরের কাণ্ড, দোস্ত। আমাদেরও বড় সাইজের বেড়ালের ব্যবস্থা করতে হবে।'

ক্ষিপ্ত মেজর ফিরলেন হায়দারের দিকে। 'গোটা এরিয়া সার্চ করুন। সুরঙ্গের অন্য মুখটা খুঁজে বার করা চাই—এক্ষুনি!'

আধ ঘণ্টা পরে পাওয়া গেল সুরঙ্গ। ওটাকে গোপন রাখার কোন চেষ্টাই করা হয়নি। ছ'ফুট ব্যাসের গর্তটা সোজা গিয়ে মিশেছে ছোট্ট একটা টিলার একপ্রান্তে—ওখান থেকে দেখা যায় কারখানাটাকে। পোর্টেবল ল্যাম্প সহ রিসার্চ সেন্টারের একদল কর্মী চক্কর মেরে এল টিলাটা। কিন্তু মেটাল ডিটেক্টর ব্যবহার করেও কিছু খুঁজে পেল না। 'ওটাকে, স্যার,' বলল হায়দার। 'ঠিক সুরঙ্গ বলা যায় না। প্রপ-ট্রপ কিছুই নাই। মাটি খুঁড়ে গুহার মত বানিয়েছে। ওটা দিয়ে যে গেছে সে বাতাসের অভাবে মরবে।'

মাথা ঝাঁকাল হিরু চাচা। এতটুকু অবাক হয়নি। 'ওর শ্বাস-প্রশ্বাসের দরকারই পড়ে না।'

গহ্বরের দূরপ্রান্তে তাদেরকে নিয়ে গেল হায়দার। 'এগুলোও পেয়েছি, স্যার।' একসার পদচিহ্ন চলে গেছে জঙ্গলের দিকে, অতিকায় পা দুটোর পারস্পরিক ব্যবধান দেখে মানুষের মনে করার কোনই উপায় নেই। 'জঙ্গলে মিশে গেছে। পাতার কারণে ছাপ পড়েনি।'

পায়ের ছাপগুলোর পাশে হাঁটু গেড়ে বসল হিরু চাচা, দীর্ঘক্ষণ ধরে পরীক্ষা করল। মাপল। শেষমেশ, সিধে হয়ে ল্যাণ্ডরোভারের দিকে মেজরদের ফিরিয়ে নিয়ে চলল। ঘন অন্ধকার এখন, চার্জলাইট দেখিয়ে পথনির্দেশ করছে হায়দার।

চন্দনপুর ল্যাবোরেটরীতে ফেরার পথে মেজর বললেন, 'দোস্ত, এবার কিসের বিরুদ্ধে লড়ছি আমরা? ভিনগ্রহীদের বিরুদ্ধে?'

কোঁকড়া চুলে আঙুল বুলাচ্ছে হিরু চাচা। পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ল। 'একটা নতুন ধরনের অস্ত্র হাত করতে ভিনগ্রহবাসীরা পৃথিবী রেইড করবে কেন? ওরা আমাদের চেয়ে বুদ্ধিমান হলে অমন অস্ত্র অনেক আগেই নিশ্চয় তৈরি করে বসে আছে।' নিজের অকাট্য যুক্তিতে খুশি হয়ে উঠল সে। চাপড় মারল মেজরের কাঁধে। একটু বেশিই জোর দিয়ে ফেলেছে। বিপজ্জনকভাবে বেপথে চলে গেল ল্যাণ্ডরোভার।

মেজর ড্রাইভিঙে মনোযোগ ফেরালেন। 'তবে কি বিদেশী এজেন্ট?'

এবারও, পাল্টা প্রশ্নে জবাব দিল হিরু চাচা। 'তারা প্ল্যানটা চুরি করতে পারে–কিন্তু জিনিসটা বানানোর জন্যে যন্ত্রপাতি চুরির ঝামেলায় যাবে কোন্ দুঃখে? তাদের দেশের ওটুকু রিসোর্স নিশ্চয় থাকবে।'

'তবে কারা করছে এসব?' অসহায়ের মত প্রশ্ন করল মানস।

খানিক ভেবে চিন্তে মুখ খুলল হিরু চাচা। 'আমার মনে হয় শত্রু আমাদেরই দেশের। অ্যাডভান্সড টেকনোলজিতে সিদ্ধহস্ত কিছু লোক বদমাশিটা করছে, আজব ধরনের একটা অস্ত্রের সাহায্যে। এমন এক অস্ত্র, যেটা হাঁটাচলা করে, চিন্তা-ভাবনাও করতে জানে।'

'ওদের সম্বন্ধে আর কি কি জানি আমরা?' ঘোঁতঘোঁত করে উঠলেন মেজর।

'জানি, ওরা নিজেদের প্রোটেকশনের জন্যে খুন করতেও দ্বিধা করে না।'

প্রফেসর সালাম চৌধুরীর সঙ্গে আলাপ করে বিশেষ কিছুই জানতে পারল না কিশোর। টাক মাথার গোলগাল বেঁটে মানুষটি তাঁর ল্যাবোরেটরী তথা লিভিংরুমে ছুটোছুটি করে বেড়িয়েছেন–ওর কোন প্রশ্নেরই জবাব দেননি। 'সরি, খোকা, তোমাকে সাহায্য করতে পারছি না। কেন তোমাকে পাঠানো হয়েছে মাথায় আসছে না আমার।' অবিন্যস্তভাবে গাদা করে রাখা এক মানুষ সমান মোটা মোটা বইয়ের আড়ালে গা ঢাকা দিলেন।

কিশোরও নাছোড়বান্দা। বইয়ের ডাঁইয়ের কোণ ঘুরে মুখোমুখি হলো ভদ্রলোকের। 'আসলে আবিষ্কার-এর পরিবেশটা একটু গোলমেলে ঠেকায়

আপনার সঙ্গে–'

পাইপে প্রাণপণে টান মারলেন সালাম চৌধুরী, ফুলকির ঝর্না তাঁর পুরু গোঁফে আগুন ধরিয়ে দেয় আরকি। 'ওদের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়েছি। টেকনোলজির ওই রাস্তাটা পছন্দ করতে পারছিলাম না।' পাইপটা জোরে ঝাঁকালেন কিশোরের দিকে। 'ওটা ছিল ধ্বংসের পথ। আমি এখন বিকল্প খোঁজার চেষ্টা করছি।'

বোদ্ধার মত মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'সোলার সেল, উইণ্ডমিল থেকে হীট গ্রহণ, এসব?'

কিশোর তাঁর সারাজীবনের অধ্যবসায়কে দু'কথায় ব্যাখ্যা করল দেখে সন্তুষ্ট হতে পারলেন না বিজ্ঞানী। 'হুঁ,' তিক্তকণ্ঠে সম্মতি জানালেন, 'ওসবই। খুবই জটিল আর সম্ভাবনাময় ফিল্ড। হাতে প্রচুর কাজ, দেখতেই পাচ্ছ।' ডান হাতের তর্জনী ঘুরিয়ে আনলেন লম্বা, বিশৃঙ্খল ঘরটির ওপর, একই সঙ্গে সতেরোটি এক্সপেরিমেন্ট চলছে। গ্লাসের ট্রেতে আজব ধরনের ছত্রাক বেড়ে উঠেছে। একটা টেবিলে অবিরাম ঘূর্ণায়মান কি যেন মেশিন, কেতলির বাষ্পে ভটভট করে চলছে। শিশি-বোতল, টেস্টটিউব, ডিম-পরোটার অবশিষ্টাংশ একটা বেঞ্চিতে। ছোট্ট একটা ধাতব ওয়র্কবেঞ্চ, লেদ–আবিষ্কার-এর ল্যাবোরেটরীরই একটা ক্ষুদ্র সংস্করণ। কোন সন্দেহ নেই; প্রফেসর চৌধুরী অসম্ভব ব্যস্ত। সেটা জোরদার করার জন্যেই যেন, বেঁটে প্রফেসর এক ধাক্কায় দরজা খুলে, ধৈর্য ধরে কিশোরের বিদায়ের অপেক্ষা করতে লাগলেন।

বেরনোর সময় শেষ চেষ্টা করতে দাঁড়িয়ে পড়ল কিশোর। 'আবিষ্কার আপনার রোবটিক্সের কাজটা চালিয়ে যাচ্ছে কিনা বুঝতে পারলাম না– আপনাকে না জানিয়ে আপনার যন্ত্রপাতি ইউয করছে হয়তো।' প্রতিক্রিয়া আশা করেছিল কিশোর, পেল।

'আমার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত যন্ত্রপাতিও চলে এসেছে। আর অন্য কেউ আমার কাজটায় হাত দেয়নি, কারণ কারও সাধ্যই নেই। আচ্ছা, এবার!'

প্রফেসরের ল্যাবোরেটরী ফেরত কিশোরের মনে হলো, ভিজিটটা বিফলে যায়নি। ভদ্রলোকের প্রতি ক্ষোভ জন্মায়নি ওর। উনি একটু অদ্ভুত ধরনের হলেও ভালমানুষ, আবিষ্কার-এর ওই জুই কপটাচারীর সঙ্গে এখনও সম্পর্ক রেখেছেন ভাবতে পারল না। তাছাড়া, নিজের মুখেই তো বললেন,

সব যন্ত্রপাতি নিয়ে এসেছেন। সাবের মিথ্যে বলেছিল। তাহলে ওই ধাতব দরজা দুটোর ওপাশে কি? জানা যায় কিভাবে? বুক পকেট থেকে ভিজিটর পাসটা বের করল কিশোর। 'এক দিনের জন্যে বৈধ,' পড়ল ও। দেরি হয়ে গেলেও দিন তো ফুরিয়ে যায়নি। চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কি!

পঞ্চাশ মিনিট পরে আবিষ্কার-এর মেইন গেটের বাইরে পার্ক করল কিশোরের গাড়ি। সন্দেহপ্রবণ গার্ডটির দিকে চেয়ে মিষ্টি হাসল ও। 'আমার নোটবুকটা ফেলে গেছি–ওই খালি ঘরটায়। ওখানে নোটস নিচ্ছিলাম তো, ফেরার সময় কোন্ ফাঁকে পড়ে গেছে। একটু খুঁজলেই পেয়ে যাব। আপনাদের ডিরেক্টরকে বিরক্ত করার দরকার হবে না। জায়গাটা তো খালিই, আমি গেলে কোন ক্ষতি তো নাই। তাছাড়া, আমার পাসও ভ্যালিড আছে...' ক্ষীণ হয়ে এল ওর গলা। প্রভাবিত করতে পেরেছে মনে হলো না, খুব সম্ভব ফিরিয়ে দেবে।

'দেখি,' বলে ছোট্ট বুদটার ভেতর ঢুকে পড়ল গার্ড, ফোনে কথা বলল ক'মুহূর্ত।

তসলিমা কিংবা সাবের এলে কি করবে ভাবছে কিশোর, চাপাবাজি চালাবে ঠিক করল।

শেষ পর্যন্ত বেরিয়ে এল গার্ড। 'যেতে পারেন। কিন্তু দেরি করবেন না।'

নিজের সাফল্যে কিশোর হতভম্ব, ড্রাইভারকে বলল ভেতরে গাড়ি ঢোকাতে। লম্বা, নিচু রোবটিক্স ল্যাবোরেটরীর দিকে ছুট লাগাল ও। খোলা দরজাটা যেন আমন্ত্রণ জানাচ্ছে ওকে। আশায় বুক বেঁধে ঢুকে পড়ল। কোন পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে না। যেখানটায় পা হড়কে গিয়েছিল সেখানে হাঁটু গেড়ে বসল, মেঝেতে আঙুল বুলিয়ে ধরল নাকের কাছে। যা ভেবেছিল–মেশিন অয়েল, সদ্য চলকে পড়েছে।

হঠাৎ একটা মড়মড় শব্দ শুনতে পেল। ঘরের ওপাশের দরজা প্রচণ্ড ধাক্কায় খুলে গেছে। মুখ তুলে চাইল কিশোর, ভয়ে চেঁচাতেও ভুলে গেছে। মানুষাকৃতির অস্বাভাবিক লম্বা একটি ধাতব দেহ দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে। একটি বজ্রগম্ভীর কণ্ঠস্বর গমগম করে উঠল। 'কে আপনি? এখানে কি চাই?' রোবটটা এগিয়ে আসছে সদম্ভে, ধাতব দু'হাত বাড়ানো, জ্ঞান হারাল কিশোর...

চেতনা ফিরে পেলে, চেয়ারে বসে থাকতে দেখল নিজেকে। দুটো মুখ চেয়ে রয়েছে ওর দিকে। সাবের আর তসলিমা। উদ্বেগের ছাপ স্পষ্ট সাবেরের চেহারায়–কিন্তু তসলিমা নাসরীন তার বিদ্বেষপূর্ণ আনন্দ গোপন করতে চেষ্টা করেনি। সাবেরের দূরাগত কণ্ঠস্বর শুনতে পেল কিশোর। 'ভেরি ভেরি সরি। আর ইউ অলরাইট? তোমার সঙ্গে একটু মজা করলাম। এতখানি ঘাবড়ে যাবে ভাবতে পারিনি।'

সোজা হয়ে বসতে রীতিমত কসরৎ করতে হলো কিশোরকে। 'সরি, আপনাদের সেন্স অভ হিউমারের প্রশংসা করতে পারছি না।'

মুচকি হাসল তসলিমা। 'তুমি রোবটটা না দেখে ছাড়বে না, তাই আরকি–এটাই তো চেয়েছিলে তুমি, না?'

'অনেকটা তাই।'

নার্ভাস হাসল সাবের। 'তুমি মেইন গেটে খোঁজখবর নিচ্ছ শুনে বুঝে গেছি কেন এসেছ। তাই আগেই এখানে এসে রোবটটাকে চালু করে দিয়েছি।'

ধাতব দরজা দুটোর দিকে চাইল কিশোর। চোখে আতঙ্ক। দরজা বন্ধ এমুহূর্তে। 'ওটা কি ভেতরেই আছে?'

'হ্যাঁ। কেন, দেখবে আবার?'

মিস তসলিমার কণ্ঠে চ্যালেঞ্জের ছোঁয়া। কিন্তু কিশোর দমবার পাত্র নয়। 'দেখালে তো খুবই ভাল হয়।'

তসলিমার চোখের ইশারায় সাবের জোড়া দরজার ওপাশে চলে গেল। মিনিট পাঁচেকের অস্বস্তিকর অপেক্ষার পর মুখ খুলল কিশোর, 'এত দেরি হচ্ছে কেন?'

'কন্ট্রোল সার্কিট চেক করছেন। সব কিছু সেফ কিনা শিয়োর হতে হবে।'

'তারমানে ওটা সবসময় হার্মলেস নাও হতে–' দরজা খুলে যেতে দেখে কথাটা গিলে নিল কিশোর। দৈত্যাকৃতি যন্ত্রমানবকে বেরিয়ে আসতে দেখে গলা শুকিয়ে গেল ওর। সাবের আসছে ওটার পেছন পেছন, বামনের মত দেখাচ্ছে তাকে। সোজা কিশোরের দিকে হাঁটা দিয়েছে রোবট, ভয়ে কুঁকড়ে গেল ও।

দ্রুত বলে উঠল তসলিমা। 'স্টপ!' থেমে পড়ল রোবটটা।

ভীতি আর মুগ্ধতা নিয়ে ওটাকে লক্ষ করছে কিশোর। ভীষণ ঢ্যাঙা-সাড় ফুটেরও বেশি হবে। অতিকায় পা, বিপুল ধড়, লম্বা একজোড়া হাত দেখে যে কোন সাহসী লোকও ভড়কে যাবে। মস্ত মাথাটাও কম আতঙ্কজনক নয় চোখের কোটর থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে লাল আলো, মুখের জায়গায় একটা ধাতব গ্রীল। গোলাকার কপালে একাধিক বাতি দপদপ করছে ফ্লুরেসেন্ট লাইটের তলে দাঁড়ানো নিথর দৈত্যটার শরীর থেকে মৃদু আলো ছড়াচ্ছে কিশোর লক্ষ করল, যন্ত্রটাকে রূপালী ধাতু দিয়ে বানানো হয়েছে, শরীরে হালকা নীল রঙ পেইন্ট করায় চকচকে ভাবটা আরও বেড়েছে।

লম্বা শ্বাস টেনে তসলিমার দিকে ফিরল ও। 'কি কাজ এটার?'

'ওটাকেই জিজ্ঞেস করো। ওটা ভয়েস-কন্ট্রোলড।'

ঘাড় উঁচু করে রোবটটার চেহারায় তাকাল কিশোর। 'কি করো তুমি?'

গুরুগম্ভীর ধাতব কণ্ঠটি জবাব দিল: 'অপর্যাপ্ত ডাটা।'

'আরও স্পেসিফিক হতে হবে,' জানাল সাবের।

আবার চেষ্টা করল কিশোর। 'তোমার কাজটা কি? উদ্দেশ্যই বা কি?'

'আমি পরীক্ষামূলক রোবট এস-১। আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে নানারকম বিপজ্জনক ক্ষেত্রে মানুষের বিকল্প হিসেবে কাজ করা। আমাকে প্রোগ্রাম করা হয়েছে সব ধরনের মাইনিং অপারেশন, রেডিও-অ্যাকটিভ জিনিস হ্যাণ্ডলিং এবং–'

'টারমিনেট!' মিস তসলিমার নির্দেশে বোবা মেরে গেল যন্ত্রটা।

কৌতূহলী চোখে ওর দিকে তাকাল কিশোর। 'এতসব রহস্য কেন?' প্রশ্ন করল। 'থামিয়ে দিলেন কি জন্যে? প্রথমবার যখন এলাম তখন এটাকে দেখাতে কি দোষ ছিল?'

'কেন দেখাব? তোমাকে এখানে ভিজিট করার সুযোগ দেয়া হয়েছে। কিন্তু তুমি সেই সুযোগ নিয়ে আমাদের গোপন ব্যাপারে নাক গলাতে চেয়েছ।'

'সরি।'

তসলিমার ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। কারণ কিশোর পরক্ষণেই একটা অপ্রত্যাশিত প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছে। 'এটা কি ডেঞ্জারাস?'

একটু দ্রুতই জবাবটা দিয়ে ফেলল সাবের। 'ডেঞ্জারাস? কি যে বলো!

ডেঞ্জারাস হতে যাবে কেন?'

'কেন যেন মনে হলো, বাজে লোকের হাতে পড়লে এটা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে।'

তসলিমার চেহারায় শীতল ক্রোধ ফুটতে দেখা গেল 'যেমন এমন?' ফিরল রোবটটার দিকে। 'এই ছেলেটা গুপ্তচর। ওকে জীবিত বেরোতে দেয়া যাবে না এখান থেকে। মেরে ফেলো!'

ধীরে ধীরে প্রাণ ফিরে পেল রোবট কিশোরের দিকে আবারও এগিয়ে আসছে। দরজার দিকে দৌড়নোর চেষ্টা করল কিশোর, কিন্তু সবের পথরোধ করেছে। এক কোণে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে ওকে রোবটটা, এবার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

দেয়ালে সেঁটে গিয়ে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে লাগল কিশোর...

পাঁচ

ডান হাতটা কিশোরের গলা থেকে ইঞ্চি দুয়েক দূরে থাকতে থেমে গেল রোবট। টলে উঠে পেছনে সরে গেল ক'পা।

ধমকে উঠল তসলিমা। 'মারো ওকে!'

লাফিয়ে সামনে বেড়ে আবারও থেমে পড়ল ওটা। 'আদেশ পালন করতে পারছি না। আমার প্রোগ্রামের সঙ্গে এই আদেশ মিলছে না।'

'ফালতু কথা,' গর্জে উঠেছে তসলিমা। 'তুমি অর্ডার পালন করতে প্রোগ্রামড।'

রোবটটা অসহায় মানুষের ভঙ্গিতে হাত রাখল মাথায়। 'আমি আদেশ পালনে বাধ্য...পালন করতে পারছি না...আমি আদেশ পালনে বাধ্য...পালন করতে পারছি না...' হাঁটু মুড়ে এল ওটার, ঝুলে পড়েছে মাথা। ধাতব মুখটায় অব্যক্ত যন্ত্রণা দৃষ্টি এড়ায়নি কিশোরের।

'টারমিনেট! আদেশ প্রত্যাহার করা হলো!'

এক মুহূর্ত তেমনিভাবে রইল রোবট। তারপর সিধে হয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকল।

তসলিমার দিকে ঘুরল কিশোর 'আরেকটা জোক করলেন?'

'প্র্যাকটিকাল একজিবিশন। দারুণ না?'

সাবের যোগ দিল আলোচনায়। 'মানুষকে সেবা করতেই তৈরি করা হয়েছে ওটাকে—ক্ষতি করতে নয়।'

কিশোর রীতিমত উত্তেজিত এবং ক্ষুব্ধ। 'কাজটা ভাল করেননি।'

ঠাণ্ডা হাসল তসলিমা। 'ভয় পাইয়ে দিয়েছি বলে?'

'আমার কথা বলছি না—ওর ব্যাপারে বলছি।' রোবটটার দিকে ইশারা করল কিশোর। 'ওর কষ্ট হয়েছে।'

'ওটা একটা যন্ত্র—মানুষ তো নয়। কোন অনুভূতিও নেই।'

'ব্রেইন তো আছে। মানুষের মতই কথা বলে, চলাফেরা করে। ফিলিংস নাই তাই বা শিয়োর হচ্ছেন কি করে?' ক্রুদ্ধ কিশোর যুক্তিতর্কের ধার না ধেরে হেঁটে গেল রোবটটার কাছে। 'তুমি ঠিক আছ তো?'

মস্ত মাথাটা ওকে দেখতে ফিরল। 'আমার প্রোগ্রামিং ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি।'

'কিন্তু তুমি তো কষ্ট পেয়েছ—চেহারাই বলেছে।'

'প্রোগ্রামিঙের সঙ্গে অর্ডারের বনিবনা না হলে মাথার সার্কিটে গোলমাল দেখা দেয়।'

'আমি দুঃখিত। জানোই তো, আইডিয়াটা আমার ছিল না...'

'গণ্ডগোল সেরে গেছে।' দু'মুহূর্তের জন্যে বিরতি দিল রোবটটা। কথা যখন বলল, ওটার কণ্ঠের ভাবটা স্পষ্ট অনুধাবন করতে পারল কিশোর। 'দুঃখ পাওয়াটা—যুক্তিসঙ্গত নয়।'

এবার তসলিমার রাগান্বিত হওয়ার পালা। 'তুমি দেখি আজব ছেলে। কেন বুঝতে চাইছো না, এই রোবটটা স্রেফ একটা ধাতুর তাল, তার-তুর দিয়ে তৈরি—এর বেশি কিছু না।'

দরজার দিকে এগিয়ে গেল কিশোর। বহুকষ্টে কণ্ঠস্বর সংযত রাখতে পারল ও। 'আপনাদেরকে...ধন্যবাদ। চলি।'

তসলিমা হাত তুলে থামতে বলল। 'এক মিনিট। তোমার ব্যবহার সম্পর্কে কমপ্লেইন করতে পারি আমি, তা জানো?'

নীরবে পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা সাবেরও জুড়ে দিল, 'কৌতূহল খুব খারাপ জিনিস। অনেক সময় বিপদে ফেলে দেয়।'

কিশোর নিশ্চুপ। বলে যাচ্ছে তসলিমা, 'একটা চুক্তিতে আসা যাক

বরং তুমি যা যা দেখেছ সে ব্যাপারে মুখ খুলবে না, আমরাও চুপ থাকব

বরফ শীতল কণ্ঠে কিশোর শুধু বলল, 'আসি' চোয়াল শক্ত হয়ে উঠেছে ওর, বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে।

ও শ্রবণসীমার বাইরে চলে যেতেই ফেটে পড়ল সাবের। 'রোবটটাকে ওভাবে লেলিয়ে দেয়া মোটেই ঠিক হয়নি। ওটার ইনহিবিটর সার্কিটগুলো মাত্র রি-সেট করা হলো। আপনার আদেশ পালন করে বসলে কি হত ভেবে দেখেছেন?'

মুচকি হাসি ফুটল তসলিমার ঠোঁটে। 'কি হত? সেটা জানতেই তো চেয়েছিলাম।'

চন্দনপুর রিসার্চ সেন্টারে রীতিমত তর্কাতর্কি চলছে। 'বুঝলাম তো,' বললেন মেজর আজাদ, 'কিন্তু তোর এই পাজিগুলোকে খুঁজব কোথায়?'

হিরু চাচা টুলে বসা, পেটের কাছে হাত জড়ো করে রেখেছে। অসহিষ্ণু কণ্ঠে উত্তর দিল, 'অত কঠিনও তো নয়, দোস্ত। এদেশে পয়সাঅলা কোম্পানী কয়টা আছে, যে বানিয়ে ফেলবে অমন একটা...'

'বিশাল রোবট! লম্বায় আট ফুটেরও বেশি!' ল্যাবোরেটরীতে সবেগে প্রবেশ করল কিশোর, কথা বলছে মানস হালদারের সঙ্গে। উদ্দীপিত। করিডরে দেখা হয়েছে ওদের। অ্যাডভেঞ্চারের প্রাণবন্ত বর্ণনা দিচ্ছে কিশোর। কাকতালীয়ভাবে হিরু চাচার অসমাপ্ত বাক্যটা শেষ করে দিল।

সন্তুষ্টচিত্তে মুখ তুলে চাইল হিরু চাচা। 'হ্যাঁ, তেমনই কিছু একটা। তুই কি আন্দাজে বললি?'

'আন্দাজে মানে?'

'রোবটের কথাটা!'

'আন্দাজে না,' জানাল কিশোর। 'আমি নিজের চোখে ওটাকে দেখেছি। অস্বাভাবিক কিছু একটা ঘটছে ওই আবিষ্কারে।'

'সব খুলে বল তো শুনি,' তীক্ষ্ণ স্বরে বললেন মেজর।

আবিষ্কার-এ ভিজিট-সালাম চৌধুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ-রোবট দর্শন-সবই একে একে জানাল ও। সবাই চুপ করে শুনল ওর কথা। গল্প বলা শেষ করে সবার দিকে চাইল ও। আজাদ চাচা আর মানস হালদার হতবুদ্ধি হয়ে গেছে।

'কোন সন্দেহ নেই ওরা একটা কিছু ঘোঁট পাকাচ্ছে,' বলল কিশোর।

'তুই ঠিকই বলেছিস,' বলল হিরু চাচা। 'আমরাও কিন্তু একটা ছোটখাটো অ্যাডভেঞ্চার করে এসেছি।' ইলেকট্রনিক্স ফ্যাক্টরীতে ডাকাতির কথা কিশোরকে জানাল।

বিজয়ের আনন্দ ফুটল কিশোরের চোখের তারায়। 'তবে তো দুয়ে দুয়ে চার মিলেই গেল। আবিষ্কার গ্রুপ রোবটটাকে ইউয করে অপকর্মগুলো ঘটাচ্ছে।'

'ব্রেইন সার্কিটের ব্যাপারটা কি?' জিজ্ঞেস করল মানস। 'রোবটটা যদি মানুষের ক্ষতি করতে না-ই পারে...'

বিরোধিতা গ্রাহ্য করতে রাজি নয় কিশোর। হালকা চালে বলল, 'সেটা আর কঠিন কি? সার্কিট চেঞ্জ করে দিলেই হলো।'

জিজ্ঞাসুনেত্রে হিরু চাচার দিকে তাকালেন মেজর।

'কিশোর ঠিকই বলেছে,' জানাল হিরু চাচা। 'সার্কিট চেঞ্জ করা যদিও দায়িত্বজ্ঞানহীনের মত কাজ, তবু অসম্ভব তো নয়।'

ঘোঁত করে উঠল কিশোর। 'ওদের দু'জনের কাছে ওসব কাজ নস্যি। জায়গাটা রেইড করছেন না কেন, আজাদ চাচা? সব ক'টাকে অ্যারেস্ট করা দরকার।' তসলিমা নাসরীনকে হাতকড়া পরা অবস্থায় কল্পনা করে খুশি হয়ে উঠল ও।

দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন মেজর। 'গণতান্ত্রিক দেশে সেটা সম্ভব নয় রে। এমনকি অথোরিটি পাব কিনা সন্দেহ। চেষ্টা করে দেখতে পারি। কিন্তু তাতে জানাজানি হবে। সাবধান হয়ে যাবে ওরা। সরিয়ে ফেলবে সব প্রমাণ-ট্রমাণ।'

'আসলে আমাদের একজন চর লাগবে,' হঠাৎ বলে উঠল মানস। বুদ্ধিটা বাতলে দিতে পেরে চোখ চকচক করছে ওর। গর্বে। 'যে ওদের গোপন তথ্য সাপ্লাই করবে।' অবসরে স্পাই থ্রিলার মাসুদ রানা সিরিজ ওর নিত্য সঙ্গী।

'চমৎকার আইডিয়া,' প্রশংসা ঝরে পড়ল কিশোরের কণ্ঠে।

ভ্রূ কোঁচকালেন মেজর। 'জ্ঞানগম্যি আছে এমন কাউকে ঢোকাতে হবে। কমন এজেন্টদের অত সাইন্টিফিক কোয়ালিফিকেশন নেই। ধরা পড়ে যাবে।'

'কেন, মানস মন্দ কি?' প্রস্তাব করল হিরু চাচা

'আ-আমি?' মানস হালদার আঁতকে উঠল প্রায়

'কেন নয়, মানস চাচা?' উৎসাহ জোগাল কিশোর 'সত্যিকার মাসুদ রানা সাজার এই তো সুযোগ।'

এবার উত্তেজনা চাপতে পারল না মানস। 'ছদ্মবেশ পরব না?' পরম আগ্রহে জানতে চাইল।

'দরকার হলে পরবেন,' গম্ভীর স্বরে বললেন মেজর। 'এখন যান, অপারেশন সেকশনে রিপোর্ট করুনগে।'

প্রায় নাচতে নাচতে বেরিয়ে গেল মানস। উঠে দাঁড়াল হিরু চাচা ব্যস্ত সমস্ত হয়ে বলল, 'চল, আমরা প্রফেসর সালাম চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করি গিয়ে।'

হিরু চাচা আর আজাদ চাচা সঙ্গে থাকার পরও তেমন সুবিধা হলো না।

ওরা প্রফেসরের বাড়ি পৌঁছে দেখে, ল্যাবোরেটরীতে তখনও বাতি জ্বলছে। বিজ্ঞানী ব্যস্ত ছিলেন বিশেষ একটি এক্সপিরিমেন্টে। মাঝরাতে জ্বালাতন পছন্দ নয় শুনিয়ে দিলেন। রাগে প্রায় লাফাচ্ছেন টেকো ভদ্রলোক। 'এই ছেলেটাকে তো বলেইছি,' গজগজ করতে করতে বললেন, 'ওই আবিষ্কার না ফাবিষ্কারের ব্যাপারে আমার কিছুই জানা নেই। ওদের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক কাট-আপ করেছি।'

'আমি কিন্তু রোবটটাকে দেখেছি,' জোর দিয়ে বলল কিশোর।

নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন প্রফেসর। 'অসম্ভব। ওটা ডেস্ট্রয়েড হয়ে গেছে।'

গলা যতটা সম্ভব গম্ভীর করলেন মেজর। 'প্রফেসর চৌধুরী, এটা একটা অফিসিয়াল এনকোয়্যারী। আপনাকে কো-অপারেট করতেই হবে

অগ্নিশর্মা বিজ্ঞানী কানে তুললেন না কথা। হিরু চাচাকে দেখছেন তিনি, ঘরময় ঘুরে এটা ওটা নাড়াচাড়া করছে, জোড়া লাগাচ্ছে। রকমসকম দেখে মনে হয় যেন ল্যাবোরেটরীটা তারই।

নিজেকে আর সামলাতে পারলেন না প্রফেসর, লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। 'আল্লার ওয়াস্তে যাবেন এখান থেকে?'

হিরু চাচা একতাড়া দুমড়ানো নোট আর ড্রইং তুলে নিয়েছে, পড়ছে

মন দিয়ে। প্রফেসর তার দিকে ধেয়ে গেলে বন্ধুসুলভ একটা হাত রাখল কাঁধে, তর্জনীর টোকা মারল নোটে। 'নতুন ধরনের সোলার ব্যাটারির ডিজাইন, না?'

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন প্রফেসর। 'অ্যাঁ? হ্যাঁ, সেরকমই। যদিও...'

ভদ্র অথচ দৃঢ় কণ্ঠে তাঁর কথা কেড়ে নিল হিরু চাচা। 'কাজ হবে না কখনোই। প্রায় হাফ এনার্জি আউটপুট লুজ করছেন আপনি। এখানে দেখুন, ভুল আছে, আপনার ক্যালকুলেশনের থার্ড স্টেজে।' পকেট থেকে বলপেন বার করে মার্জিনে কি সব হিজিবিজি সংশোধন করতে লাগল।

'রাবিশ!' বলে উঠলেন প্রফেসর, ছিনিয়ে নিলেন নোট। 'আমি নিজে চেক করেছি সব ক্যালকুলেশন–তারপরও!' হিরু চাচার কারেকশনের সঙ্গে নিজের ক্যালকুলেশন আবারও পরীক্ষা করলেন। 'আপনারটাই ঠিক,' বললেন, কণ্ঠে স্পষ্ট সমীহ।

মৃদু হাসল হিরু চাচা। 'কাজে লাগতে পেরে খুশি লাগছে। আপনি এখানে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছেন, প্রফেসর। আরও অনেক আগেই মানুষের সোলার এনার্জি কাজে লাগানো উচিত ছিল।'

তার দিকে আগ্রহ নিয়ে চাইলেন প্রফেসর। 'অবশ্যই। দূষণমুক্ত এনার্জির এণ্ডলেস সাপ্লাই। অথচ কারও নজরই নেই। সরকারকে বারবার বলেছি!'

'বেটার লেট দ্যান নেভার,' সান্ত্বনা প্রকাশ করল হিরু চাচা।

যেসব সরকারী কর্মকর্তা তাঁর কথায় কান দেননি তাঁদের বিরুদ্ধে রাজ্যের নালিশ নিয়ে বসলেন বিজ্ঞানী। কিশোর আর মেজরের দৃষ্টি বিনিময় হলো। প্রফেসরের বকবকানি শুনতেই যেন এখানে আসা! প্রফেসরের মন খালাস হওয়াতক ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করল হিরু চাচা। 'খুবই দুঃখজনক, প্রফেসর, খুবই দুঃখজনক। এজন্যেই তো দেশটার কোন উন্নতি হলো না। গুণীর কদর করতে না জানলে উন্নতি হবেই বা কি করে?' নরম সুরে কথাগুলো বলেই জুড়ে দিল, 'তা এবার আপনার রোবটটা সম্পর্কে কিছু বলুন!'

মুহূর্তের জন্যে আবারও তিরিক্ষে হতে যাচ্ছিল বিজ্ঞানীর মেজাজ, কিন্তু দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে পরাজয় মেনে নিলেন। কিশোরের অবশ্য মনে হলো, হিরু চাচাকে অন্তর থেকে বিশ্বাস করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি।

চেয়ারে ফিরে গিয়ে শরীর এলিয়ে দিলেন ভদ্রলোক। লম্বা শ্বাস ফেললেন। 'আবিষ্কারে ওটাই আমার শেষ প্রজেক্ট। চলে আসার আগে, রোবটটার কলকব্জা খুলে ফেলতে অর্ডার দিয়েছিলাম।'

'সিদ্ধান্তটা নিতে কষ্ট হয়েছিল নিশ্চয়ই?' হিরু চাচা সহানুভূতির সঙ্গে প্রশ্ন করল।

'মনে হয়েছিল নিজের হাতে সন্তানকে খুন করছি। কিন্তু এছাড়া উপায়ও ছিল না। রোবটটার শক্তি, শেখার সামর্থ্য, বেড়ে ওঠা দেখে ভয় পেতে শুরু করেছিলাম।'

'কিন্তু ওটাকে ডেস্ট্রয় করা হয়নি!' গলা চড়ে গেল কিশোরের। 'আল্লার কসম, আমি নিজের চোখে দেখেছি ওটাকে।'

অস্থিরচিত্তে গোঁফে মোচড় দিলেন প্রফেসর। 'তবে হয়তো তসলিমা নাসরীন আমার অর্ডারের ওপর দিয়ে গেছে...'

'তাই যদি হয়,' বললেন মেজর, 'তবে কি রোবটটাকে দিয়ে ক্রাইম করানো যাবে?'

প্রশ্নই ওঠে না,' প্রফেসর ভ্রূ দেখালেন কিশোরের দিকে। 'এই ছেলের কথাতেই তো সব পরিষ্কার। রোবটটাকে আমি নিজের ব্রেইন প্যাটার্ন দিয়েছিলাম। আমার নীতি, আদর্শ সবই পেয়েছিল ওটা।'

'আপনার বানানো সার্কিট চেঞ্জ করা হতে পারে,' মৃদুস্বরে বলল হিরু চাচা। 'লুট-খুনের কাজে লাগানোর আগে হয়তো প্রাইম ডিরেকটিভের কন্ট্রোলিং সার্কিট খুলে নেয়। পরে আবার লাগিয়ে নিতে ক্ষতি কি।'

চরম আবেগে মাথা নেড়ে প্রতিবাদ করলেন প্রফেসর। 'অমন কাজ করানো আমার নিজের পক্ষেও খুবই কঠিন। সাবের আর তসলিমা তো সায়েন্টিস্ট নয়—আনাড়ী লোক।'

'হতে পারে,' বলল কিশোর। 'কিন্তু ওদের বিশ্বাস নেই।'

মলিন দেখাচ্ছে প্রফেসরকে। 'প্রাইম ডিরেকটিভের বিরুদ্ধে কাজ করাতে চাইলে, ওটার মনটাই যাবে নষ্ট হয়ে। সত্যি সত্যিই পাগল হয়ে যাবে ওটা!'

রোবটের বিশাল দেহটা সেন্ট্রাল ওয়র্ক বেঞ্চে পড়ে আছে—অপারেশন টেবিলের রোগীর মতন। মাথার একটা প্যানেল সরানোয় ভালগোল

পাকানো জটিল সার্কিট উন্মুক্ত। ধীরে, যত্নের সঙ্গে ব্রেইনের একটা সার্কিট সরাচ্ছে সাবের আহমেদ। তসলিমা পাশে দাঁড়িয়ে, পাওয়ারফুল লাইট ধরে রেখে কাজে সাহায্য করছে। 'স্ক্রু ড্রাইভার,' বলল সাবের। একটা লম্বা, চিকন মত স্ক্রু ড্রাইভার দিল তাকে তসলিমা। মাথার প্যানেলটা জায়গামত বসাল সাবের। সোজা হয়ে, ভ্রূ মুছে নিল। 'মনে হচ্ছে চলবে।'

'মনে হচ্ছে মানে? শিয়োর হন।'

আত্মরক্ষামূলক জবাব দিল সাবের। 'খুব সূক্ষ্ম কাজ। এসব কাজের ট্রেনিং আমার নেই।'

'একটামাত্র সার্কিট সরিয়েছেন শুধু। তাছাড়া, ফুল ইন্সট্রাকশন দেয়া হয়েছে আপনাকে। আসুন, বরং টেস্ট করেই দেখি।'

কাঁপা কাঁপা স্বরে বলল সাবের, 'অ্যাকটিভেট!' বেঞ্চ থেকে ধীরেসুস্থে পা ঝুলিয়ে নেমে দাঁড়াল রোবট। 'ভিজুয়াল স্ক্যানিঙের জন্যে তৈরি হও!' একদিকের দেয়াল থেকে ঝোলানো স্ক্রীনটার দিকে ফিরে চাইল ওটা। সাবের আলো কমিয়ে, স্লাইড প্রজেক্টরের কন্ট্রোল অপারেট করল। সাধারণ চেহারার একজন মাঝবয়সী লোকের পূর্ণাবয়ব ফুটে উঠল স্ক্রীনে। কালো সুট পরা, কাঁচাপাকা চুলের ভদ্রলোককে সরকারী সিনিয়র অফিসারদের মত দেখায়–এবং তিনি তাই।

ছবিটার দিকে আঙুল তাক করল তসলিমা। 'এই লোকটা মানবজাতির শত্রু। খতম করে দাও ওকে। আদেশ রিপিট করো।'

'খুন করব ওকে।' দ্বিধাহীন কণ্ঠে গর্জে উঠল রোবট। সাবেরের দিকে চেয়ে মুচকি হাসল তসলিমা। বাদবাকি নির্দেশ দিয়ে দিল যন্ত্রটাকে।

গভীর রাত। কাঁচাপাকা চুলের মাঝবয়সী ভদ্রলোক তাঁর জানালার বাইরে গোলাগুলির শব্দ শুনে চমকে জেগে গেলেন। তিনি জানেন, সর্বক্ষণ তাঁর বাড়ি পাহারা দেয় সশস্ত্র গার্ড। গোপন জিনিস সামলে রাখতে হবে, চিন্তাটা সবার আগে খেলে গেল মাথায়। বেডরুম থেকে দৌড়ে বৈঠকখানায় চলে গেলেন, জ্বালালেন লাইট। কিছুই খোয়া যায়নি দেখে হাঁফ ছাড়লেন। দরজা বন্ধ করে তালা মেরে দিলেন, তারপর ডেস্কে রাখা লাল টেলিফোনটার দিকে এগিয়ে গেলেন। রিসিভার তুলেছেন। কিন্তু ডায়াল করার আগেই মড়মড় শব্দে কব্জা থেকে খুলে গেল দরজা। একটা বিশালাকায় ধাতব

শরীর নিশ্চিত পদক্ষেপে এগিয়ে আসছে তাঁর দিকে। ওটার এক হাতে বিদঘুটে একটা অস্ত্র–অতিকায় একটা রাইফেল। কাছে চলে এল যন্ত্রমানব। অফিসার ভদ্রলোক ভয়ার্ত চিত্তে জীবনের শেষ কথাগুলো শুনলেন। 'আপনি মানবজাতির শত্রু। আপনাকে খুন করা আমার কর্তব্য।' একটা ধাতব হাত প্রচণ্ড শক্তিতে নেমে এল তাঁর ওপর।

পতনশীল দেহটাকে ধরে ফেলে পরম মমতায় মেঝেতে শুইয়ে দিল ওটা। এবার মন দিল প্রোগ্রাম করা কাজে…

বৈঠকখানার একদিকের আস্ত ওক প্যানেলিং চিরে ফেলল, ফলে বেরিয়ে পড়েছে ধাতব সিকিউরিটি ভল্ট ডোর। দু'কদম পিছিয়ে রাইফেল তুলল রোবট। ভল্ট ডোরের একাংশে আগুন ধরেছে, মুহূর্ত পরে গলে অদৃশ্য হয়ে গেল।

পর্যাপ্ত ফাঁক তৈরি হলে ভল্টের ভেতরে পা রাখল রোবট…

ছয়

নোটগুলোর ওপর ঝুঁকে পড়ে দ্রুত লিখে চলেছেন প্রফেসর সালাম। বিশ্বব্যাপী পরিশুদ্ধ এনার্জির ব্যবহার চালু করতে বদ্ধপরিকর তিনি, পরিকল্পনাও হাতে নিয়েছেন। এতে করে আমাদের গ্রহের বিপন্নপ্রায় পরিবেশকে রক্ষা করা সম্ভব হবে। কিন্তু ভদ্রলোক বেমালুম ভুলেই গেছেন, সারা বিশ্বে এতবড় প্ল্যান বাস্তবায়ন দুঃসাধ্য–সেজন্যে একজন বিশ্ব একনায়কের প্রয়োজন। বড়সড় হাই তুললেন প্রফেসর। রিস্টওয়াচে চেয়ে দেখেন শীঘ্রি ভোর হচ্ছে। আজও সারাটা রাত কাজ করে পার করলেন তিনি।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও নোটগুলো গোপন জায়গায় ঢুকিয়ে রাখলেন–ওয়ার্কবেঞ্চের একটা গুপ্ত কম্পার্টমেন্টে–ক'ঘণ্টা ঘুমিয়ে নেবেন ভাবলেন। উঠে দাঁড়ালে মনে হলো কিসের যেন নড়াচড়ার শব্দ শুনেছেন। একটু ঘাবড়ে গিয়ে বললেন, 'কে ওখানে?' জবাব নেই। মনের ভুল, রাত জাগার ফল–ভাবলেন তিনি।

দরজায় মৃদু কিল মারছে কেউ। খুতখুতে মনে দরজার ভারী বারটা নামালেন বিজ্ঞানী, খুলে দিলেন দরজা। সামনে দাঁড়ানো তাল গাছের মতন ঢ্যাঙা রোবটটা। ঘরে পা রাখল ওটা। পিছিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে প্রশ্ন করলেন প্রফেসর, 'কি চাও তুমি? এখানে কেন এসেছ?'

স্বভাবসিদ্ধ গমগমে কণ্ঠটা শোনা গেল না। তার বদলে নিচু, দ্বিধান্বিত গলায় ওটা বলল, 'প্রাইম ডিরেকটিভের সঙ্গে বিরোধ হয় এমন সব অর্ডার দেয়া হচ্ছে আমাকে। ওরা বলে কোন বিরোধ নেই। কিন্তু আমি জানি আছে।'

রোবটটা লম্বা দু'হাত বাড়িয়ে দিল প্রফেসরের উদ্দেশে। অনুনয়ের ভঙ্গিতে। 'আমি কিছু বুঝতে পারছি না। আপনি আমাকে তৈরি করেছেন। সাহায্য করুন আমাকে। সাহায্য করুন!'

পরদিন সকালে আবারও মিলিত হলো কিশোর, হিরু চাচা আর মেজর আজাদ। মেজর গত রাতের হামলার কথা জানালেন। ভল্ট ডোরের ফটোতে আঙুল রেখে গলিত গর্তটা দেখালেন। 'ডিসিনটিগ্রেটর গান ছাড়া ওটাকে গলানোর সাধ্য কারও নেই।'

মাথা ঝাঁকাল হিরু চাচা, যেন জানে। 'এরকম কিছুর জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম।'

'কিন্তু, দোস্ত...'

'শোন, দোস্ত, ডিসিনটিগ্রেটর গান যদি কাজেই না লাগাবে তো অত হাঙ্গামা পোহাতে গেছে কেন ওরা? এখন জানা গেল ওটার কাজটা কি?'

কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'ভদ্রলোক কে, আজাদ চাচা? ওঁর বাড়িতে ওরকম স্ট্রং ভল্টই বা কিসের জন্যে?'

'ওঁর নাম কায়সার রশীদ। সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। তাঁর ওপর ক'টা বিশেষ দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল।' গলা পরিষ্কার করে নিলেন মেজর। পাল্টালেন প্রসঙ্গ। 'তোদের তো বলেইছি আবিষ্কারের কর্মচারীদের ওপর একটা সিকিউরিটি চেক চালাচ্ছি আমি।'

বিধ্বস্ত ভল্টের ছবিটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরখ করছে হিরু চাচা। 'কিছু জানতে পারলি?'

'জানলে তো তোরাও জানতি,' বিরস মুখে বললেন মেজর। 'কারও

বিরুদ্ধে অভিযোগ আনার মত কিছু পাওয়া যায়নি। ওদের বেশিরভাগই "বিজ্ঞান সংস্কার সমিতি"-র মেম্বার।'

মুখ তুলে চাইল হিরু চাচা। 'ও, ওটা তো বেশ পুরানো সমিতি। পৃথিবীকে বিজ্ঞানের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে মুক্ত রাখতে চায়। রীতিমত প্রশংসনীয় কাজ।'

'তা বলতে পারিস। কিন্তু ইদানীং ওরা বেশ ক'জন নতুন মেম্বার নিয়েছে। বেশিরভাগই মাঝবয়সী বিজ্ঞানী। তবে কয়েকজন ইয়াং লোকও জুটেছে–ল্যাব অ্যাসিস্টেন্ট, কম্পিউটার টেকনিশিয়ান, এ ধরনের লোক। তসলিমা নাসরীন আর সাবের আহমেদও আছে।'

উঠে পড়ল কিশোর। 'তবে তো একটু খোঁজ খবর নিতেই হচ্ছে,' বলল গম্ভীর গলায়।

'কোথায় যাবি?' মোলায়েম কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন মেজর।

'বিজ্ঞান সংস্কারকদের সঙ্গে একটু মোলাকাত করে আসি। গাড়ি নেব কিন্তু, আজাদ চাচা।'

ঘাড় কাত করে সম্মতি দিলেন মেজর। 'পাস নিয়ে যা।'

হিরু চাচা আর মেজর আজাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ঘর থেকে চলে গেল কিশোর।

মেজর এবার বন্ধুর দিকে ফিরলেন। 'কিরে, কি করবি এখন? ওর ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করবি?'

মৃদু হেসে স্প্রিঙের মত লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল হিরু চাচা। 'উঁহুঁ, আবিষ্কারে একটু ঢুঁ মেরে আসি, চল।'

'লাভ কি?'

'জানি না–একটু ঘাঁটাতে তো পারব।' মেজরের কাঁধে চাপড় মারল সে। 'প্রফেসর সালাম চৌধুরীর রোবটটা দেখতে চাইব!'

টেলিফোন ডিরেক্টরী ঘাঁটতেই 'বিজ্ঞান সংস্কার সমিতি'-র নাম্বার পেয়ে গেল কিশোর। তখুনি ফোন করে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে নিল ও। ড্রাইভার অফিসটা চেনে। কাছেই। মাইল চারেকের পথ। সেক্রেটারির অফিসে বসে আলোচনা করার সময় ওর মনে হলো, সারাটা সকাল বিফলে গেল

সেক্রেটারি ভদ্রলোক মাঝবয়সী, চোখে স্টীল রিমের চশমা। কিশোরের

আগ্রহ দেখে উৎসাহিত হয়ে মুখ ছেড়ে দিলেন। সমিতির লক্ষ, উদ্দেশ্য, কার্যক্রমের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিতে লাগলেন। মেজর আজাদ পাঠিয়েছেন শুনে খাতিরও করলেন খুব। প্যাটিস-পেস্ট্রি আনিয়ে দিলেন।

ওর বাবার নাম কি, কোন্ স্কুলে পড়ে ইত্যাদি মামুলি আলোচনায় কেটে গেল বেশ কিছুক্ষণ।

টেবিলে কয়েকটা লিফলেট দেখে তুলে নিল কিশোর। 'আজ রাতে মীটিং আছে আপনাদের? আমি কি উপস্থিত থাকতে–'

বাকি লিফলেটগুলো দ্রুত ওর নাগালের বাইরে সরিয়ে ফেললেন সেক্রেটারি। 'সরি। মেম্বার ছাড়া আর কাউকে অ্যালাউ করা হয় না।'

ভদ্রতার খাতিরে আরও খানিকক্ষণ বসে থেকে উঠে পড়ল কিশোর। 'আমি তবে আসি। খোদা হাফেজ!'

ও বেরিয়ে গেল। পদশব্দ মিলিয়ে যাওয়াতক কান খাড়া করে রইলেন সেক্রেটারি। চেহারায় চিন্তার ছাপ। ট্রেসল টেবিলের কাছে গেলেন তিনি, ওখানে ফোন থাকে। আবিষ্কারের নম্বরে ডায়াল করলেন। তসলিমার সঙ্গে অবশ্য কথা বলতে পারলেন না।

একজন ভিআইপিকে ইন্সটিটিউট ঘুরিয়ে দেখাতে ব্যস্ত সে।

আবিষ্কারে কিশোরের অপমানের প্রতিশোধ কড়ায় গণ্ডায় মিটিয়ে দিল হিরু চাচা। লম্বা স্কার্ফ উড়িয়ে, ইউনিভার্সিটি ডনের মত ল্যাবোরেটরীগুলো ঘুরে ফিরে দেখল সে, ভঙ্গিটা এমন যেন বাচ্চাদের স্কুল পরিদর্শনে এসেছে। জটিল ও অ্যাডভান্স পরীক্ষা-নীরিক্ষাগুলো ছাত্রদের হোমওয়র্ক চেক করার মত করে দেখল, হাসিহাসি মুখ করে এর ওর প্রাথমিক ভুল-টুল ধরিয়ে দিল। ট্যুর শেষ হলে, নিজের বিষে নিজেই জ্বলেপুড়ে মরল তসলিমা, সেদ্ধ হচ্ছে রাগে। ওর পেছনে ঘুরঘুর করছে সাবের, আশঙ্কা করছে যে কোন মুহূর্তে বিস্ফোরণ ঘটতে দেখবে। মেজর কিন্তু এতসব কাণ্ড-কারখানার সামান্যতম আঁচও পাননি। তাঁর বন্ধু তো যথাসাধ্য ভদ্রতাই দেখিয়েছে, বরঞ্চ আবিষ্কারের ঘোড়েল দুটোই কেমন কেমন করছে। শুধু একটিমাত্র বিষয় তাঁকে বিস্মিত করেছে; হিরু একবারও প্রফেসর সালামের রোবটের কথা পাড়েনি।

পাথরকুচি ছড়ানো রাস্তা ধরে মেইন গেটের দিকে যাওয়ার পথে, হিরু

চাচা খোশমেজাজে বলল, 'খুব ভাল লাগল। আপনাদের অনেক ধন্যবাদ।'

সিঁটিয়ে গেল সাবের। তসলিমা দাঁতের ফাঁকে বলল, 'আপনার কাছে তো এসব স্রেফ ছেলেমানুষী।'

ওর দিকে চেয়ে উজ্জ্বল হাসল হিরু চাচা। 'তা বটে। কিন্তু কোথাও না কোথাও থেকে শুরু তো করতে হবে। আগে হামাগুড়ি, তারপর না হাঁটা!' এ মুহূর্তে রোবটিক্স ল্যাবোরেটরীর পাশ কাটাচ্ছে তারা। হিরু চাচা পরিকল্পিতভাবে যেন থেমে পড়ল। 'সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং জিনিসটাই তো দেখা হলো না–প্রফেসর সালামের রোবট।' কারও তোয়াক্কা করল না, ঢুকে পড়ল ভেতরে, অগত্যা অন্যদেরও অনুগমন করতে হলো।

ল্যাবোরেটরীর চারদিকে দৃষ্টি বুলাচ্ছে হিরু চাচা। চোখে আশা। 'কই, ডাকুন আপনাদের টিনের মানুষকে!'

হিমশীতল ক্রুদ্ধতায় বলল তসলিমা, 'আপনি বোধহয় প্রফেসর সালামের রোবটটার কথা বলছেন। সরি।'

পাঁই করে ঘুরে ওর মুখের দিকে তাকাল হিরু চাচা। 'কিন্তু আমি যে ওটাকে দেখতেই এসেছি।' মৃদু স্বরে বললেও কাঠিন্যের ঘাটতি ছিল না কথাগুলোয়। দীর্ঘ দু'মুহূর্ত পরস্পরকে একদৃষ্টে জরিপ করে নিল হিরু চাচা আর তসলিমা।

বরফ গলাতে এগিয়ে এল সাবের। 'ওটার কলকব্জা খুলে নিতে হয়েছে আমাদের।' অপ্রতিভ শোনাল ওর কণ্ঠ।

তসলিমার চোখ থেকে দৃষ্টি না সরিয়েই বলল হিরু চাচা, 'কি বললেন? এরকম একটা নিষ্পাপ রোবটকে অকেজো করে দিয়েছেন?'

তাকে ঠাণ্ডা হাসি উপহার দিল তসলিমা। 'আপনার ভাতিজার ভিজিটের পর থেকেই ওটা–কেমন বিগড়ে গিয়েছিল। ছেলেটা ওর মনে সব অপরিচিত কনসেপ্ট ঢুকিয়ে দিয়েছে–'

'সহানুভূতি, উদ্বেগ এসব কনসেপ্ট?' কথা কেড়ে নিয়ে বলল হিরু চাচা। 'ওগুলো ফালতু ব্যাপার, না?'

এড়িয়ে গেল তসলিমা। 'সেজন্যেই ভাবলাম অকেজো করে দিই

দুঃখের দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল হিরু চাচা। 'টুকরোগুলো আছে নিশ্চয়?' ভালমানুষের মত মুখ করে বলল। 'দিন, রিসার্চ সেন্টারে নিয়ে গিয়ে জোড়া লাগিয়ে দিতে পারব। ওসব কাজ আমি ভালই পারি।'

নার্ভাস ভঙ্গিতে হেসে উঠল সাবের। 'সেটাও সম্ভব নয়, পাশা সাহেব। আমাদের ফার্নেসে ওটাকে গলিয়ে-টলিয়ে খতম করে দিয়েছি।'

এতক্ষণে মুখ খুললেন মেজর। 'আমি সার্চ ওয়ারেন্ট বার করতে পারি...'

বিজয়ের ছোঁয়া লাগল তসলিমার কণ্ঠে। 'যত সহজ ভাবছেন, আসলে ততটা নয়, মেজর।'

ভ্রূ কুঁচকে গেল মেজর আজাদের, মেয়েলোকটি ভুল বলেনি। আবিষ্কারে তল্লাশি চালাতে হলে মন্ত্রীসভার অনুমতি লাগবে। তসলিমার পরবর্তী কথায় স্তম্ভিত হয়ে গেলেন তিনি। 'আমি অবশ্য অতসব ফরমালিটির ধার ধারি না,' বলে চলেছে তসলিমা। 'আপনি ইন্সটিটিউটের যেখানে খুশি সার্চ করতে পারেন।'

মেজর বন্ধুর মুখের দিকে চকিতে চাইলেন। 'তার কোন দরকার নেই,' হাসিমুখে বলল হিরু চাচা, 'চল, দোস্ত, মিস তসলিমার অনেক সময় নষ্ট করলাম–'

হিরু চাচা রোবটিক্স ল্যাবোরেটরীতে ঢোকার মতন বেরোলও তাড়াহুড়ো করে।

তসলিমা অনাহূত অতিথিদের বিদায় করে রিসেপশনের কাছাকাছি এলে মুখ তুলে চাইল রিসেপশনিস্ট। 'এক ভদ্রলোক আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন–ডক্টর হালদার।' হাতের ইশারায় দেখাল আর্মচেয়ারে বসে থাকা লোকটিকে–রহস্যপত্রিকার পাতা উল্টাচ্ছে। ছিপছিপে যুবকটির পরনে কালো সুট। তসলিমাকে এগিয়ে আসতে দেখে, উঠে দাঁড়িয়ে পরিচয় দিল।

'মিস তসলিমা নাসরীন? আমি ডাক্তার হালদার, মিনিস্ট্রি অভ হেলথ থেকে এসেছি। আপনাকে একটু বিরক্ত করব। আপনাদের সব কর্মচারীর মেডিকেল রেকর্ড চেক করতে হবে। স্পট-চেক একজামিনেশনও করতে পারি।'

বিরস মুখ করে ওর দিকে তাকাল তসলিমা। 'আমাদের এখানে বহু কর্মচারী, ডক্টর হালদার।'

মাথা ঝাঁকাল ও। 'সারাদিন লেগে যাবে জানি। সেজন্যেই একটা বসার জায়গার যদি ব্যবস্থা করে দিতেন...'

'আচ্ছা, আসুন দেখি।' বলে ঘুরেই হাঁটা দিল তসলিমা। তড়িঘড়ি জিনিসপত্র জড়ো করে নিয়ে অনুসরণ করল মানস, আগ্রহের সঙ্গে এদিক ওদিক চাইছে।

সিক্রেট এজেন্ট হিসেবে মানস হালদারের কাজ হলো শুরু।

হিরু চাচা আর মেজর আজাদ সুবারু গাড়ির ব্যাক সীটে পাশাপাশি বসা। চন্দনপুর রিসার্চ সেন্টারে ফিরছে। কেন যেন মেজরের মনে হয়েছিল, ল্যাণ্ডরোভার নিয়ে গেলে মান থাকবে না। সেজন্যেই সুবারু। হিরু চাচা জানালা দিয়ে চেয়ে, গ্রামীণ পরিবেশ উপভোগ করছে। অন্যমনস্ক।

'দোস্ত,' কথা পাড়লেন মেজর, 'ওদের কথা বিশ্বাস করেছিস—ওই রোবট বিকল করার গল্পটা?'

মাথা নাড়ল হিরু চাচা। 'প্রশ্নই ওঠে না। ওরাও জানে বিশ্বাস করিনি!'

'তবে গেল কই ওটা?'

'আবিষ্কারে নেই, থাকলে তোকে সার্চ করতে বলত না।'

'তাহলে কোথায়?'

'হয় লুকিয়ে রেখেছে—নয়তো ওটা নিজে থেকেই চলে গেছে।'

ধাতব দৈত্যটার যে বর্ণনা কিশোর শুনিয়েছে, তাতে করে ওটা স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে কল্পনা করে কেঁপে উঠলেন মেজর। হিরু চাচা আচমকা চুপ মেরে গেছে, ফিরতি পথ ওভাবেই গুম হয়ে রইল।

ল্যাবোরেটরীতে পৌছনোর পরও তার ভাবান্তর হলো না। মেজর কেসটা সম্পর্কে আলোচনা করতে বার কয়েক নিষ্ফল চেষ্টা চালিয়ে হাল ছেড়ে দিলেন। শেষমেশ, আবিষ্কারে রেইড করার অনুমতি পাওয়া যায় কিনা; সে ব্যাপারে পরামর্শ করতে গেলেন সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সঙ্গে। টেলিফোনে। প্রয়োজনে দেখা করতেও যাবেন।

হিরু চাচা একা হলে পর, অস্থিরচিত্তে পায়চারি করতে লাগল ঘরে। কিছুর জন্যে যেন অপেক্ষা করছে। নীরবতা ভঙ্গ করল টেলিফোনের শব্দ, পরম আগ্রহে এগিয়ে গেল সে। 'হ্যালো—হ্যাঁ, হিরন পাশা।'

'বাইরে থেকে ফোন এসেছে, স্যার,' জানাল রিসার্চ সেন্টারের অপারেটর। 'প্রফেসর সালাম চৌধুরী। কথা বলবেন?'

খুশি মনে চিবুক ঘষছে হিরু চাচা। হঠাৎ করে দারুণ উদ্দীপনা এসে

গেছে তার মধ্যে। 'নিশ্চয়ই।'

প্রফেসরের কণ্ঠ কাঁপা কাঁপা ঠেকল, বিক্ষুব্ধ। 'পাশা সাহেব! আপনাকে আমার বিশেষ প্রয়োজন। রোবটটার ব্যাপারে–কাল রাতে এসেছিল আমার কাছে…লুকিয়ে রেখেছি। বিগড়ে গেছে মনে হচ্ছে। কতক্ষণ ওটা আমার কন্ট্রোলে থাকবে বলা মুশকিল।' গুপ্ত কথা ফাঁস করে দেয়ার মত শোনাচ্ছে তাঁর গলা। 'আবিষ্কারের ওদের কাছ থেকে দূরে রাখতে হবে ওটাকে। প্রায় পাগল বানিয়ে ছেড়েছে বেচারাকে!'

'চিন্তা করবেন না,' সান্ত্বনা দিল হিরু চাচা। 'আপনি চুপচাপ বসে থাকুন, আমি এখুনি আসছি।'

বেরিয়ে যাওয়ার মুখে থেমে গেল হিরু চাচা, পেন্সিল আর প্যাড খুঁজে নিয়ে দ্রুত একটা নোট লিখে ফেলল।

তারপর লম্বা পদক্ষেপে এগোল কার পার্কের উদ্দেশে।

প্রফেসর সালাম চৌধুরী তাঁর ল্যাবোরেটরীতে পায়চারি করছেন। নার্ভাস। ভারী পর্দা টেনে দেয়ায় ঘরে আবছা অন্ধকার। আচমকা একটা গাড়ির আগুয়ান শব্দ নীরবতা ভঙ্গ করল। দু'মিনিট বাদে দরজায় টোকা পড়ল। দরজা খুলতে তড়িঘড়ি এগোলেন প্রফেসর। বাইরে দাঁড়িয়ে তসলিমা আর সাবের। ওরা পা বাড়ালে পিছিয়ে গেলেন তিনি…

রিসার্চ সেন্টারের করিডর ধরে হনহন করে এগোচ্ছে কিশোর, হাতে বিজ্ঞান সংস্কার সমিতির কতগুলো লিফলেট, ধাক্কা খেলো একজন পরিচিত লোকের গায়ে। 'হায়দার চাচা! আজাদ চাচা আছে ভেতরে?'

'না,' বলল সার্জেন্ট হায়দার। 'বাইরে গেছেন।'

'হিরু চাচা?'

'আমি শিয়োর না। চলো দেখি।'

একসঙ্গে এগোল ওরা, ল্যাবোরেটরী ফাঁকা। চারদিকে চাইতে বেঞ্চিতে চাপা দিয়ে রাখা নোটটা দেখতে পেল কিশোর। ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে জোরে জোরে পড়ল। 'প্রফেসর সালাম চৌধুরী বলেছেন, রোবটটা তাঁর বাড়িতে আছে। ওর সঙ্গে দেখা করতেই গেছে। খুব সম্ভব ওটাকে আমি ট্যাকল করতে পারব। যদি বাই চান্স না পারি সেজন্যেই এই নোট লিখে

রেখে যাচ্ছি।'

'হিরু চাচার খালি বাড়াবাড়ি!' নোটটা ছুঁড়ে ফেলে বলল কিশোর। বিরক্ত। চিন্তিত। 'একা যাওয়া মোটেই ঠিক হয়নি।'

'ঠিক বলেছ,' সায় জানাল হায়দার। 'আমি এখুনি লোকজন জুটিয়ে চলে যাচ্ছি।'

'তবে ওখানেই দেখা হবে!' বলেই ঘর ছাড়ল কিশোর, হায়দার বাধা দেয়ার সুযোগ পেল না।

হিরু চাচা রিসার্চ সেন্টারের ৬৮ মডেলের করোনা চালিয়ে প্রফেসর চৌধুরীর বাসার সামনে থামাল। গাড়ি লক করে দরজার দিকে লম্বা পা বাড়াল। দরজা সামান্য ফাঁক হয়ে থাকতে দেখে একটু অবাকই হয়েছে। সন্তর্পণে অন্ধকার ঘরটায় ঢুকে চারদিকে চাইল। চোখ সইয়ে নিতে দু'মুহূর্ত লাগল। 'প্রফেসর চৌধুরী!' ডাক দিল। 'আছেন?'

একটা বীভৎস ধাতব মূর্তি আঁধার ফুঁড়ে বেরিয়ে এসে হিরু চাচার ওপর প্রায় ঝুঁকে পড়ল। 'আপনি হিরন পাশা?' জলদগম্ভীর কণ্ঠস্বরটি বলল।

ছায়াময় দৈত্যটার দিকে চোখ পিটপিট করে তাকাল হিরু চাচা। 'হ্যাঁ, আমিই। কেমন আছ তুমি? তোমার সঙ্গে দেখা করতেই আসা।'

'আপনার পরিচয় কনফার্ম করুন, প্লিজ। আপনিই হিরণ পাশা তো?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমিই! তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে ভালই–'

'আপনি মানবজাতির শত্রু। আপনাকে খুন করার হুকুম আছে।'

অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতায়, দুটো ধাতব হাত হিরু চাচার গলা লক্ষ্য করে ঝাঁপাল।

সাত

মাথা নিচু করে ফেলল হিরু চাচা। একটা ধাতব হাত মাথার পাশ দিয়ে বাতাস কেটে চলে গেল। দ্রুত পিছিয়ে যাচ্ছে সে, ওদিকে রোবটটা ধাওয়া করছেই। এ মুহূর্তে লাফিয়েছে আবারও, গমগমে কণ্ঠে বলে উঠল, 'প্লিজ,

বাধা দেবেন না, আপনাকে অযথা ব্যথা দিতে চাই না।'

'তোমার দয়ার শরীর,' শ্বাসের ফাঁকে বলল হিরু চাচা, বাউলি কেটে আরেকটা ভয়ানক থাবা এড়াল। রোবটটা ভারসাম্য রক্ষা করে লাফানোর জন্যে তৈরি হতেই, গর্জে উঠল হিরু চাচা, 'থামো! তোমার প্রাইম ডিরেকটিভ কি?'

হিরু চাচা যা ভেবেছিল, ইতস্তত করছে যন্ত্রমানব। 'আমি মানবজাতির সেবা করব, এবং কখনও ক্ষতি করব না।'

'তবে আমার ক্ষতি করতে চাইছ কেন? আমি তো মানুষের শত্রু নই। বন্ধু।'

মুহূর্তের জন্যে নট নড়ন চড়ন নট কিচ্ছু। আত্মতুষ্টির হাসি ফুটল হিরু চাচার ঠোঁটে। আবার সামনে বাড়ল রোবট। 'আপনি বোকা বানাতে চাইবেন, সতর্ক করা হয়েছে আমাকে। আপনি মানবজাতির শত্রু। আপনাকে মরতেই হবে।'

কথা কম, কাজ বেশি–সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল হিরু চাচা। তর্ক করে ফায়দা হবে না। আলগোছে রোবটটার পাশ কাটিয়ে দৌড় দিল দরজার দিকে। পেছনে রোবটের পদশব্দে থরথর করে কাঁপছে মেঝে, হ্যাণ্ডেলে মোচড় মারল হিরু চাচা। বন্ধ। বাইরে থেকে। চরকির মতন ঘুরেই ঠিক সময়ে মাথা নামিয়ে নিল। যন্ত্রমানবের ডানমুঠো তার মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গিয়ে গর্ত বানিয়ে দিয়েছে দেয়ালে। ঘরের মধ্যখানে পৌঁছতে ছুট লাগাল হিরু চাচা। রোবটটা তাকে কোনভাবে কোণঠাসা করতে পারলেই দফা গয়া করে দেবে।

লৌহমানব নাছোড়বান্দা। তাড়া করছে। বাড়িয়ে দিল শক্তিশালী দু'হাত, লাফিয়ে সরে গেল হিরু চাচা। নড়েচড়ে বেড়ানো ছাড়া হিরু চাচার বাঁচার আশা ক্ষীণ।

এর পরের অবস্থা কহতব্য নয়। প্রফেসরের ল্যাবোরেটরী পুরোদস্তুর তছনছ হয়ে গেল। লড়াইকালীন সময়ে হিরু চাচা হাতের কাছে যা পেয়েছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করেছে। টুল ছুঁড়ে মেরেছে, চেয়ার দিয়ে ঠেকানোর চেষ্টা করেছে–এমনকি ভারী ট্রেসল টেবিলটাও উল্টে দিয়েছে। থামাথামি তো দূরের কথা, গতিও একবিন্দু কমায়নি ওটা।

শত্রু দৃশ্যত অজেয়। শেষমেশ, হিরু চাচা ওটাকে ঠেকানোর চেষ্টায়

ক্ষান্ত দিয়ে পালানোর রাস্তা খুঁজতে লাগল! তার বাড়তি সুবিধা হচ্ছে সে অপেক্ষাকৃত ক্ষিপ্র। জবরজং দেহ নিয়ে রোবটটা দুরন্ত গতি বজায় রাখবেই বা কি করে?

হিরু চাচা কিন্তু ক্রমান্বয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ছে, ফলে একমাত্র সুযোগটুকুও হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে।

শেষ পর্যন্ত ঘটল সেই অবশ্যম্ভাবী। ভাঙা ফ্লাস্ক থেকে চলকে পড়া চায়ে পা পিছলে গেল হিরু চাচার, এবং রোবটটার থাবা আলতো আঁচড় কাটল তার কপালের ডান পাশে। মরিয়ার মত, হাত দুটোর কবল থেকে নিজেকে যদ্দূর সম্ভব সরিয়ে নিল সে, ল্যাবোরেটরীময় টলতে টলতে ছুটে বেড়াচ্ছে। জোঁকের মত লেগে রয়েছে শত্রু। হিরু চাচার মুভমেন্ট যথেষ্ট ধীর এখন, মরণ কেবল সময়ের ব্যাপার মাত্র···

কিশোরের নির্দেশে প্রফেসরের বাড়ির বাইরে কিঁই-ই-চ করে ব্রেক কষল ড্রাইভার। গাড়ি থেকে নেমেই দরজার দিকে ছুটল ও। তালা। ভেতর থেকে ভারী পদশব্দ আসছে, সে সঙ্গে ভাঙচুরের আওয়াজ। দৌড়ে গাড়িতে ফিরে এসে, টুল কিট থেকে স্প্যানার বের করে তালা ভাঙতে দৌড়ল। লাগতে পারে ভেবে সঙ্গে রেখেছিল কিট বক্স। তালা ভেঙে এক ধাক্কায় দরজা খুলতেই, একটা ভাঙা টুলে হোঁচট খেয়ে পড়ে যেতে দেখল হিরু চাচাকে। বেড়াল-ইঁদুর খেলার শেষ পর্যায়ে শেষ ঘুসিটা তুলল রোবট।

চিৎকার করে উঠল কিশোর, 'থামো! থামো!'

বিশাল দেহটা পায়ের ওপর ঘুরে গেল। বজ্রগম্ভীর কণ্ঠটি গমগম করে উঠেছে, 'হিরণপাশা মানুষের শত্রু। তাঁকে খুন করা আমার কর্তব্য।' সামান্য দ্বিধান্বিত শোনাল কণ্ঠটিকে—নিজের পক্ষে সাফাই গাইছে যেন।

বেপরোয়া গলায় চেঁচাল কিশোর, 'না, না। উনি খুব ভালমানুষ। মানুষের বন্ধু।'

লম্বা পদক্ষেপে ওর দিকে হেঁটে গেল রোবট। মাথা নিচু করে চাইল, মাথার লাইট দপদপ করে জ্বলছে। 'আপনি ল্যাবোরেটরীতে ছিলেন, আমার জন্যে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন, দুঃখও।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ,' দ্রুত বলল কিশোর। 'তুমি অর্ডার সত্ত্বেও আমার ক্ষতি করতে রাজি হওনি। আবিষ্কারের ওই মানুষগুলো বদমাশের হাড্ডি। মিথ্যে শেখাচ্ছে তোমাকে। প্রোগ্রামিং চেঞ্জ করে দিয়ে ক্ষতি করাচ্ছে মানুষের

তুমি সেটা বুঝতে পারছ না?'

দুটো মুহূর্ত নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইল রোবট। তারপর টলে উঠল, হাত দুটো চলে গেছে মাথায়, বিভ্রান্ত মানুষের মত। 'আমি কনফিউযড। বুঝতে পারছি না। আমি...ব্যথা...টের পাচ্ছি...'

ওটা অসহায়ের মত টলমল করতে থাকলে হিরু চাচার কাছে ছুটে গেল কিশোর। বেচারা অর্ধ-সচেতন, বিড়বিড় করছে আপন মনে। কষ্টে সৃষ্টে উঠে বসল।

দরজার কাছ থেকে কে যেন কথা বলেছে। 'পাশা সাহেব, কিশোর, গেট ডাউন!' চাইল কিশোর। হায়দার, সাব মেশিনগান তাক করে রেখেছে লৌহমানবের দিকে। পেছনে পজিশন নিয়েছে অন্যান্য সশস্ত্র সৈন্য। আকুল কণ্ঠে চেঁচিয়ে বলল কিশোর, 'না–গুলি করবেন না!'

কিন্তু দেরি হয়ে গেছে। সার্জেন্ট হায়দার মেশিনগান থেকে এক ঝাঁক গুলিবর্ষণ করল রোবটটার গায়ে। সৈন্যরাও যোগ দিল। গোলাগুলির শব্দে আর গন্ধে ভারী হয়ে উঠেছে ল্যাবোরেটরীর বাতাস। চকচকে ধাতব দেহটায় গুলি লেগে ছিটকে যেতে দেখল কিশোর।

এবার কোণঠাসা বেড়ালের মত আক্রমণাত্মক হয়ে উঠল রোবটটা, সামলে নিয়েছে যেন নিজেকে। যমের মত এগিয়ে যাচ্ছে সৈন্যদের দিকে। ছত্রখান হয়ে গেল সৈন্যরা, তবু পিছানোর ফাঁকে গুলি চালাচ্ছে। কপাল ভাল, ওদেরকে উপেক্ষা করে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল ওটা।

জনা দু'য়েক সৈন্য বাইরে পাহারায় ছিল। তারা ফায়ার ওপেন করার আগেই ঘুসি খেয়ে ছাতু হয়ে গেল। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ভর্তি একটা পেল্লায় কাঠের বাক্স দরজার পাশে রাখা। ম্যাচের বাক্সের মতন করে ওটাকে তুলে নিল রোবট, দড়াম করে চাপা দিল ল্যাবোরেটরীর দরজায়, বন্ধ হয়ে গেছে বেরোনোর পথ। ফিরেই পা চালাল ওটা। হায়দার ও তার চেলারা বাক্স সরানোর আগেই লাপাত্তা হয়ে গেল রোবটটা।

বাক্স সরানো হলে হায়দার দৌড়ে এল কিশোরের কাছে, ও হিরু চাচাকে উঠে বসতে সাহায্য করছে। 'পালিয়ে গেছে,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল হায়দার। 'তোমার চাচা ঠিক আছেন তো?'

'মনে তো হয়। ওটাকে গুলি করতে গেলেন কেন? কখনোই ক্ষতি করত না আপনাদের।'

অবিন্যস্ত ল্যাবোরেটরীর চারদিকে চোখ বুলিয়ে হিরু চাচার পড়ে থাকা দেহের দিকে তাকাল হায়দার। 'তুমি বললেই হলো? পাশা সাহেবকে খুন করার তালে ছিল ওটা। দেখছ না ঘরের কি অবস্থা?'

গলা চড়াল কিশোর, 'প্রথমে খুন করতেই চাইছিল, কিন্তু আমি ম্যানেজ করাতে...যাকগে, যা হওয়ার হয়েছে। আপনারা আপনাদের কাজ করেছেন।'

হায়দার চাইল ওর দিকে। চোখে হতাশা, বিরক্তি। উদ্ধারকর্তা হিসেবে এমন অভ্যর্থনা পেতে পারে ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি।

ওর মনের অবস্থা বুঝতে পারল কিশোর। 'সরি, হায়দার চাচা,' মোলায়েম গলায় বলল, 'কিছু মনে করবেন না।'

এবার হাসি ফুটল হায়দারের মুখে। ফিরল সঙ্গীদের দিকে। 'পাশা সাহেবের জন্যে একটা স্ট্রেচারের ব্যবস্থা করা লাগে,' বলল, 'জলদি...' থেমে গেল। 'শোনো!'

কান পাতল কিশোর। একটা চাপা থপথপ শব্দ কানে আসছে। কোণের কাবার্ডটা থেকে না? কিশোরকে দাঁড়িয়ে থাকতে হাত দেখাল হায়দার, নিজে কাবার্ডের দিকে মেশিনগান তাক করে এগোতে লাগল। কাছে গিয়ে দরজাটা খুলে দিল একটানে। একটা শরীর হুড়মুড় করে মেঝেতে পড়ল। প্রফেসর সালাম চৌধুরী। কপালে কালশিটে। জ্ঞান নেই।

চন্দনপুর রিসার্চ সেন্টারে এসে খানিকটা সামলে নিতে পারলেন বিজ্ঞানী। খুলে বললেন তাঁর কাহিনি। চোট যত না পেয়েছেন শরীরে, তারচেয়ে বেশি মনে। হিরু চাচা কিন্তু এখনও অচেতন। গভীর ঘুমে মগ্ন সে, সোনার কাঠি-রূপার কাঠি ছাড়া যেন ভাঙবে না সেই ঘুম। রিসার্চ সেন্টারের সিক বে-তে রয়েছে বেচারা।

ল্যাবোরেটরীতে সবাই গোল হয়ে বসলে, কাপে করে চা সার্ভ করল হায়দার। গরম, কড়া চায়ে চুমুক দিয়ে খানিকটা চাঙা বোধ করছে সবাই। প্রফেসর জানালেন, গতকাল মাঝরাতে রোবটটা আচমকা এসে হাজির হয়েছিল তাঁর বাড়িতে। ওটার কাবু অবস্থা দেখে তিনি লুকিয়ে রেখেছিলেন ল্যাবোরেটরীতে। খানিকক্ষণ বুঝতে পারেননি কি করণীয়, জড়াতে চাননি ঝামেলায়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এড়িয়েও যেতে পারেননি দায়িত্ববোধের জন্যে

অনেক ভেবেচিন্তে, হিরু চাচার সঙ্গে যোগাযোগ করে, গোটা ব্যাপারটা তার দায়িত্বে ছেড়ে দেবেন ঠিক করেছিলেন।

চায়ে চুমুক দিলেন বিজ্ঞানী। 'পাশা সাহেবের জন্যে অপেক্ষা করার ফাঁকে সাবের আর তসলিমা এসে হাজির। ওরা রোবটটাকে রি-প্রোগ্রাম করে তাঁকে খুন করার অর্ডার দিল। বাধা দিয়েছিলাম আমি। প্রোটেস্ট করেছিলাম। সেজন্যে মারধর করেছে, দেখতেই পাচ্ছেন। শেষে কাবার্ডে ঠেসে দিয়ে পালিয়েছে...' কেঁপে উঠলেন বিজ্ঞানী, সদ্যলব্ধ অভিজ্ঞতা এখনও তাড়া করে ফিরছে তাঁকে।

'আর কোন ভয় নেই, প্রফেসর,' সান্ত্বনা দিয়ে বলল কিশোর, 'আপনি এখন সম্পূর্ণ সেফ। ওরা এখানে আপনার নাগাল পাবে না।'

প্রফেসর চৌধুরী অসংলগ্ন আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন। নিজেকে পুরোপুরি ফিরে পাননি এখনও। 'রোবটটার শক্তির কথা যখন ভাবি...ওটার মেটাল আমার নিজের আবিষ্কৃত... সেজন্যেই সম্ভব। ওটাকে আমি জীবন্ত রোবট বলি। বেড়ে ওঠার শক্তি ওটার আছে–ঠিক এনিম্যাল টিস্যুর মত। এনার্জি জড়ো করতে শিখিয়েছি, রোগেও কাবু হবে–এক ধরনের "মেটাল ভাইরাস" আবিষ্কার করেছি যেটা শরীরে হামলা করে...'

কিশোর গুণী বিজ্ঞানীর বকবকানি শুনছে সহানুভূতি নিয়ে। তাঁর আবিষ্কারকে বিপথগামী করার ফলে কী কষ্টটাই না পেয়েছেন ভদ্রলোক!

হঠাৎই থেমে গেলেন প্রফেসর, কিশোরের আনা বিজ্ঞান সংস্কার সমিতির লিফলেটগুলো দৃষ্টি কেড়েছে তাঁর। এতক্ষণ অযত্নে পড়ে ছিল বেঞ্চিতে। ছোঁ মেরে তুলে নিলেন বিজ্ঞানী। 'চিনি এদের! আবিষ্কার ছাড়ার আগ দিয়ে সাবের বলেছিল জয়েন করতে। একটা মীটিঙেও গিয়েছিলাম। লোকগুলোকে ভাল লাগেনি। যাইওনি আর!'

চিন্তামগ্ন কিশোর বলল, 'আপনি কি এখনও মেম্বার?'

'জানো। রিজাইন তো দিইনি।' পকেট হাতড়ে হাতড়ে নোঙরা মতন একটা কার্ডবোর্ড বার করলেন। 'এই দেখো, মেম্বারশিপ কার্ড এখনও আছে। কেন জিজ্ঞেস করছিলে?'

'আজ রাতে ওদের একটা মীটিং আছে,' মোলায়েম স্বরে বলল কিশোর। 'আপনি গেলে অ্যাটেণ্ড করতে দেবে না?'

'দেবে বোধহয়–'

'আমি যদি ক্যামেরা আর টেপ রেকর্ডার নিয়ে সঙ্গে যাই, আমাকে পার করে দিতে পারবেন না? আমরা কিন্তু আজাদ চাচার অনেক কাজে আসতে পারি। পুরো গ্রুপটাকেই উনি হয়তো বা অ্যারেস্ট করতে পারবেন।'

'এক মিনিট,' নাক গলাল হায়দার। 'মেজর খেপে যাবেন–তাঁকে না জানিয়ে গেলে। তাছাড়া, পাশা সাহেবও সুস্থ নন।'

'অত ভাববেন না,' অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলল কিশোর। 'আমরা কাজ এগিয়ে রাখতে পারলে ওঁরা বরং খুশিই হবেন।' প্রফেসরের মুখের দিকে তাকাল। 'আপনি যাচ্ছেন তো? আগে থেকে বলে রাখি, কাজটা কিন্তু ডেঞ্জারাস।'

মুহূর্তের জন্যে থমকে গেলেন প্রফেসর, চাইলেন হাতে ধরে থাকা লিফলেটগুলোর দিকে। তারপর ঘাড় হেলালেন। 'ওই বদমাশগুলোকে শায়েস্তা করার জন্যে যা সাহায্য দরকার করব...'

হাসি ফুটল কিশোরের মুখে। ভদ্রলোককে মত পাল্টানোর সময় না দিয়ে শশব্যস্তে ঘর ছাড়ল।

হায়দারের দিকে একবার চেয়ে পিছু নিলেন প্রফেসর।

ক'ঘণ্টা বাদে, বিজ্ঞান সংস্কার সমিতির অফিসের বাইরে পার্ক করল কিশোরদের গাড়ি। আরও অনেক গাড়ি এসেছে। লোকজন দলে দলে প্রবেশ করছে হলরুমে। খোলা দরজার পাশে একটা ট্রেসল টেবিল, ওটার পেছনে বসা সেক্রেটারি। মেম্বারশিপ কার্ড পরীক্ষা করে দেখছেন। তাঁর ডান পাশে দাঁড়ানো একজন হুমদো মত লোক, দেখে মনে হয় কুস্তিগীর। 'লোকজন ভালই জমেছে,' ফিসফিস করে বলল কিশোর, 'আপনি রেডি, প্রফেসর?'

সগর্বে মাথা ঝাঁকিয়ে গাড়ি থেকে বেরোলেন প্রফেসর। তাঁকে রাস্তা পেরিয়ে হলরুমের মুখের দিকে যেতে দেখল কিশোর। কার্ড দেখাচ্ছেন। সেক্রেটারির তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তাঁর ভেতরটা দেখে নিতে চাইছে যেন, দম বন্ধ করে অপেক্ষা করছে কিশোর। সেক্রেটারি মাথা ঝাঁকালে ভেতরে ঢুকে পড়লেন বিজ্ঞানী।

কথা মত পাঁচটা মিনিট বসে রইল কিশোর, তারপর হলরুমের পেছন দিকটায় চলে এল, কার পার্ক আছে এখানে। গাড়িগুলোর মধ্য দিয়ে এঁকেবেঁকে এগোনোর সময় গেটের কাছে একটা ঘোড়ারগাড়িকেও দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। 'ঘোড়ারাও বোধহয় বক্তৃতা শুনতে এসেছে,' ভাবল ও

বিল্ডিঙের পেছন দিকে কোন গার্ড নেই, তবে প্রতিটি দরজা জানালা শক্ত করে আটকানো। গাড়িগুলোর পেছনে লুকিয়ে বসে থাকতে গিয়ে ওর মনে হলো শেষ মুহূর্তে ভড়কে যাননি তো প্রফেসর? রিসার্চ সেন্টার ত্যাগের সময় থেকে কেমন গুম হয়ে ছিলেন ভদ্রলোক।

অবশেষে নড়াচড়া লক্ষ করল ও–একতলার একটা জানালা খুলে যাচ্ছে! হিসিয়ে উঠল একটা নার্ভাস কণ্ঠ, 'কিশোর, আছ ওখানে?' জানালার দিকে দৌড়ে গেল ও, প্রফেসর গলা বাড়িয়ে উঁকি দিচ্ছেন।

ওকে টেনে-টুনে উঠিয়ে নিলেন জানালা দিয়ে। একটা সরু করিডরে নিজেকে খুঁজে পেল ও। ওর আস্তিন ধরে টানলেন প্রফেসর। 'জলদি এসো, তোমার জন্যে একটা লুকানোর জায়গা ঠিক করেছি...'

রিসার্চ সেন্টারে হায়দার দাঁড়িয়ে রয়েছে মেজরের ডেস্কের সামনে। তাঁর অগোচরে ঘটে যাওয়া সমস্ত কিছু জানিয়েছে। মেজর একজন সরকারী কর্তার অফিস থেকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে ফ্যাক্স করেছিলেন, আবিষ্কারে রেইড করার অনুমতি চেয়ে। পাননি। ফলে, রেগে টং হয়ে আছেন।

হিরু চাচা ঢুকল ঘরে, হাই তুলে টান টান করল হাত-পা। তাকে চলে ফিরে বেড়াতে দেখে খুশি হয়ে উঠলেন মেজর আর হায়দার। বন্ধুর ডেস্কে ঠেস দিয়ে বলল সে, 'দোস্ত, ভল্টে কি ছিল বল দেখি। আইডিয়া করতে পারছি, কিন্তু একজ্যাক্টলী জানতে চাই।'

এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে মাথা ঝাঁকালেন মেজর। 'হায়দার, হিরু,' বললেন, 'ব্যাপারটা টপ সিক্রেট। এই সংগঠনে একমাত্র আমাকেই জানানো হয়েছে ইনফর্মেশনটা। বাধ্য হলাম বলে ফাঁস করে দিচ্ছি। কিন্তু একটা অনুরোধ, আর কেউ যেন জানতে না পারে।'

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে মাথা ঝাঁকাল হায়দার।

'বলে ফেল,' খুশির গলায় বলল হিরু চাচা।

মেজর জানালেন, এশিয়ান শক্তিগুলো শান্তি বজায় রাখতে একটি অভিনব পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। বিশেষ একটি দেশের প্রতিনিধিদের সামনে তারা প্রকাশ করে দিয়েছে নিজেদের গুপ্ত পারমাণবিক অস্ত্রাগার আর কম্পিউটার ফায়ারিং কোড। এর পেছনে উদ্দেশ্য হচ্ছে, দেশগুলো কখনও যুদ্ধের হুমকি দিলে সেই বিশেষ দেশটি সমস্ত গোপনীয়তা ফাঁস করে দিতে

পারবে, যার ফলে মহাবিপদে পড়ে যাবে যুদ্ধংদেহী জাতিগুলো।

'নিরপেক্ষ দেশ হিসেবে,' বলে চলেছেন মেজর, 'বাংলাদেশকে বিশ্বাস করেছে সবাই।'

'রীতিমত গর্ব হচ্ছে আমার,' বলল হিরু চাচা।

'ডিস্ট্রাকটর কোডগুলো ছিল কায়সার রশীদের জিম্মায়,' শুকনো গলায় বললেন মেজর, 'ওঁকে খুন করে চুরি করে নিয়েছে সব।'

'ইনফর্মেশনগুলো দিয়ে কি করবে ওরা?' জানতে চাইল হায়দার।

জবাব দিল হিরু চাচা। 'যা বুঝছি, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় ওদের দোসররা বসে আছে, তারা এশিয়ার প্রত্যেকটা অ্যাটমিক মিসাইল ছোঁড়ার ক্ষমতা রাখে। বিশ্বযুদ্ধ শুরু করে দেয়াটা ওদের হাতের মোয়া।'

দু'মুহূর্তের নীরবতা। হতচকিত হায়দার প্রশ্ন করল, 'তাতে লাভ? ওরাও তো মরবে! ওদের মরার ভয় নেই?'

'যুদ্ধ বাধাবে মনে হয় না,' বলল হিরু চাচা। 'ভয় দেখাবে আরকি।'

মাথা ঝাঁকাল হায়দার। 'এতক্ষণে বুঝেছি। দুনিয়াবাসীকে ব্ল্যাকমেইল করার চেষ্টা করবে। হয় আমাদের কথা মত চলো, নইলে দিলাম শেষ করে...'

লম্বা শ্বাস পড়ল মেজরের। 'প্রফেসর চৌধুরীর সাক্ষ্য ইউয করে সরকারকে হয়তো কনভিন্স করতে পারতাম।' চকিতে তাকালেন হায়দারের দিকে। চোখে তিরস্কার। 'কিন্তু তা আর হলো কই! কিশোর ওঁকে নিয়ে লাগতে গেছে শত্রুদের পিছনে। অযথা।'

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল হিরু চাচা। 'প্রফেসর চৌধুরী!' ত্রস্ত কণ্ঠে বলল। 'বলিস কি! প্রফেসরের সঙ্গে কিশোরকে যেতে দিয়েছেন আপনি?' হায়দারের দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকাল। 'আরে, সে-ই তো নাটের গুরু!'

আট

দেয়াল আর একটা অতিকায় ফাইলিং ক্যাবিনেটের মধ্যকার ফোকরে ঘাপটি মেরে বসে আছে কিশোর, শুনছে অভ্যাগতদের বক্তৃতা-ভাষণ। সারি সারি

ফোল্ডিং চেয়ার পেতে মেহমানদের বসবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ওর লুকানোর জায়গা থেকে সবচেয়ে দূর প্রান্তে ছোট্ট একটা মঞ্চ, বক্তাদের জন্যে টেবিল-চেয়ার রাখা। ওর পাশে মেঝেতে, একটা অত্যাধুনিক খুদে টেপ রেকর্ডারের ফিতে ঘুরে চলেছে, দৃষ্টির সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও মিনি ক্যামেরাটা দিয়ে কমিটি আর শ্রোতাদের ছবি তুলতে প্রাণপণ চেষ্টা করছে ও। দুটো জিনিসই রিসার্চ সেন্টারের। রিজভী করিম ব্যবস্থা করে দিয়েছে। বক্তাদের ভাষণ এযাবৎ নিরীহ ও একঘেয়ে। আসর জমে না উঠলে, ফিরে যাবে ভাবল কিশোর।

হঠাৎ একজন পরিচিত মানুষের নাম উচ্চারিত হলো। মঞ্চের পেছন দিকের পর্দা সরিয়ে প্রবেশ করল সে। তসলিমা নাসরীন! ওর পায়ে পায়ে ঘুরছে সাবের। মঞ্চে উঠে ভাষণ শুরু করল তসলিমা, ওর শ্রোতাদের খেপিয়ে তোলার ক্ষমতা দেখে থ বনে গেল কিশোর। বিগত বছরগুলোয় ওদেরকে যে অবজ্ঞা-অপমান সইতে হয়েছে তার জ্বালাময়ী বর্ণনা দিল ও। ভবিষ্যতে যে যোগ্যতা বলে ওরাই দেশ শাসন করবে তাও জানাতে ভুলল না। ঘরের প্রতিটি শ্রোতা করতালিতে ফেটে পড়ল। কিশোর দেখতে পেল, আশেপাশের মানুষগুলোর মুখ-চোখের ভাব-ভঙ্গি পাল্টে যাচ্ছে, উগ্র হয়ে উঠছে ওরা। হাত তুলে নীরবতা চাইল তসলিমা। 'একজন মানুষের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ, যিনি তাঁর অসাধারণ মেধাবলে ক্ষমতা এনে দিয়েছেন আমাদের হাতের মুঠোয়–প্রফেসর সালাম চৌধুরী!' সদম্ভে মঞ্চে গিয়ে উঠলেন প্রফেসর, অল্প অল্প মাথা ঝাঁকিয়ে শ্রোতাদের হর্ষধ্বনির প্রত্যুত্তর দিচ্ছেন।

আবার হাত তুলল তসলিমা। 'প্রফেসর সঙ্গে করে তাঁর শ্রেষ্ঠ আবিষ্কারটিকে নিয়ে এসেছেন। বুদ্ধি, শক্তিমত্তা, পবিত্রতা–সব মিলিয়ে ওটা আমাদের আদর্শেরই প্রতিমূর্তি!'

বিপুলাকায় ধাতব মূর্তিটিকে হেলেদুলে মঞ্চে উঠে, সন্ত্রস্ত শ্রোতাদের দিকে চাইতে দেখে হাঁ হয়ে গেল কিশোর। সামনে ঝুঁকে পড়ে, যত দ্রুত যত বেশি সম্ভব ফটো তুলতে লাগল ও: প্রফেসর চৌধুরী, তসলিমা, সাবের আর রোবট। আজাদ চাচার অ্যালবামে চমৎকার মানাবে গ্রুপ ছবিটি।

ওদিকে, শোরগোল শুরু হয়েছে দরজার কাছে। মুশকো জোয়ানটা একজন কোকড়া চুলের দীর্ঘদেহী লোকের সঙ্গে তর্কাতর্কি করছে। হিরু

চাচা মেজরের নিষেধ অমান্য করে একাই এসে হাজির। সশস্ত্র পার্টি সংগঠিত করা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে রাজি হয়নি।

'শোনেন, সাহেব,' উত্তেজিত লোকটি বলল, 'কতবার বলব, মেম্বারশিপ কার্ড ছাড়া ঢোকা যাবে না?'

হিরু চাচা পকেট হাতড়ে হাতড়ে বিভিন্ন ধরনের কার্ড বের করছে। দেখাচ্ছে আশা নিয়ে। 'ড্রাইভিং লাইসেন্স···না··· এটায় চলবে? প্লটিনা টেবিল টেনিস ক্লাবের আজীবন সদস্য? ওদের প্লেয়াররা কিন্তু ফেলনা নয়। আমার তো জিততে দম বেরিয়ে যায়···' লোকটা হুমকির দৃষ্টিতে চাইলে হিরু চাচা বলল, 'এগুলো নিয়ে আপনি মাথা ঘামাবেন কেন? আমি শুধু একটু উঁকি দিয়েই···'

টেবিলের পাশ দিয়ে সুড়ুৎ করে সটকে পড়ার তালে ছিল হিরু চাচা, কিন্তু লোকটাও ত্যাঁদড় কম নয়। দুটো বিশাল হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরতে চাইল। হিরু চাচাই বা ধরা দেবে কেন? চকিতে একপাশে সরে গেল, শূন্য বাতাস জাপটে ধরল ষণ্ডা লোকটা। এতেই কি হেনস্থার শেষ? হিরু চাচা কোন ফাঁকে ল্যাং মেরে দিয়েছে প্রতিযোগীকে, ফলে টেবিল উল্টে পপাত ধরণীতল হলো লোকটা। টেবিলের কোনায় কপাল ঠুকে যেতে জ্ঞান হারাল।

'কেন বাবা ঝামেলা পাকাতে গিয়েছিলে?' করুণার হাসি হেসে বলল হিরু চাচা। 'আমাকে ঢুকতে দিলে কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হত?'

লবিতে পা রেখে, জোড়া দরজার ভিতর দিয়ে জনাকীর্ণ হলরুমটা দেখে নিল হিরু চাচা। সার সার ঘাড় দেখতে পাচ্ছে, আর ওই যে মঞ্চে প্রফেসর সালাম, তসলিমা, সাবের আর রোবট! করিডর ধরে পেছন দিকটায় উদ্দেশে তড়িঘড়ি এগোল হিরু চাচা।

তসলিমার বক্তৃতার পর থেকে কিশোরের মনে রাজ্যের প্রশ্ন জট পাকাচ্ছে। প্রফেসর সালাম যদি ষড়যন্ত্রে জড়িতই হবেন, তবে ওকে এখানে এনেছেন কেন? এখন পর্যন্ত ধরাই বা পড়েনি কেন ও? পালানোর জন্যে নিশপিশ করছে দু'পা, কিন্তু ফাইলিং ক্যাবিনেটটা একটা দেয়ালের মাঝখানে দাঁড়িয়ে, দরজা পর্যন্ত পৌঁছনোর আগেই ধরা পড়ে যাবে ও।

তসলিমা তখনও বকে চলেছে মঞ্চে···'বিনা বাধায় এত কিছু পাইনি আমরা। গুপ্তচর লাগানো হয়েছিল আমাদের পেছনে, তথাকথিত কর্তৃপক্ষের

কাছে ধরিয়ে দেয়ার চেষ্টা হয়েছিল।'

কিশোর এতক্ষণে বুঝতে পারল, কেন ওকে এখনও পাকড়াও করা হয়নি। বেড়াল-ইঁদুর খেলা চলছে। মানুষকে উত্তেজিত করার পর গুপ্তচরটিকে আবিষ্কার করা হবে।

'কিন্তু ওরা ব্যর্থ হবেই হবে,' ভাষণের শেষ পর্যায়ে এসে বলল তসলিমা। 'যারা আমাদের পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়াবে, তাদের একে একে খুঁজে বার করে নির্মূল করা হবে!'

কিশোরের গুপ্তস্থানের দিকে ধীরে সুস্থে এগোচ্ছে রোবটটা। অতিকায় ফাইলিং ক্যাবিনেটটা তুলে একপাশে সরাল, উন্মোচিত হলো রেকর্ডার আর ক্যামেরাসহ গুটিসুটি মেরে বসে থাকা কিশোর। মঞ্চ থেকে নেমে এল তসলিমা, অনুসরণ করল সাবের আর প্রফেসর চৌধুরী।

কিশোরের দিকে নাটুকে ভঙ্গিতে হাত দেখাল তসলিমা। 'ও একজন স্পাই—স্পাইদের কিভাবে ডিল করতে হয় জানি আমরা, কি বলেন?'

উৎকট গর্জন ছাড়ল সমবেত জনতা, ধেয়ে আসছে এদিকে। বিড়বিড় করে বলল সাবের, 'ওদের থামান—খেপে বোম হয়ে আছে, ছেলেটাকে ছিঁড়ে কুটিকুটি করে ফেলবে।' তসলিমা নির্বাক। উন্মত্ত জনতা কিশোরকে ঘিরে ফেললে চোখের তারায় হাসি ফুটল ওর। টেপ রেকর্ডার আর ক্যামেরা ছাতু হয়ে গেছে। ধরা পড়ে ছটফট করছে কিশোর।

হঠাৎ একটা পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনতে পেল ও। 'গুড ইভনিং, লেডিজ অ্যাণ্ড জেন্টলমেন।'

সবার মাথা ঘুরে গেল। মঞ্চের মাঝখানে দাঁড়িয়ে একজন লম্বা লোক, চেয়ে রয়েছে এদিকে। 'তা, সম্মানিত শ্রোতামণ্ডলী,' বিদ্রূপের স্বরে বলল লোকটি, 'আমার বন্ধু মেজর আজাদ সদলবলে আসার আগ পর্যন্ত, আমার দায়িত্ব আপনাদের চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করা। তা কিভাবে আপনাদের একটু খুশি করতে পারি, বলুন? গান শুনবেন? কি গান, ইংলিশ না বাংলা? একটু ব্রেক ড্যান্স দেখাব?' ব্রেক ড্যান্সের নামে হিরু চাচা খানিকক্ষণ দেশি খেমটা নাচ দেখাল। 'আমি কিন্তু ভাল রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে পারি,' বলল সে। 'অবশ্য আপনারা চাইলে গজলেও আপত্তি নেই...' তার কাণ্ড-কারখানা দেখে অনেকে হো হো করে হেসে উঠল। কেউ কেউ হাততালি দিচ্ছে। হিরু চাচার উৎসাহ এতে তিনগুণ বেড়ে গেল। 'থ্যাঙ্ক ইউ, থ্যাঙ্ক ইউ!' মাথা

পেতে অভিনন্দন গ্রহণ করছে। 'একটু জাদু দেখাই?' পকেট থেকে এক প্যাকেট তাস বার করে ফোয়ারার মত ছুঁড়ে দিল বাতাসে, তারপর নিখুঁতভাবে লুফে নিয়ে পুরে রাখল প্যাকেটে।

তসলিমা নাসরীন খেপে লাল। এই উটকো ঝামেলাটা সযত্নে গড়া সমস্ত পরিকল্পনা ভেস্তে দিল। মেজর এসে সবাইকে হাতকড়া পরানো অবধি, গর্দভগুলোকে ঠিকই মাতিয়ে রাখতে পারবে ব্যাটা। ঠিক সে সময় জোড়া দরজা দিয়ে টলতে টলতে ঘরে ঢুকল ষণ্ডা লোকটি। জ্ঞান ফিরে পেয়েই হিরু চাচার মুণ্ডু চিবিয়ে খেতে অস্থির হয়ে উঠেছে। 'গেল কই?' আপন মনে বিড়বিড় করে বলছে।

মঞ্চের দিকে তর্জনী দেখাল তসলিমা! 'ওই যে। চেপে ধরো।'

কাঁধ দিয়ে ভিড় ঠেলে এগোচ্ছে যখন ও, হিরু চাচা তখন বলছে, 'এবারের হাত সাফাইয়ে একজন সঙ্গী দরকার। আপনাদের মধ্যে থেকে আসবেন কেউ?' ভোমা লোকটাকে মঞ্চে ওঠার চেষ্টা করতে দেখে হিরু চাচা খোশমেজাজে বলল, 'ও, আপনি? আসুন, আসুন!' বাড়িয়ে দিল ডান হাত, লোকটা ধরলও। এবং ভুলটা করল। হিরু চাচা এক হ্যাঁচকা টান মেরে এমনভাবে মুচড়ে দিল হাত যে 'আই বাপ' বলে চেঁচিয়ে উঠতে বাধ্য হলো ও। কাতরাচ্ছে। হিরু চাচার সঙ্গে তৃতীয়বার লাগতে আসার মত বুকের পাটা নেই ওর। দরজা লক্ষ্য করে ভোঁ দৌড় দিল।

তসলিমা রাগে দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য। 'ওই লোকটাও স্পাই। আমাদের সবাইকে ডোবাবে। শিগ্‌গির চেপে ধরো ওকে।'

অপেক্ষাকৃত যুবক ও সক্রিয় সদস্যরা মঞ্চে উঠে এল। হিরু চাচা দুই ঘুসিতে প্রথম দু'জনকে চিত করে দিলেও অনেকের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারল না। তারও বেশ কিছু প্রাপ্তিযোগ ঘটল। শেষ পর্যন্ত টেনে হিঁচড়ে তসলিমার সামনে নিয়ে আসা হলো তাকে। মহিলাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে হাসি মুখে কিশোরকে বলল, 'কি রে, কিশোর? ঠিক তো হো?' লোকের ভিড়ে আড়ালে পড়া বেঁটে প্রফেসরের দিকে ফিরল এবার। 'একটা কথা বলুন, প্রফেসর,' প্রশ্ন করল। 'এদের সঙ্গে কেন?'

কিশোর লক্ষ করল হিরু চাচার চোখের দিকে তাকাতে পারছেন না ভদ্রলোক। দু'কদম হটে গিয়ে মেঝের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন 'কারণ, বহু বছর ধরে মানুষকে বোঝাতে চেষ্টা করছি, পৃথিবীটাকে যেন

দূষিত না করে। এদের সাহায্যে বাধ্য করতে পারব বড় বড় দেশগুলোকে।'

দীর্ঘশ্বাস পড়ল হিরু চাচার। 'জানতাম এমনই কিছু বলবেন। কিন্তু একটা ব্যাপার ভুলে যাচ্ছেন, প্রফেসর। এর ফল কখনোই ভাল হবে না।'

প্রফেসর চৌধুরী তসলিমার দিকে তাকালেন। 'এঁর ব্যাপারে কি করবেন?'

'আবার কি, খুন! খুব ঘুঘু লোক, সুযোগ পেলেই ক্ষতি করবে।'

বাস্তবিকই সন্ত্রস্ত বোধ করলেন প্রফেসর। 'ওঁকে আটকে রাখলেই তো হয়, খুনোখুনির প্রশ্ন উঠছে কেন?'

'যদি পালায়? না, না, অত খুঁতখুঁত করলে চলবে না।'

প্রফেসরের দিকে সহানুভূতির দৃষ্টিতে তাকাল হিরু চাচা। 'দেখলেন তো?'

তা দেখলেন বৈকি বিজ্ঞানী। সহযোগীদের নিষ্ঠুরতা ঘোর প্রভাব ফেলেছে ছোট-খাটো মানুষটির ওপর। হিরু চাচা আর কিশোরকে চেপে-ধরে-রাখা লোকগুলোর দিকে ফিরল তসলিমা। 'এদেরকে সেলারে নিয়ে যাও।'

হাত-পা ছোঁড়াছুঁড়ি করছে চাচা-ভাতিজা, কিন্তু বিরোধী পক্ষ দলে অনেক ভারী। দরজার দিকে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ওদের...

হলরুমে আচমকা গুলির শব্দ শোনা গেল। নতুন পারফর্মার মঞ্চে জায়গা করে নিয়েছেন। মেজর আজাদ। হাতে ধোঁয়া ওঠা রিভলভার, সঙ্গে হায়দার এবং একদল সশস্ত্র সৈন্য। নিচের উচ্ছৃঙ্খল জনতার উদ্দেশে চড়া গলায় বক্তব্য রাখলেন মেজর।

'যে যেখানে আছেন থাকুন! একটুও নড়বেন না! আমার লোকেরা ঘিরে রেখেছে এই বিল্ডিং। কেউ পালাতে পারবেন না।'

মুহূর্তে হল্লা শুরু হয়ে গেল। আতঙ্কগ্রস্ত সদস্যরা মেজরের নির্দেশের তোয়াক্কা না করে যে যেদিকে পারে দে ছুট। সৈন্যরা হলরুমে ছড়িয়ে পড়ে ওদেরকে ঠেকাতে চেষ্টা করছে, রাগবি খেলার মত ধস্তাধস্তি চলছে ঘরময়। সৈন্যদের হাত-পা বেঁধে দিয়েছেন মেজর স্বয়ং, নিজে ফাঁকা গুলি ছুঁড়ে সতর্ক করলেও নিরস্ত্র লোকদের ওপর গুলি চালাতে নিষেধ করে দিয়েছেন কঠোরভাবে। কোন সৈন্য আগে গুলি করতে পারবে না।

হিরু চাচা আর কিশোর মানুষের ঠেলাঠেলিতে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। হিরু

চাচা ঝটকা মেরে নিজেকে ছাড়িয়ে নিলেও ভিড়ের চাপে ওর কাছে পৌঁছতে পারছে না। কিশোরের হাত দুটো পেছন দিকে শক্ত করে ধরে আছে সাবের। রোবটটা এতক্ষণ ধরে নির্বিকার। কেউ ওটাকে কোন অর্ডার দেয়নি কিনা!

তসলিমা প্রফেসরের কাঁধ চেপে ধরে, ঠেলে নিয়ে গেল রোবটের কাছে। 'এটাকে কাজে লাগিয়ে আমাদের পালানোর ব্যবস্থা করুন। অন্তত কারপার্ক পর্যন্ত যেতেই হবে।'

কাঁপা কাঁপা গলায় প্রফেসর বললেন, 'অ্যাকটিভেট! আমরা এখন যাব। তুমি আমাদের বাঁচাও।'

বিনা বাধায়, ভিড় ঠেলে পথ করে এগিয়ে চলল যন্ত্রমানব, নৌকা যেমন পানি কেটে তরতরিয়ে এগোয় তেমনি। পেছন দরজার দিকে যাচ্ছে। ওটাকে পায়ে পায়ে অনুসরণ করছে তসলিমা আর প্রফেসর। সাবের পেছনমুখো হয়ে অনুগমন করছে ওদের, কিশোরকে ঢালের মত করে ধরে রেখেছে সামনে, আত্মরক্ষার্থে।

হিরু চাচা ওদের মতলব বুঝতে পেরে, রীতিমত লড়াই করে কিশোরের কাছে পৌঁছতে চাইল। ছুঁই ছুঁই অবস্থায় একটা ধাতব হাত তার বাহু ধরে উঠিয়ে ফেলল শূন্যে, ছুঁড়ে দিল জনতার মধ্যে। চিতপাত হয়ে পড়ল হিরু চাচা, পলায়নরত কেউ কেউ মাড়িয়ে দিল তার দেহ।

মঞ্চে দাঁড়িয়ে রোবটটাকে দরজার দিকে যেতে দেখলেন মেজর। অসহায় চোখে। রিভলভার তুলেও নামিয়ে নিলেন। কিশোরের গায়ে লেগে যাবার ভয় আছে। পেছন দরজা দিয়ে বেরিয়ে চোখের আড়াল হয়ে গেল দলটা।

মরণপণ লড়ল কিশোর, কিন্তু সাবের মিনমিনে স্বভাবের হলেও শক্তিশালী, বজ্র আঁটুনিতে ধরে রেখেছে। হলরুম, কারপার্ক পর্যন্ত ছেঁচড়ে নিয়ে ওকে তোলা হলো সেই ঘোড়ার গাড়িটার পেছন দিকে। প্রফেসর চৌধুরী, তসলিমা এবং সবশেষে রোবটটাও উঠল। দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দৌড়ে গিয়ে কোচোয়ান সেজে বসল সাবের। উর্ধ্ব গতিতে ছুটিয়ে দিল গাড়ি। মেইন গেটের কাছে সৈন্যদের সেট করা ব্যারিকেড ভেঙে চুরমার করে দিয়ে তীব্র গতিতে ছুটছে ওটা। গাড়ির ছাদে রোবটটার মাথা ঠেকে যাবে বলেই ছাদখোলা ঘোড়ার গাড়ির ব্যবস্থা করেছে ওরা। হায়দার

বহুকষ্টে বেরিয়ে এসেছে হলরুম থেকে, ওদের পেছন পেছন। ল্যাণ্ডরোভারে চেপে বসে ধাওয়া দিল।

হলরুমের ভেতরে ততক্ষণে শৃঙ্খলা ফিরে এসেছে। বিজ্ঞান সংস্কার সমিতির সদস্যদের কলার ধরে ধরে তোলা হচ্ছে রিসার্চ সেন্টারের লরিতে। হিরু চাচা আর মেজর আজাদ ছাড়া অল্প লোকই রয়েছে ঘরে।

হিরু চাচার জামা-কাপড় একটু আধটু ছিঁড়েখুঁড়ে গেলেও চোট অসহনীয় নয়। মঞ্চের এক কোণে বসে আছে সে, দেখছে ঘরের নয়ছয় অবস্থা। এখানে ওখানে পড়ে আছে ঠ্যাং ভাঙা ফোল্ডিং চেয়ার, অবাধ্য জনা কয়েক সদস্যকে টেনে-টুনে নিয়ে যাচ্ছে সৈন্যরা।

'প্রফেসর চৌধুরীই এসব কিছুর জন্যে দায়ী,' বলছে হিরু চাচা। 'একমাত্র সে-ই রোবটটাকে রিপ্রোগ্রাম করে প্রাইম ডিরেকটিভের বারোটা বাজাতে পারে–কিন্তু কী কপাল, সে-ও পুরোপুরি সাক্সেসফুল হয়নি। রোবটটা কিশোরের কথা মানছিল।'

ঘোঁত করে উঠলেন মেজর। 'তারমানে মার খেয়ে কাবার্ডে বন্দী থাকার পুরোটাই অভিনয়...'

'হ্যাঁ, সবটাই ওদের সাজানো। সালাম তোর কাছে ভাল থাকার একটা চান্স নিয়েছিল।'

'এসব কথা আগে বলিসনি কেন?'

'সুযোগ পেলাম কই? তাছাড়া সালাম অ্যামবুশ না করা পর্যন্ত শিয়োরও তো হতে পারছিলাম না। আর আমার জ্ঞান ফেরার আগেই তো কিশোরকে ছেড়ে দিলি ওর সঙ্গে।'

'আমার কথা বলিস না। আমি ছাড়িনি–'

হায়দার এলে চুপ করে গেলেন। ওয়াকিটকি সেট সার্জেন্টের হাতে। 'ওদের ধরতে পারলাম না, স্যার। টায়ার পাংচার হয়ে গিয়েছিল।'

মেজরকে দেখে মনে হলো এক্ষুণি ফেটে পড়বেন। হায়দার ব্যস্তসমস্ত হয়ে বলল, 'আপনার কল, স্যার। রিসার্চ সেন্টার থেকে লিঙ্কড। ডাক্তার হালদার, স্যার।'

আবিষ্কারে বেশ ফুর্তিতে আছে মানস হালদার। ওর ইন্সপেকশনের জন্যে সমস্ত নথিপত্র সরবরাহ করতে বাধ্য করেছে ওদের। কথা শোনাতেও

পিছপা হয়নি। ফাইলিং সিস্টেমের সমালোচনা করেছে, দু'একটা মেডিকেল পরীক্ষাও করেছে ওদের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্যে। দিনান্তে, পার্টিশন দেয়া ওর ছোট্ট ঘরটায় সেঁধিয়েছে, বলেছে রেকর্ড যাচাই করা বাকি।

কিন্তু চারদিক নিঝুম দেখে পা টিপে টিপে বেরিয়ে এসেছে, আবিষ্কারের করিডরগুলোয় উঁকিঝুঁকি মেরেছে, প্রমাণ হাতে পেতে–অবশ্য কি যে খুঁজছে নিজেই জানে না। বেশ ক'টা ল্যাব ফাঁকা, অন্যগুলো সারা রাত্রি কাজের জন্যে তৈরি। শেষমেশ, তসলিমার অফিসে চুরি করে ঢুকে তল্লাশি চালিয়েছে। মনের সুখে একাধিক ফাইলিং ক্যাবিনেটের তালা ভেঙেছে, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন বেসরকারী বিজ্ঞান সংস্থার সঙ্গে এদের যোগাযোগের প্রমাণ পেয়েছে–অবশ্য বেশিরভাগই সাঙ্কেতিক। যা যা সন্দেহজনক সবই ডাক্তারি ব্যাগে ঢেলে দিয়েছে, মেজরের হাতে তুলে দেবে।

তদন্তের শেষ পর্যায়ে, নিচের উঠন থেকে হৈ হল্লার শব্দ শুনতে পেয়েছে। জানালা দিয়ে চেয়ে দেখে, একটা ঘোড়ারগাড়ি ফুল স্পীডে মেইন গেট পেরিয়ে ফ্রন্ট এন্ট্রান্সের সামনে এসে থেমেছে। ড্রাইভিং সীট থেকে লাফিয়ে নেমেছে সাবের, পেছন দিক থেকে নামার ব্যবস্থা করে দিয়েছে তসলিমাকে। দু'জনেই দৌড়ে ঢুকে পড়ল বিল্ডিঙে। মুহূর্তখানেক পরে একজন সিকিউরিটি গার্ড ছুটে বেরোল বিল্ডিং ছেড়ে, ঘোড়ার গাড়িটার সামনে লাফিয়ে উঠে বসে ছুটিয়ে দিল। বেল বাজানো হচ্ছে কেন কে জানে, নিরাপত্তারক্ষী এবং ল্যাবোরেটরীর কর্মীরা দৌড়ে গিয়ে গাড়িতে উঠছে, রেস লাগাচ্ছে ভ্যানটার পেছনে।

দু'মুহূর্ত ভেবে ফোন ওঠাল মানস, রিসার্চ সেন্টারের নম্বর ডায়াল করল। অসহ্য বিলম্বের পর, রেডিও নেটওয়র্কে ওর কলটা জোড়া হলে মেজরের সঙ্গে কথা বলতে পারল। ত্রস্তকণ্ঠে তদন্ত রিপোর্ট পেশ করল ও, ঘটনার নতুন মোড় সম্বন্ধেও জানাল। 'মনে হয় সবাই কেটে পড়ছে, স্যার। আগে থেকে অ্যারেঞ্জ করা ছিল।'

'আপনার কোন ধারণা আছে, কোথায় যাচ্ছে?' মেজরের কণ্ঠ উত্তেজনায় ভরপুর।

'জ্বী না, স্যার···এক সেকেণ্ড। সকালে যখন ছোঁক ছোঁক করছিলাম, তখন দু'একজনকে বলতে শুনেছি শিগ্‌গিরই নাকি চম্পট দিতে হবে। মনে

করেছিলাম ঠাট্টা করছে…'

মানস আলাপচারিতায় এতই মশগুল যে একজন সিকিউরিটি গার্ড কোন্ ফাঁকতালে দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে টেরই পায়নি। নিঃশব্দে ওর দিকে এগোল লোকটা, রাবার সোলের জুতো মেঝেতে একটুও শব্দ তোলেনি। শেষ মুহূর্তে ওর শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনে ঘুরে তাকাল মানস–কিন্তু দেরি হয়ে গেছে অনেক। একটা বেটন সজোরে নেমে এল ওর মাথায়, তীব্র ব্যথা অনুভব করল ও, তারপর দপ করে নিভে গেল চোখের বাতি। চারধার ঘোর অন্ধকার।

নয়

রেডিওটা অসহিষ্ণুর মত ঝাঁকাচ্ছেন মেজর। 'লাইন ডেড। মানস কেটে দিয়েছে।'

'হয়তো বা ধরা পড়েছে।' বলল হিরু চাচা। 'তবে আর যাই হোক, ওকে কোথায় খুঁজতে হবে জানি তো। চল, আবিষ্কারে হানা দিই।'

মেজর দ্রুত বিভিন্ন নির্দেশ দিতে লাগলেন, এবং অবিশ্বাস্যভাবে খুব অল্প সময়েই আবিষ্কারের দিকে রওনা হলো একটা ছোট-খাটো সাঁজোয়া বাহিনী। সর্বাগ্রে, ল্যাণ্ডরোভারের ড্রাইভিং সীটে মেজর, পাশে হিরু চাচা। গাড়ির টায়ার পাল্টানো হয়েছে। পেছনে সশস্ত্র সৈন্যদের লরির বহর।

আবিষ্কারের মেইন গেটে পৌঁছে তো সকলের চক্ষু চড়কগাছ। ফটক হা হা করছে। গার্ড নেই। বিল্ডিঙের ফ্রন্ট ডোরও খোলা। সবকটা বাতি জ্বলছে যদিও, তবে প্রাণের সাড়া নেই। সিঁড়ি ভেঙে বিল্ডিঙের ভেতরে দৌড়ে ঢোকার সময় রূপকথার মায়াপুরীর কথা মনে পড়ে গেল হিরু চাচার। অফিস আর ল্যাবোরেটরীগুলো খাঁ খাঁ করছে। গোটা বিল্ডিংটা চষে ফেলার আদেশ দিলেন মেজর। তারপর বন্ধুকে নিয়ে ডিরেক্টরের অফিসের দিকে পা বাড়ালেন। বলাবাহুল্য, ওটাও ফাঁকা। ফাইলিং ক্যাবিনেটগুলো সাফ–এক টুকরো কাগজের হদিসও পাওয়া গেল না।

চারধারে তাকিয়ে বললেন মেজর আজাদ, 'এখন কি করা?'

হিরু চাচা জবাব দেয়ার আগেই হন্তদন্ত হয়ে ঘরে প্রবেশ করল হায়দার। 'স্যার, কোথাও কেউ নেই। একদম খালি।'

'থাকার কথাও নয়,' গম্ভীর মুখে বলল হিরু চাচা। 'আমার ধারণা, ওরা পুরোপুরি ধাপ্পা দেয়নি। পারমাণবিক যুদ্ধ বাধানোর ধান্দায় আছে। আর তাহলে নিজেদের জন্যেও নিশ্চয় আশ্রয় ঠিক করে রেখেছে। কিন্তু কোথায় সেটা? ওখানেই পালিয়েছে ওরা...'

হঠাৎ চাপা চিৎকার করে উঠলেন মেজর। 'দি আইডিয়া! আগে কেন মাথায় এল না! হিরু, হায়দার, আসুন আমার সঙ্গে!' পড়িমরি ঘর ছাড়লেন উনি, অগত্যা পিছু নিতে বাধ্য হলো হিরু চাচারা।

'এক্সকিউজ মি, স্যার,' শশব্যস্তে করিডর ধরে হাঁটতে হাঁটতে প্রশ্ন করল হায়দার। 'আমরা আসলে কোথায় যাচ্ছি?'

'বাঙ্কারে,' কাঁধের ওপর দিয়ে বললেন মেজর

'জায়গাটা কোথায়?' জিজ্ঞেস করল হিরু চাচা।

দাঁত বিকশিত করলেন মেজর। 'বললে বিশ্বাস করবি না, দোস্ত, এই বাগানের নিচেই।'

সেনাবাহিনী আবারও যাত্রা করল, পেরিয়ে গেল আবিষ্কারকে ঘিরে থাকা পার্কের মত বিস্তীর্ণ মাঠটা। পার্কের শেষ প্রান্তে এক ফালি জংলা মত জমি, সেখানে ব্রেক কষলেন মেজর। ল্যাণ্ডরোভারে উঠে দাঁড়িয়ে, সোয়াগার স্টিকটা উঁচিয়ে নির্দেশ করলেন। 'ওই যে, দোস্ত, বাঙ্কার।' একটা সুপ্রশস্ত কংক্রিটের বিল্ডিং, গাছে ঘেরা একটা গহ্বরে মাথা জাগিয়ে বসে আছে। বাড়িটা ইংরেজী 'U' আকৃতিতে তৈরি, দুটো লম্বা ডানাকে যুক্ত করেছে ছোট আরেকটা ডানা–সেটার আবার সৌন্দর্য বর্ধন করেছে একটা টাওয়ার। 'U'–এর দু'ডানার মধ্য দিয়ে একটা কংক্রিটের পথ গিয়ে মিলেছে মস্ত একটা ধাতব দরজায়। শক্তিশালী ফ্লাড লাইটের আলোয় উজ্জ্বল চারদিক

'পরীক্ষামূলক অ্যাটমিক বম শেলটার,' জানালেন মেজর 'আবিষ্কারের লোকেদের তৈরি। ছোট একটা কমিউনিটিকে রক্ষা করতে সক্ষম। পাওয়ার সাপ্লাই, খাবার-পানি, বাতাস বিশুদ্ধকরণ যন্ত্রপাতি–সব আছে একেবারে স্বয়ংসম্পূর্ণ! একটা রিপোর্টও পড়েছিলাম এটা সম্বন্ধে সরকার প্রথমে অনুমতি দিতে চায়নি। কিন্তু আবিষ্কারের হর্তাকর্তারা প্রভাব খাটিয়ে আদায় করে নিয়েছে। আগে বুঝিনি কেন ওরা অত ঝুলোঝুলি করছিল...' মিইয়ে

গেল মেজরের কণ্ঠ। 'গোড়া থেকেই সব প্ল্যান পাকা করে রেখেছিল!'

মাথা ঝাঁকাল হিরু চাচা। 'ওদের ধাপ্পাবাজিকে চ্যালেঞ্জ করলে যুদ্ধ বাধিয়ে দেবে। নিজেরা আরামে বসে থাকবে ওটার ভেতর, যুদ্ধ শেষে যারা বেঁচে থাকবে তাদের ওপর খবরদারী করবে।'

'হুঁ,' অন্যমনে বললেন মেজর। 'হায়দার, ডেমোলিশন পার্টির বন্দোবস্ত করুন। খোল থেকে বার করে আনব ওদের!'

হিরু চাচা, মেজর, হায়দার আর সৈন্যদল উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন অত্যাধুনিক প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ নিয়ে চুপিসারে কংক্রিটের রাস্তা দিয়ে এগোল। বন্ধ দরজার কাছে পৌঁছে ক্লান্ত চোখ দুটো চারধারে ঘুরাল হিরু চাচা। বাতাস শুঁকছে যেন। কংক্রিটের বেঢপ দেয়ালগুলোর ওপর চোখ বুলাচ্ছে সে, যে কোন পরিবর্তনের জন্যে সম্পূর্ণ সজাগ। আচমকা চেঁচিয়ে উঠল, 'ওই দেখুন! শুয়ে পড়ুন সবাই!' পেছন দিকে নিজেকে ছুঁড়ে দিল সে, পড়ার সময় যাকে যাকে পারল ঠেলে সরিয়ে দিল রাস্তাটা থেকে। মেশিনগানের অবিরাম গুলিবর্ষণের শব্দে ভারী হয়ে উঠল বাতাস, মুহূর্তে ক্রস ফায়ার গোটা এলাকাটাকে কব্জা করে নিল।

অতর্কিত হামলায় ছত্রখান মেজর বাহিনী দ্রুত পিছিয়ে গেল।

মেজর রেগে কাঁই। 'ওদের ট্রুপ আছে এখানে।'

মাথা নাড়ল হিরু চাচা। 'মনে হয় না। খুব সম্ভব অটোমেটেড গান নেস্ট। শত্রু কাছে এগোলে তাদের শরীরের তাপে চালু হয়ে যায়।'

ল্যাণ্ডরোভারের রেডিও হঠাৎ করে কড়কড় করতে লাগল। হায়দার তুলে নিল ওটা। 'কেউ বোধহয় আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইছে, স্যার।'

সেট থেকে বেজে উঠল তসলিমার কণ্ঠ, অ্যাটমসফেয়ারিকসের কারণে একটু ডিস্টার্ব করলেও চেনা যাচ্ছে পরিষ্কার। 'মেজর, বাঙ্কার থেকে কথা বলছি। শুনতে পাচ্ছেন?'

মেজর ছিনিয়ে নিলেন রেডিও। 'পাচ্ছি। আপনারা এখুনি বেরিয়ে এসে সারেণ্ডার করুন।'

ঠাণ্ডা কণ্ঠস্বরটার আত্মতৃপ্তি রেডিওতে পর্যন্ত স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। 'ওটা করছি না, মেজর। আমাদের বাঙ্কারটা অভেদ্য, বুঝতেই পেরেছেন। আমাদের অটোমেটিক ডিফেন্স সিস্টেমের ক্ষমতা একটু আগে নিজের

চোখেই দেখেছেন।'

'বেরিয়ে আসুন, নইলে উড়িয়ে দেব,' বললেন মেজর। 'সারেণ্ডার করলে বেঁচে যাবেন। কিন্তু বাধা দিলে দায়-দায়িত্ব আপনাদের।'

অদৃশ্য বক্তা এক মুহূর্ত নিঃসাড় থাকল, তারপর গলা পরিষ্কারের শব্দ। 'ভুলে যাচ্ছেন, মেজর, আপনাদের দু'দু'জন লোক আমাদের জিম্মি। ডক্টর মানস আর কিশোর।'

মেজর বন্ধুর দিকে এক ঝলক চাইলেন। চোখে বেদনা। কিন্তু জবাব দিলেন দৃঢ় গলায়। 'তাতে আমি ডিউটি থেকে পিছপা হব না। আবারও বলছি, সারেণ্ডার করুন, নয়তো অ্যাটাক করছি আমরা।'

তসলিমার কণ্ঠে শীতল ক্রোধ। 'দরজার কাছে জ্যান্ত পৌঁছতে পারবেন না, মেজর। আর পারলেও ভেতরে ঢুকতে পারছেন না। আপনি বরং বসদের সঙ্গে কনট্যাক্ট করুন। গভর্নমেন্ট এতক্ষণে আমাদের দাবি জেনে গেছে। সবগুলো শর্ত মেনে না নিলে ডিস্ট্রাকটর কোড ইউজ করব আমরা। এক ঘণ্টা সময় দিলাম–সারেণ্ডার করার জন্যে।'

ডেড হয়ে গেল সেট। ওটা গাড়িতে ছুঁড়ে দিলেন মেজর। 'মেয়েলোকটা পাগল হয়ে গেছে!'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল হিরু চাচা। 'হতে পারে। কিন্তু যা বলছে করে ছাড়বে।'

'আমিও। হায়দার, বাজুকা আর কিছু গ্রেনেড আনুন তো। মেশিনগান নেস্ট অকেজো করতে হবে আগে।'

বাঙ্কারের গভীরে, গোলাকার কন্ট্রোলরুমে চরম কর্মব্যস্ততা। রেডিও কমিউনিকেশন সেট আপ, মনিটর স্ক্রীন, অটোমেটিক ক্যামেরা আর বাঙ্কারের কন্ট্রোল সিস্টেম ঘরটির বেশিরভাগ দখল করে রেখেছে। বাকি অংশ জুড়ে সংখ্যাসূচক কি বোর্ড সমৃদ্ধ একটি কম্পিউটার টার্মিনাল। কি বোর্ডটির ওপর একটি পেল্লায় ডিজিটাল কাউন্টডাউন ঘড়ি নিথর দাঁড়িয়ে সংখ্যা উঠে আছে ৬০০। ছয়শো সেকেণ্ড–অর্থাৎ দশ মিনিট।

তসলিমা, সাবের আর প্রফেসর চৌধুরী মনিটরটার দিকে অপলকে চেয়ে। দরজার কাছ থেকে শুরু হওয়া বিস্তৃত পথটা দেখা যাচ্ছে, শেষ মাথায় মেজরের ছোট্ট সাঁজোয়া বাহিনী। ল্যাণ্ডরোভারটা সবার সামনে, মেজর আর হিরু চাচা ওটার পাশে দাঁড়ানো।

সাবের ভিতু কণ্ঠে বলল, 'ওরা আক্রমণ করে বসবে না তো?'

তসলিমার গলা যথারীতি শান্ত, স্বাভাবিক। 'করবে। মেজর জেদী লোক।' পাশে রাখা ব্রিফকেসটা থেকে একটা বই বের করল। কালো চামড়ায় মোড়া বইটার কভারে সোনালী অক্ষরে 'ডিস্ট্রাকটর কোড' শব্দ দুটো লেখা। বইটা প্রফেসরের দিকে ছুঁড়ে দিল ও, আনাড়ীর মতন লুফে নিলেন তিনি। 'আপনি এর সাথে পরিচিত হয়ে নিন, প্রফেসর। মিসাইল ফায়ার না করে বোধহয় উপায় নেই।'

অনতিদূরে মানস আর কিশোর পাশাপাশি বসা, দুটো চেয়ারের সঙ্গে কষে হাত-পা বাঁধা। পেছনে রোবটটা দাঁড়ানো। বন্দীরা পরস্পরের কাছে নিজেদের অ্যাডভেঞ্চারের বয়ান করে একেবারে ঝিম মেরে গেছে এ মুহূর্তে।

যে ছোট্ট স্টোররুমে আটকা ওরা, ওটায় সারকে সার শেলফ–যাবতীয় টিনজাত খাবারে ঠাসা। সেদিকে ভ্রূ দেখাল মানস। 'অন্তত না খেয়ে মরব না।'

'শয়তানগুলো সব ব্যবস্থাই করে রেখেছে,' বলল কিশোর। 'আচ্ছা, মানস চাচা, এরা আমাদের নিয়ে কি মতলব ফেঁদেছে?'

শ্রাগ করল মানস। 'জিম্মি করেছে। যদিও তাতে ওদের বড় একটা লাভ হবে না।'

'মানে?'

'আমাদের ইউয করে স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করবে হয়তো। কিন্তু মেজর শুনবেন না। শোনা উচিতও নয়।'

'তা ঠিক,' ধীরে বলল কিশোর।

গলা উঁচিয়ে, কাঁধের ওপর দিয়ে পেছনে চাইল মানস। পাথরের মূর্তির মতন ঠায় দাঁড়িয়ে রোবটটা। বাঁধন খুলতে কসরৎ করতে লাগল মানস, প্রথমে মৃদুভাবে, তারপর প্রাণপণে। ওর দেখাদেখি কিশোরও।

হঠাৎ একটা মস্ত ধাতব হাত চাপ দিল মানসের কাঁধে। একটি ভরাট কণ্ঠ বলল, 'নড়াচড়া করবেন না। পালানোর চেষ্টা করলে আমার হাতে মরবেন।'

কাঠ হয়ে বসে রইল দু'জনে।

বাঙ্কারের বাইরে, অটোমেটেড মেশিনগান নেস্ট অকেজো করার কাজ প্রায়

সম্পন্ন। কাজটা সময়সাপেক্ষ আর বিপজ্জনক। প্রথমে একজন সৈন্যকে যেতে হবে দরজার যদ্দূর প্রয়োজন কাছাকাছি, যাতে বাঙ্কারের সেন্সর ডিভাইস ওর বডি হীট গ্রহণ করে মেশিনগানগুলো চালু করে। এতেই কি শেষ? চোখের পলকে লাফিয়ে পেছনে সরে জান বাঁচাতে হবে। ইতোমধ্যে দু'জন সৈন্য ঘায়েল হয়ে গেছে। অন্যান্যরা বাজুকা আর গ্রেনেড সহ, মেশিনগান পোর্টের ওপেনিঙের জন্যে অপেক্ষমাণ। ও দুটোকে বিকল করতে হলে প্রোটেকটিভ পোর্টস বন্ধ হওয়ার আগেই আঘাত হানতে হবে। হিরু চাচা লক্ষ করে বুঝেছে, বিস্ফোরকের বৃষ্টি সত্ত্বেও বিল্ডিংটার গায়ে একটা আঁচড়ও পড়েনি। সাধারণ কংক্রিটের যে তৈরি নয় বলে দিতে হয় না।

মেশিনগানগুলো একে একে নিশ্চুপ হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত, কেবলমাত্র একটা বন্দুক থেকে গুলি আসতে লাগল। ওটা এমনই বিদঘুটে কায়দায় বসানো যে হায়দার আর তার সঙ্গীরা হাজার গোলা ছুঁড়েও কোন ক্ষতি করতে পারল না।

হিরু চাচা গাড়িতে বসে যুদ্ধ পর্যবেক্ষণ করছে, গোলাগুলির বাড়াবাড়ি হলে মাঝেমধ্যে কানে আঙুল দিচ্ছে।

মেজর রেডিওতে যোগাযোগ করেছেন ক্যান্টনমেন্টের সঙ্গে, আরও সৈন্য চেয়ে পাঠিয়েছেন; ঢাকার খবরও জেনে নিয়েছেন।

মেজর নামিয়ে রাখলেন রেডিও। 'যা ভেবেছিলাম তাই। এক ঝাড় অন্যায্য দাবিদাওয়া পেশ করেছে আবিষ্কার গ্রুপ। ওগুলো মেনে নেয়ার অর্থ এদের হাতে দেশ তুলে দেয়া। মন্ত্রীসভা একমত। নো সারেণ্ডার, নো কম্প্রোমাইজ। এদের ধুলোয় মিশিয়ে দিতে হবে। যে কোন সাহায্য চাইলেই পাব। আমি এরমধ্যেই ট্যাঙ্ক আর জেট প্লেনের অর্ডার–'

'দোস্ত,' বাধা দিয়ে বলল হিরু চাচা। 'সরকারের সাহায্য করার কিছু নেই। অ্যাটমিক বোমার বিরুদ্ধে কি করবে? তাছাড়া, খচ্চরগুলো যদি এশিয়ায় মিসাইল ছুঁড়তে শুরু করে, পারবে ঠেকাতে সরকার?'

'যতটুকু সম্ভব সবই করছে তারা। কিন্তু তা তো যথেষ্ট নয় এখন পর্যন্ত ওদের পাওয়ার কাট অফ করতে পারিনি। ওদের নিজস্ব নিউক্লিয়ার জেনারেটর আছে বাঙ্কারে!'

'মিসাইল সিস্টেমের নিশ্চয় ফেইল-সেফ মেকানিজম আছে?'

গোমড়া মুখে মাথা ঝাঁকালেন মেজর। 'চালু করা হয়েছে। খুব জটিল জিনিস। সময় নেয়। আবিষ্কার গ্রুপ যদি ভাঁওতা না দিয়ে থাকে, তবে মাত্র দশ মিনিটের মধ্যেই ওরা বেশিরভাগ মিসাইল ফায়ার করতে পারবে। ফেইল-সেফ কোন কাজেই আসবে না।'

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল হিরু চাচা। 'তবে কি ঘটছে, সরকার সেটা দুনিয়াকে জানাতে তো পারবে অন্তত। বলতে পারবে মিসাইল পড়ার অর্থ যুদ্ধ নয়, একদল ক্রিমিনালের দুষ্কর্ম।'

'সে তো জানানোই হয়েছে। কিন্তু বিশ্বাস না করলে? চীন বা রাশিয়ায় যদি একটা মিসাইল পড়ে–বা ভারত-পাকিস্তানে...' শিউরে উঠলেন মেজর। 'পাল্টা আঘাত হানবে ওরা!'

সীটে হেলান দিয়ে বসল হিরু চাচা। ক্লান্ত। 'মানুষ যদি খামোকা এই ভয়ঙ্কর অস্ত্রগুলো তৈরি না করত...'

'ওসব বলে লাভ কি...' কাটখোট্টা কণ্ঠে বলে উঠলেন মেজর। 'সময় কম–আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে ভেতরে ঢুকে কাউন্টডাউন ঠেকানো।'

শেষ মেশিনগানটা থেমে গেল, হায়দার দৌড়ে এসে স্যালুট ঠুকল। 'পেরেছি, স্যার। আমি গ্রেনেড দিয়ে ডিরেক্ট হিট করেছি!'

'গুড। রাইট মেন, ফরওয়ার্ড!' মেজর এগোতে যেতেই, লম্বা হাত বাড়িয়ে তাঁর কাঁধে টোকা দিল হিরু চাচা। 'এক সেকেণ্ড!'

সনিক স্ক্রু ড্রাইভারটা বের করল হিরু চাচা। কিছু অ্যাডজাস্টমেন্ট করে, সাবধানে কংক্রিটের রাস্তায় পা বাড়াল, যন্ত্রটা এদিক ওদিক নাড়ছে। মেশিনগানগুলো যেখান থেকে গুলিবর্ষণ শুরু করেছিল, সেখানে হাজির হলো সে। নৈঃশব্দ্য। মেজর আত্মতুষ্টির মুচকি হাসি হাসলেন। হিরু চাচা আগে বাড়ছে, তখনও নাড়ছে সনিক স্ক্রু ড্রাইভার। হঠাৎ, তার দু'পা সামনের রাস্তা বিস্ফোরিত হলো। মাটি থেকে উত্তাল স্রোতের মত বেরিয়ে আসছে ধোঁয়া আর অগ্নিশিখা। কালচে মুখ আর ছ্যাঁকা খাওয়া ভ্রূ নিয়ে এগিয়ে চলেছে হিরু চাচা। তার সামনে আর চারধারে স্ক্রু ড্রাইভার ঘুরানোয় একটার পর একটা মাইন ফাটতে আরম্ভ করল। যখন থামল সে, তখন বাতাস ধোঁয়ায় পরিপূর্ণ, মাটি পুড়ে যুদ্ধক্ষেত্রের দশা–দেখে মনে হচ্ছে দিনের পর দিন শেলিং হয়েছে এখানে। আকর্ণ হাসল হিরু চাচা। কালো মুখে ঝকঝক করছে সাদা দাঁত। হাতছানি দিয়ে মেজর আর তাঁর লোকদের

ডাকল।

তাঁরা সন্তর্পণে যোগ দিলেন হিরু চাচার সঙ্গে, সে প্রকাণ্ড আকৃতির ধাতব দরজাটা দেখছে। 'তোর লাস্ট বাধা, দোস্ত।'

মেজর কঠোর চোখে একটুক্ষণ চেয়ে রইলেন ওটার দিকে। 'যেমন কংক্রিট তেমন স্টীল। তবু চেষ্টা করে দেখি! হায়দার, বোমা, প্লীজ!'

কপাল কুঁচকে গেল হিরু চাচার। 'বোমাবাজি অনেক তো হলো! একটু দাঁড়া।' কিসব জাটিল অ্যাডজাস্টমেন্ট করে নিল সে, সনিক স্ক্রু ড্রাইভারে।

মেজর অধৈর্য চোখে চেয়ে। 'যা করার তাড়াতাড়ি। সময় নেই। ওটা দিয়ে কি করবি, তালা খুলবি নাকি?'

'তারচেয়েও বেড়ে জিনিস হবে। তালাটা কেটে দেব।'

স্ক্রু ড্রাইভারের শেষ মাথা লালচে হয়ে উঠছে, হিরু চাচা তালাটাকে কেন্দ্র করে ঘুরাতে লাগল যন্ত্রটা। 'সনিক লেন্সের কাজ দিচ্ছে,' খুশির গলায় বলল।

'অযথা সময় নষ্ট,' বললেন মেজর। 'থারমিক লেন্সেও কাজ হলো না আর...' চুপ মেরে গেলেন, মুখ হাঁ, বিস্ময়ে। একটি গনগনে লাল চক্র দেখা দিয়েছে দরজায়, আর মাখনের মত গলে যাচ্ছে ইস্পাত!

'দু'এক মিনিট লাগলেও,' হালকা চালে বলল হিরু চাচা, 'কাজটা চুপচাপ সেরে নেয়া যায়!'

বাঙ্কারের ভেতরে, ষড়যন্ত্রকারীদের ছোট্ট দলটি কন্ট্রোলরুমে গাদাগাদি করে রয়েছে। সাবের কন্ট্রোল প্যানেলের ডায়াল পরীক্ষা করছে 'মেশিনগানগুলো বাতিল, মাইনগুলো অকেজো। আমাদের এত গর্বের ডিফেন্স সিস্টেমের এই হাল?'

'দরজাটা এখনও বাকি,' আস্থার সুর ফুটল তসলিমার কণ্ঠে। 'পৃথিবীর সবচেয়ে টাফ অ্যালয় দিয়ে তৈরি। কোনমতেই ওটাকে–'

প্রফেসর চৌধুরীর ভয়ার্ত চিৎকার বাধা দিল ওকে। 'ওরা কেটে ফেলেছে। ওই যে, পাশা সাহেব! আপনার সাধের দরজা পনিরের মতন করে কাটছে!'

মনিটর স্ক্রীনের দিকে অন্যদের মনোযোগ আকর্ষণ করলেন হিরু চাচাকে দেখা যাচ্ছে খোশমেজাজে কাজ চালিয়ে যেতে। লাল চক্রটা প্রায় হয়ে এসেছে।

তসলিমা কম্পিউটার টার্মিনালের দিকে ঠেলে দিল প্রফেসরকে। 'ডিস্ট্রাকটর কোড ইউয করুন। ওদের বুঝাতে হবে আমরা ধাপ্পা দিচ্ছি না।'

'কাজটা অত সোজা নয়,' বিক্ষিপ্তচিত্তে বললেন বিজ্ঞানী। 'ওরা যদি এখন ঢুকেই পড়ে তবে প্রি-কাউন্টডাউন সিকোয়েন্স চালু করেও লাভ নেই...'

তসলিমা তাঁকে চেপে বসিয়ে দিল চেয়ারে। 'সিকোয়েন্স চালু করুন, প্রফেসর। রোবটটাকে কাজে লাগিয়ে একটু সময় আদায় করে নেব।'

ঘুরে লম্বা পদক্ষেপে ঘর থেকে চলে গেল ও, অনুসরণ করল সাবের। প্রফেসর এখন একলা, বসে বসে কম্পিউটার কি বোর্ডটা দেখছেন। আস্তে করে কালো চামড়ার বইটা খুললেন, পাঞ্চ করতে লাগলেন কন্ট্রোল।

বাঙ্কারের বাইরে দরজার মধ্য দিয়ে আসা আচমকা কম্পন অনুভব করল হিরু চাচা। 'সবাই পিছান,' সিধে হয়ে বলল সে। 'কিছু একটা হচ্ছে।'

পিছানোর সময় ধাতব দরজার ঠিক মধ্যখানে একটা সূক্ষ্ম লাইন ফুটতে দেখল ওরা। ধীরে ধীরে বিস্তৃত হয়ে ফাটলে পরিণত হলো। 'স্যার,' বলল হায়দার। 'ওরা ওপেন করছে।'

ধীরে, খুবই ধীরে, বড় হয়ে যাচ্ছে ফোকর। মেজর আশান্বিত হয়ে বললেন, 'বোধহয় হুঁশ হয়েছে, সারেণ্ডার করবে।'

হিরু চাচা আশাবাদী হতে পারল না। 'সন্দেহ হচ্ছে। আমরা বরং আরও পিছিয়ে যাই। আগে বোঝা দরকার ঘটনাটা কি।'

মেজরবাহিনী রাস্তাটার প্রায় গোড়ায় চলে এল। হড়াক করে খুলে গেছে দরজা। নিকষ অন্ধকার ছাড়া চোখে পড়ছে না কিছু।

একটা ধাতব দৈত্য পা রাখল বাইরে। এক হাতে আজব দেখতে একটা অস্ত্র–ডিসিনটিগ্রেটর গান। ওটা ঘুরিয়েই বিদ্যুৎগতিতে ফায়ার করল যন্ত্রমানব। সবচেয়ে কাছের সৈন্যটার শরীর টকটকে লাল হয়ে গেল, তারপর প্রচণ্ড তাপের ঝলকে ভস্মীভূত। চিৎকার করে উঠল হিরু চাচা, 'তোর লোকদের সরিয়ে নে। নইলে সব মরবে।'

'পিছাও সবাই,' গর্জন ছাড়লেন মেজর।

সৈন্যরা গাছ-গাছালির আড়ালে আশ্রয়ের জন্যে ছোটার সময় শুনতে

পেল একটি থমথমে কণ্ঠ বলছে, 'আপনারা মানুষের শত্রু। দূর হয়ে যান! না হলে সবাইকে ধ্বংস করে দেব!'

বাঙ্কারের দরজা আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে গেল। সামনে, ডিসিনটিগ্রেটর গান হাতে রোবটটা তৈরি, অপেক্ষারত। কাছে ঘেঁষতে দেবে না শত্রুদের।

দশ

গাছের আড়াল থেকে রোবটটাকে দেখছে হিরু চাচা আর মেজর। হতাশায় নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরে আছে হিরু চাচা। 'প্রায় হয়ে গিয়েছিল! আর মিনিট দুয়েক...'

হঠাৎ একটা মড়মড়, ঝনঝন শব্দ এল ওদের পেছন দিক থেকে। চরকির মত ঘুরে চাইলেন মেজর, উজ্জ্বল দেখাচ্ছে মুখ। 'ভাবিস না, দোস্ত। ওটাকে শায়েস্তা করার ব্যবস্থা করছি।'

হিরু চাচা একটা ট্যাঙ্ককে হেলেদুলে এগিয়ে আসতে দেখল। ওটার দিকে দৌড়ে গেলেন মেজর, হতভম্ব ট্যাঙ্ক কমাণ্ডারকে কি যেন বললেন, আঙুল দিয়ে রোবটটাকে দেখালেন।

আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে মাথা ঝাঁকাল কমাণ্ডার। পোড়া মাটির ওপর দিয়ে বাঙ্কারের দরজার দিকে ঢিমে তালে গড়িয়ে চলেছে ট্যাঙ্ক। রোবটটার কাছ থেকে প্রায় পঞ্চাশ ফুট দূরে থেমে গেল। যন্ত্রদানব দুটো দীর্ঘ একটি মুহূর্ত পরস্পরকে মেপে নিল। ট্যাঙ্কের মেইন টারিটের পেল্লায় মারণাস্ত্রটি ঘুরে গিয়ে কভার করেছে রোবটটাকে। ওদিকে, ডিসিনটিগ্রেটর গান তাক করল যন্ত্রমানব।

একই সঙ্গে ফায়ার করল দুটোই। ট্যাঙ্কটা লাল হয়ে গিয়ে বিস্ফোরিত হলো।

বাঙ্কারের ভেতরে বসে, তসলিমা মনিটর স্ক্রীনে দেখল ঘটনাটা। হাসি ফুটল ঠোঁটের কোণে। মানুষ মরল বলে বিন্দুমাত্র পরিতাপ নেই। প্রফেসরের দিকে ফিরে চাইল, আতঙ্কিত চোখে স্ক্রীনের দৃশ্য দেখেছেন ভদ্রলোক। 'খুবই খুশির কথা। তা, প্রফেসর, আপনার কদ্দূর?'

কম্পিউটার টার্মিনালে দৃষ্টি ফেরালেন প্রফেসর। 'প্রিলিমিন্যারী লিঙ্কআপগুলো কমপ্লিট।'

'এক্সিলেন্ট! এবার কাউন্টডাউন শুরু করুন!'

ভীত দেখাচ্ছে বিজ্ঞানীকে। 'ডিস্ট্রাকটর কোড ইউয করতে বলছেন?'

'এছাড়া আর কোন উপায় রেখেছে ওরা?'

'কিন্তু এ কী করে সম্ভব! নিউক্লিয়ার ওয়ার শুরু হয়ে যাবে যে।'

ভ্রূ তুলল তসলিমা। 'সুন্দর একটা পৃথিবী চান না আপনি? বিনা আত্মত্যাগে কোন মহৎ কাজ হয়েছে কোনদিন?' কঠিন হলো ওর কণ্ঠ। 'কাউন্টডাউন চালু করুন, প্রফেসর।'

চরম অনিচ্ছাসত্ত্বেও একবার কন্ট্রোল চাপলেন তিনি। তাঁর মাথার ওপরকার ডিজিটাল ঘড়িটিতে টিকটিক শব্দে প্রাণের সাড়া জাগল। নম্বর কমে আসছে। ৫৯৯, ৫৯৮, ৫৯৭...ভয়ঙ্কর গতিতে স্ক্রীনে কেঁপে কেঁপে যাচ্ছে সংখ্যা।

আতঙ্কগ্রস্ত প্রফেসর এই প্রথম উপলব্ধি করলেন, এক একটি সেকেণ্ড কত ক্ষণস্থায়ী...৫৯০, ৫৮৯, ৫৮৮। অবিরাম নম্বর উঠছে স্ক্রীনে, এই অপরূপ সুন্দর পৃথিবীর আয়ু কমে যাচ্ছে প্রতি সেকেণ্ডে...

*

রোবটের তদারকির হাত থেকে বেঁচে, বাঁধন খুলতে তৎপর হয়ে উঠেছে মানস আর কিশোর। চেয়ার দুটো বহুকষ্টে পিঠাপিঠি করেছে ওরা, ফলে কিশোরের আঙুল মানসের কব্জির গিঁট স্পর্শ করতে পারছে। 'কষ্ট হচ্ছে না তো?'

আঙুল অসাড় ঠেকলেও জানাল না কিশোর। 'খুলছে,' বলল, 'মনে হচ্ছে খুলছে।'

পায়ের আওয়াজ পেল ওরা, তারপর তসলিমার গলা। 'সাপ্লাইয়ের একটা ফুল চেক করা দরকার। কদ্দিন টিকতে পারব জানা থাকা উচিত।'

চেয়ার দুটো দ্রুত পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিল ওরা। একটু পরেই সাবের আর তসলিমাকে দেখা গেল দরজায়।

'এদের কি করবেন?' জানতে চাইল সাবের।

'এদের জিম্মি রেখে লাভ নেই,' শীতল গলায় বলল তসলিমা। 'অযথা হাঁড়ি হাঁড়ি গেলাতে যাব কেন? খতম করে দেব।'

সাবের আগ্রহের সঙ্গে এক পা আগে বাড়ল। নব্যলব্ধ ক্ষমতা ওকে অন্ধ করে দিয়েছে। 'এখনই?' জিজ্ঞেস করল।

'পরে। স্টোরেজ বে আগে চেক করব, তারপর,' সাবেরকে নিয়ে চলে গেল তসলিমা।

'এযাত্রা অল্পের জন্যে বাঁচলাম,' বিড়বিড় করল মানস। 'ছোটার চেষ্টা করা উচিত।'

শরীর মুচড়ে মুচড়ে চেয়ার দুটো আবারও পিঠাপিঠি করে নিল ওরা। নবোদ্যমে মানসের বাঁধন খুলতে ব্যস্ত হলো কিশোর। শেষ পর্যন্ত একটা ফাঁস আলগা হয়ে গেল। মানস বলল, 'ঠিক আছে, এক মিনিট।' হাত দুটোকে কাছাকাছি এনে সর্বশক্তিতে ঝটকা মারল সে। কব্জিতে দড়ি কেটে বসে যাওয়ার যন্ত্রণা উপেক্ষা করে ছুটিয়ে ফেলল একটা হাত, রক্তে পিচ্ছিল হয়ে গেছে কব্জি। হাসি মুখে অন্য কব্জি মুক্ত করতে লেগে গেল ও।

বাইরে, মেজর যুদ্ধ সংক্রান্ত আলোচনা চালাচ্ছেন। রোবটটার দিকে মাথা ঝাঁকালেন, তখনও নিঃসঙ্গ পাহারা দিয়ে যাচ্ছে ওটা। 'দোস্ত, ডিসিনটিগ্রেটর গানের রেঞ্জ আর পাওয়ার কেমন রে?'

'পাওয়ার–কমবেশি আনলিমিটেড। রেঞ্জ–ধর, চাঁদের মাটিতে গর্ত করে দিতে পারবে।'

'বুঝেছি,' নিরাশায় ডুবে গেলেন মেজর। 'আমরা কিছু দিয়েই কুলাতে পারব না।'

'হ্যাঁ।' দাঁড়িয়ে পড়ল হিরু চাচা। 'রোবটটার ওপর সর্বশক্তিতে হামলা চালানোর ব্যবস্থা কর। ক্ষতি কিছুই করা যাবে না, হয়তো বড়জোর দরজার সামনে থেকে সরানো যেতে পারে। আমি ওটার পেছন ঘুরে গিয়ে কাটার কাজটা সেরে ফেলার চেষ্টা করব।'

ধীরে সুস্থে উঠে দাঁড়ালেন মেজর। বুদ্ধিটা আত্মঘাতী। সৈন্যরা কতক্ষণই বা সরিয়ে রাখতে পারবে ধেড়ে রোবটটাকে? আর সেটুকু সময়ের মধ্যে হিরু কীই বা করতে পারবে? বরঞ্চ তাঁদের সদলবলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। হিরু চাচাও ঝুঁকি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত।

'আমাদের আর কি করার আছে?' মোলায়েম স্বরে বলল সে। 'চেষ্টা করা ছাড়া?'

সায় জানালেন মেজর। 'হ্যাঁ, চেষ্টাই করব।' দ্রুত পিঠ ফিরিয়ে সৈন্যদের পরামর্শ দিতে লাগলেন।

হিরু চাচা রোবটটাকে দু'মুহূর্ত দেখে নিল। কিশোর কেমন আছে কে জানে! দীর্ঘশ্বাস পড়ল। এবার বোধহয় আর মৃত্যু এড়ানো গেল না!

সংগঠিত হতে শুরু করেছে মেজরের লোকেরা। হিরু চাচা তার সনিক স্ক্রু ড্রাইভারটা বের করে শেষবারের মত চেক করল। ৩০০, ২৯৯, ২৯৮··· পাঁচ মিনিটেরও কম বাকি। বাঙ্কারে প্রফেসর চৌধুরীর হঠাৎ করেই মনে হলো, এভাবে কাউন্টডাউন চলতে দেয়া যায় না। হিরু চাচার কথাগুলো কানে বাজছে এখনও। 'এর ফল কখনোই ভাল হবে না।' তাঁর উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন, লাখ লাখ মানুষের মৃত্যুর জন্যে তিনিই দায়ী হবেন। 'না,' ফুঁপিয়ে উঠলেন তিনি, 'আর না।' কি বোর্ডে গুঁতো দিলেন···২৮৯, ২৮৮– নম্বর কমা বন্ধ হয়ে গেল।

পেছন থেকে একটা কণ্ঠস্বর বলল, 'কাউন্টডাউন বন্ধ হলো কেন?'

কন্ট্রোলরুমের দরজায় সাবের। প্রথম মিসাইলটার নিক্ষেপ মুহূর্ত অবলোকন করতে জুটে গেছে। পৌরুষের সঙ্গে ওর মুখোমুখি হলেন প্রফেসর। 'বন্ধ হয়েছে, কারণ আমি আর ওটা চালু রাখছি না।'

সাবেরের হাতে রিভলভার এসে গেল। 'ভাল চাইলে কাউন্টডাউন শুরু করুন। নইলে মারা পড়বেন। আর কাউন্টডাউনও বন্ধ থাকবে না।' রিভলভার তুলল। প্রফেসর উপলব্ধি করলেন, লোকটা ভারসাম্যহীন। নিজের হুমকি ফলাতে পারলে এর খুশির সীমা থাকবে না। প্রফেসরের সাহস উবে গেল, ফের কি বোর্ডে ফিরলেন। ২৮৭, ২৮৬, ২৮৫···আবারও শুরু হলো কাউন্টডাউনের অনুতাপপূর্ণ অগ্রগতি। মৃদু হাসল সাবের। আর মাত্র সাড়ে চার মিনিট এবং তারপর–

কেউ কাঁধে টোকা দিল ওর। পাঁই করে ঘুরতেই গায়ের কাছে মানস আর কিশোরকে দেখতে পেল। রিভলভার তুলতেই, একটা দু'মণী ঘুসি বোমা ফাটাল ওর বাঁ চোয়ালের ঠিক নিচে। মানসের আপারকাটে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল ও। অজ্ঞান।

সন্তুষ্টির সঙ্গে আঙুলের গাঁট ঘষে নিল মানস।

কিশোর প্রফেসর চৌধুরীর কাঁধ ধরে ঝাঁকাচ্ছে। হতবুদ্ধি দেখাচ্ছে বিজ্ঞানীকে। 'প্রফেসর,' জরুরী গলায় বলল ও, 'আপনি কি কাউন্টডাউনটা

উল্টে দিতে পারেন?'

ঘোলা দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকালেন তিনি। 'কমপ্লিটলি অফ করতে অনেক সময় লেগে যাবে। তবে "হোল্ড" সিগন্যাল পাঞ্চ করতে পারি। করেওছিলাম একটু আগে, কিন্তু ওই সাবের...'

'ওর চিন্তা করবেন না,' অধৈর্য কণ্ঠে বলল কিশোর। 'থামান আপনি।'

'তারপর মেইন দরজা খুলে দেবেন, বলল মানস। 'আমরা বেরিয়ে যাব।'

প্রফেসরের ইচ্ছাশক্তি যেন কাজ করছে না। যা বলা হচ্ছে তাই করছেন। ২৫৬, ২৫৫,২৫৪–। কাউন্টডাউন আবার বন্ধ। প্রফেসর মেইন দরজা খুলে দিতে কন্ট্রোল চালু করলেন...

'গুড,' বলল মানস। 'এসো।' বিজ্ঞানীকে দু'জন মিলে প্রায় টেনে নিয়ে কন্ট্রোলরুমের বাইরে ছুটে বেরোল ওরা।

মেজর সদলবলে রোবটটার অনেকখানি কাছাকাছি চলে এসেছেন। লম্বা শ্বাস নিলেন তিনি। আক্রমণের নির্দেশ দিতে যাবেন এসময় তাঁর কাঁধে চাপ দিল হিরু চাচা। 'ওই দেখ, দরজা আবার খুলে যাচ্ছে।' ক্রমবর্ধমান ফাঁকের মধ্য দিয়ে মানসকে উঁকি মারতে দেখতে পেল। কিশোর আর প্রফেসর চৌধুরী তার পেছনেই।

রোবটটার পিঠের দিকে চেয়ে রয়েছে মানসরা। নিঃশব্দে খুলে যাচ্ছে দরজা, যন্ত্রমানব ওদের অস্তিত্ব এখনও টের পায়নি। পর্যাপ্ত জায়গা বেরোলে সবার আগে মানস শরীর গলিয়ে দিল, তারপর কিশোর। প্রফেসর অনড়, যেন নিশ্চিত নন পালাবেন কিনা। ভদ্রলোক ফলো করছেন না বুঝতে পেরে পেছন ফিরল কিশোর। 'চলে আসুন, প্রফেসর,' বলল ফিসফিসিয়ে রোবটটা কিন্তু ঠিকই শুনে ফেলেছে। মুহূর্তের মধ্যে ঘুরে দাঁড়িয়ে ডিসিনটিগ্রেটর গান তাক করল।

রোবটটা রাইফেল সই করতেই কিশোরকে এক ধাক্কায় মাটিতে ফেলে দিল মানস। প্রফেসর চৌধুরীর ওপর যেন অকস্মাৎ সাহস ভর করল, তীরের মত ছুটে বেরিয়ে এসে নিজেকে ছুঁড়ে দিলেন অস্ত্রের সামনে রোবটটা ইতোমধ্যে ফায়ার করেছে। মূর্তির মতন জমে গেলেন প্রফেসর, তারপর লাল আভার বিস্ফোরণ অদৃশ্য করে দিল তাঁকে।

কিশোর আর মানস কাঠ হয়ে গেছে, নিজেকে পরবর্তী টার্গেট আশঙ্কা করছে। মেজরবাহিনী অনেকটা দূরে, সাহায্য করতে পারবে না।

রোবটটা ওদের ব্যাপারে মোটেই উদ্বিগ্ন নয়। উদ্‌ভ্রান্তের মত মাথা চক্কর দিচ্ছে ওটার। অস্ত্র পায়ের কাছে মাটিতে খসে পড়ল, বেমালুম ভুলেই গেছে ওটার কথা। গমগমে কণ্ঠটি যন্ত্রণা ফুটিয়ে বলল, 'আমি আমার স্রষ্টাকে খুন করে ফেলেছি!' হঠাৎ হাঁটু মুড়ে পড়ে গেল ওটা, ভারী দেহটা নিথর শুয়ে রইল মাটিতে।

'আয়, দোস্ত, এই সুযোগ!' মেজরকে বলল হিরু চাচা। খোলা দরজার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা কিশোর আর মানসের দিকে প্রাণপণে ছুটল ওরা।

খাদ্যগুদাম পরিদর্শন করে কন্ট্রোলরুমে প্রবেশ করল তসলিমা। দেখতে পেল, তার ক্ষমতা দখলের দীর্ঘ প্রতীক্ষিত প্ল্যান বাতাসে মিলিয়ে গেছে। এক ঝলকে সর্বনাশা দৃশ্য দেখে নিল ও: সাবের অচেতন হয়ে মেঝেতে পড়ে, কাউন্টডাউন অচল, মনিটর স্ক্রীনে দেখা যাচ্ছে সেনাবাহিনী রোবটটার নিঃসাড় দেহকে পাশ কাটিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে বাঙ্কারে ঢুকে পড়ছে।

না ভেবেই কাজ করল তসলিমা। বিজয় যদি না-ই পায়, অন্তত প্রতিশোধ নিয়ে ছাড়বে। দুনিয়া শাসন করতে যদি না-ই পারে, আগুন লাগিয়ে ছারখার করে দেবে। কি বোর্ডে বসে কন্ট্রোল পাঞ্চ শুরু করল ও। কন্ট্রোলরুমের বাইরে গোলাগুলির শব্দ হচ্ছে। কি বোর্ডে দ্রুততর হলো ওর আঙুল। ডিজিটাল ঘড়ি প্রাণ ফিরে পেল। ২৫৩, ২৫২, ২৫১...তসলিমা নাসরীন চোখ সরু করে দেখছে, ঠোঁটে ক্রূর হাসি।

বাঙ্কারের বাঁকাচোরা করিডরে উদ্দীপ্ত বাধার সম্মুখীন হতে হলো মেজরবাহিনীকে। আবিষ্কারের ক'জন কর্মী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তাদেরকে ঠেকিয়ে রাখার শেষ চেষ্টা করছে। গুলির আওয়াজে বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে, কংক্রিটের দেয়াল থেকে ঠিকরে পড়ছে বুলেট।

যুদ্ধক্ষেত্রের ক'গজ তফাতে, দেয়ালের ওপাশে কিশোর, হিরু চাচা আর মানসের একটা ছোটখাট সুখকর পুনর্মিলনী হয়ে গেল। তিনজনে একই সঙ্গে কথা বলছে, পরস্পরকে বোঝাতে চাইছে আসলে কি ঘটছে।

সহসা গানফায়ার থেমে গেল, কোনার দিক থেকে উঁকি মারল হায়দারের মাথা। 'ওদের জারিজুরি খতম,' বলল। ধোঁয়াচ্ছন্ন করিডর ধরে কিশোর আর অন্যরা তার পেছন পেছন চলল। মেঝে রক্তাক্ত। আহতরা

কাতরাচ্ছে। সইতে পারল না কিশোর, চোখ ফিরিয়ে নিল।

কন্ট্রোলরুমে ঢুকে মেজরকে জমে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল ওরা।

তসলিমা কি বোর্ডে বসা, হাতে একটা খুদে অটোমেটিক।

আদেশ দিলেন মেজর, 'সরুন ওখান থেকে!' রিভলভার তুলেছেন। ভ্রূক্ষেপ করল না তসলিমা। 'জানি আপনি গুলি করবেন না,' আত্মবিশ্বাসী কণ্ঠে বলল।

কিশোর অনুধাবন করল মহিলার কথাই ঠিক। বিপজ্জনক এবং অস্ত্রধারী নারীকেও গুলি করতে পারবেন না মেজর–বিবেকে বাধবে। সাবেরের রিভলভার দৃষ্টি কেড়ে নিল কিশোরের, মালিকের প্রসারিত হাতের পাশেই পড়ে আছে। ওটা টপ করে তুলে নিল ও, টিপ করল তসলিমার দিকে। 'আজাদ চাচা হয়তো গুলি করবেন না,' বলল, 'কিন্তু আমি করব। এবার মানে মানে সরে পড়ুন।'

দু'মুহূর্ত পরস্পরকে জরিপ করল ওরা। শেষ পর্যন্ত চোখ নামিয়ে নিতে বাধ্য হলো তসলিমা। মেঝেতে অস্ত্র ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। 'বেশ। আমার কাজ তো শেষ। একটু পরেই মিসাইল ফায়ার হতে থাকবে।'

'ক্যানসেল করে দিন,' ফুঁসে উঠলেন মেজর।

ডিজিটাল ঘড়িটার দিকে আঙুল দেখাল তসলিমা নাসরীন। 'অনেক দেরি হয়ে গেছে। নম্বর শূন্যতে পৌঁছলেই মিসাইলগুলোর কাজ শুরু হয়ে যাবে। আর ক্যানসেল কোড পাঠাতে দশ মিনিটেরও বেশি লাগে!'

সবার চোখ ডিজিটাল ঘড়ির দিকে। ৫৯, ৫৮, ৫৭...আর পুরো এক মিনিটও নেই।

এগারো

মেজর শেষ পর্যন্ত আর মেজাজ ধরে রাখতে পারলেন না। তসলিমা নাসরীনকে ঘাড় ধরে ধাক্কা দিলেন সজোরে, হুমড়ি খেয়ে পড়ত মহিলা, কিন্তু ধরে ফেলল হায়দার। 'মেয়েলোকটাকে আমার চোখের সামনে থেকে দূর করে দিন। হাতকড়া পরিয়ে রাখুন। হিরু, তুই কি কোনভাবে এটাকে

বন্ধ…'

হিরু চাচা ইতোমধ্যে বসে পড়েছে কি বোর্ডে, কম্পিউটার কোডের কালো, মোটা বইটার পাতা উল্টে যাচ্ছে স্বাভাবিকভাবে। একপাশে ছুঁড়ে দিল বইটা।

শার্টের হাতা গুটিয়ে নিল হিরু চাচা। তার আঙুলগুলো দ্রুত খেলা করছে কি বোর্ডে। কাজের ফাঁকে বকবক করে যাচ্ছে সে, যেন কিছুই হয়নি। আসলে সবার মধ্যে প্রাণের সঞ্চার করতে চাইছে। কিশোরের চোখজোড়া হিরু চাচার গভীর মনোযোগী মুখ আর ডিজিটাল ঘড়ির দিকে বারবার আসা-যাওয়া করছে। ২৩, ২২, ২১…

'কম্পিউটার হচ্ছে গিয়ে তোর চাকর,' খোশমেজাজে বলল হিরু চাচা।

(ঘড়িতে উঠে গেছে ১৮, ১৭, ১৬…)

'যা বলবি চোখের পলকে করে দেবে…'

(১৫, ১৪, ১৩…)

'নিজের ধ্বংস চা তাও করবে!'

(১২, ১১, ১০…)

'কাজেই হঠাৎ করে মাইণ্ড চেঞ্জ করলে, মুশকিল হয়ে যায়…'

(৬, ৫, ৪…)

'কিন্তু মানুষের অসাধ্য কিছু নেই!' কথা শেষ করল হিরু চাচা, চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল।

ডিজিটাল কাউন্টারে ৩, ২ পর্যন্ত উঠে…থেমে গেল। টিক করে উঠল ঘড়ি, তারপর বোঁ বোঁ শব্দ–সংখ্যাগুলো ৬০০-তে এসে ফের অনড় হয়ে গেল।

ছোট্ট কন্ট্রোলরুমটিতে খুশির চিল্লাচিল্লি আরম্ভ হলো। এতক্ষণের রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনার পর ভাল করে দম নিয়ে নিল সবাই। মেজর, হায়দার, মানস ঘিরে ফেলল কম্পিউটার টারমিনালটাকে।

'দারুণ দেখালি, দোস্ত,' প্রশংসা ঝরে পড়ছে মেজরের কণ্ঠে। খুশিতে ডগমগ তিনি।

'আপনার সত্যিই তুলনা নেই,' চেঁচিয়ে উঠল হায়দার।

'থ্রি চিয়ার্স ফর হিরন পাশা,' চেঁচাল মানস। গলা মেলাল অন্যরা।

হিরু চাচার পিঠে প্রশংসাসূচক চাপড়ানি এত বেশি পড়ল যে বেচারার

প্রায় চেয়ার থেকে উল্টে পড়ার দশা। টানটান উত্তেজনায় তাঁর কোঁকড়া চুলগুলো দাঁড়িয়ে যাওয়ার জোগাড়, মুখের হাসি ঘরটাকে আলোকিত করে দিতে যথেষ্ট। কিশোরের ভীষণ গর্ব হচ্ছে হিরু চাচার জন্যে। কিন্তু বড্ড ক্লান্ত বোধ করছে বলে খানিকটা দূরে দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হিরু চাচা ওর দিকে চাইলে মুচকি হাসল। প্রচণ্ড শারীরিক ধকলের পর একটু একা থাকতে মন চাইছে। সবার অলক্ষে বেরিয়ে এল ঘরটা থেকে। করিডর দিয়ে হাঁটার সময় বন্দীশালা, অর্থাৎ সেই স্টোররুমটা পড়ল। কি ভেবে থেমে উঁকি দিল ভেতরে। একটু আগেই এখান থেকে মুক্তি পেয়েছে বিশ্বাসই হতে চায় না। চেয়ার দুটো, রশির ছেঁড়া টুকরো, যেমনকে তেমন পড়ে আছে।

কিন্তু নতুন একটা জিনিসও কোত্থেকে যেন হাজির হয়েছে। দেয়ালের একটা প্যানেল হড়কে খুলে গেল–বেরিয়ে এল রোবটটা! কিশোর চেঁচানোর জন্যে হাঁ করতেই একটা ধাতব হাত ওর ঘাড় ধরে ইঁদুরের মত শূন্যে তুলে নিল। আলতো কায়দায় ধরেছে বলে বিন্দুমাত্র ব্যথা অনুভব করছে না কিশোর। গুপ্ত প্যানেলে ওকে নিয়ে ঢুকে পড়ল যন্ত্রমানব। বন্ধ হয়ে গেল প্যানেল, স্টোররুম আগের মত জনশূন্য।

কিশোরের অনুপস্থিতি প্রথমটায় কেউ খেয়ালই করল না। বন্দিদের জিজ্ঞাসাবাদ করে রিপোর্ট লেখা হচ্ছে। মেজর আর তাঁর লোকেরা ও কাজে ব্যস্ত।

সত্যি কথা বলতে কি, কিশোর নয়, রোবটটার অন্তর্ধানে সাড়া পড়ে গেল। কেউ বলতে পারে না ওটা কোথায় অদৃশ্য হয়েছে। মেজরের ধারণা ছিল, কেউ না কেউ নিশ্চয় ওটার ভার নিয়েছে। কিন্তু আসলে ওটার কোন পাহারাদার পাওয়া যায়নি, বিকল হয়ে গেছে মনে করে সবাই যুদ্ধে ব্যস্ত ছিল। হিরু চাচা ওটাকে পরীক্ষা করতে চাইতে জানা গেল গায়েব হয়ে গেছে। মেজরের আবছাভাবে মনে পড়ল, কিশোরকে কন্ট্রোলরুম থেকে বেরিয়ে যেতে দেখেছেন। তখন গুরুত্ব দেননি। ভেবেছিলেন আশেপাশেই আছে। কিন্তু গোটা বিল্ডিং চষেও যখন পাওয়া গেল না তখন ঘাবড়ে গেল সবাই।

শেষ মুহূর্তের এই রহস্যময় জোড়া তিরোধানে চিন্তিত হয়ে পড়লেন

মেজর, এনকোয়্যারী বসালেন।

কিশোর আর রোবটটার উধাও রহস্য সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা হলো। হিরু চাচাই প্রথম বাতলাল যে দুটো ঘটনার মধ্যে যোগসূত্র থাকতে পারে।

'তুই শিয়োর?' নতুন ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ায় উৎকণ্ঠা বোধ করছেন মেজর।

'অনেকটা।'

মানস মাথা চুলকে নিল। 'কিন্তু ওটা কিশোরকে কিডন্যাপ করবে কেন?'

গম্ভীর দেখাচ্ছে হিরু চাচাকে। 'ভেবে দেখুন, ওটা প্রফেসর সালামকে খুন করেছে, স্রষ্টা বলে ছেড়ে দেয়নি। আসলে মাথার ঠিক নেই। ভয়ঙ্কর মানসিক আঘাত পেয়েছে!

মেশিনের মনের দুঃখ-কষ্ট উপলব্ধি করার চেষ্টায় গেলেন না মেজর। 'তা না হয় পেল, কিন্তু তবু...'

'মগজ খাটা। ওটা মানুষেরই মতন। দুঃখ পেলে মানুষ কার কাছে যায়? যে তার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করবে তার কাছেই তো। কিশোরের কাছে সমবেদনা পেয়েছিল ওটা।'

উঠে দাঁড়ালেন মেজর। 'হায়দার, এই বাঙ্কার থেকে শুরু করে বাইরের আনাচে কানাচে পর্যন্ত তল্লাশি চালাতে হবে। রোবটটার মনের অবস্থা যাই হোক না কেন, কিশোরের নিরাপত্তা আমাদের কাছে সবচেয়ে জরুরী। যেভাবে পারেন হাজির করুন ওটাকে।'

'কান টানলে যেমন মাথা আসে,' মনে করিয়ে দিল হিরু চাচা। 'তেমনি রোবটটাকে খুঁজে পেলে কিশোরকেও পাওয়া যাবে।'

গুপ্ত প্যানেলের পিছনদিকের ঘরটা রীতিমত বড় আর আরামপ্রদ। দেখে অবাকই হতে হয়। কিশোরের মনে হলো, বাঙ্কারে জীবন বিপন্ন হলে এখানে লুকানোর ব্যবস্থা করে রেখেছিল তসলিমারা। ঘরটায় দামী কার্পেট পাতা, সুসজ্জিত, খাদ্য-পানীয়ের মানও বাইরের স্টোররুমটার থেকে উন্নত। কিশোর অনুমানে বুঝল, বাঙ্কারে এনে রোবটটাকে প্রথমে এখানেই লুকিয়ে রাখা হয়েছিল, ফলে জায়গাটা মনে থেকে গিয়েছে ওটার।

সবই তো ভাল, ভাবল কিশোর, কিন্তু এখান থেকে জ্যান্ত বেরোবে কি করে? রোবটটা অনেক আগেই ছেড়ে দিয়েছে ওকে, ঘুরে ফিরে বেড়াতে পারছে ইচ্ছামত–শুধু এক্সিট প্যানেলের দিকে যাওয়া বারণ। খিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছিল বলে টিনের বিস্কুট খেয়ে নিয়েছে কয়েকটা, যদিও বর্তমান পরিস্থিতিতে সুস্বাদু খাবারও মুখে রোচেনি। একটু আগে, সৈন্যদেরকে স্টোররুম সার্চ করতে শুনেছে, কিন্তু গুপ্ত প্যানেলটা পায়নি ওরা, আর ওদেরকে ডাকতেও সাহসে কুলোয়নি কিশোরের। কিছুক্ষণ পরে অস্পষ্ট হয়ে গেছে শব্দ-টব্দ, বুঝতে অসুবিধা হয়নি অন্যখানে খোঁজাখুঁজি করছে ওরা।

রোবটটার দিকে ফিরে গলায় আত্মবিশ্বাসের সুর ফোটানোর চেষ্টা করল কিশোর। 'খুঁজে ওরা পাবেই।'

'পাবে না। আর পেলেও খুন করে ফেলব।'

'কি যা তা বলছ?' বলল কিশোর। 'আরও খুন করে তোমার কি লাভ? বারবার বলছি, অনেক হয়েছে, এবার ক্ষান্ত দাও। তুমি একা কি করতে পারবে?'

'চাইলে মানবজাতিকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারি।'

প্রফেসর সালামের ভবিষ্যদ্বাণী সত্যি হচ্ছে বুঝে আঁতকে উঠল কিশোর। দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও যন্ত্রণা ভোগের ফলে মন ভেঙে গেছে রোবটটার। বদ্ধ উন্মাদে পরিণত হয়েছে। লম্বা ধাতব হাতটা ওকে ছুঁতে আসতেই কুঁকড়ে গেল কিশোর। রোবটটা ওর কাঁধ স্পর্শ করল শুধু। 'ভয় পাবেন না। একা আপনি বেঁচে থাকবেন।'

হিরু চাচা, মেজর আজাদ আর মানসও বাইরে খানিকক্ষণ খোঁজাখুঁজি করেছে। কিন্তু ব্যর্থ হয়ে এ মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছে ল্যাণ্ডরোভারের কাছে। বিষণ্ন মুহূর্তগুলো কেটে যাচ্ছে নীরবে। হায়দারকে ওয়াকিটকি হাতে এগিয়ে আসতে দেখে আশার চোখে তাকাল তারা তিনজন।

দু'পাশে মাথা নাড়ল হায়দার। 'কোন হদিস পেলাম না, স্যার। কোথায় যে ঘাপটি মারল কে জানে।'

'একটা কথা কিন্তু ভাবিনি আমরা,' হঠাৎ মুখ খুলল হিরু চাচা। 'ধর, ওটাকে পাওয়া গেল–কি করব? আমি যুক্তিতর্ক দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করতে পারি বড়জোর, কিন্তু শুনবে যে তার নিশ্চয়তা কি?'

রিভলভারটায় আঙুল বুলিয়ে নিলেন মেজর। কথা বললেন না।

খুক করে একটু কাশল হায়দার। 'স্যার, প্রফেসর চৌধুরী বলেছিলেন রোবটটাকে তাঁর আবিষ্কৃত অ্যালয় দিয়ে বানিয়েছেন। জিনিসটা নাকি জ্যান্ত। বাড়ে বলে।'

কটমট করে তার দিকে চাইলেন মেজর। 'গল্পটা ভালই ফেঁদেছেন। যাকগে–'

হায়দার বেপরোয়ার মত বলে চলল, 'এক ধরনের ভাইরাসের কথাও বলেছিলেন। তাঁর জ্যান্ত মেটালকে অ্যাটাক করেছিল।'

হিরু চাচাকে আচমকা উৎসাহী মনে হলো। 'তাই নাকি?'

'জ্বী,' বলল হায়দার, 'এই রোবটটার মেটালে যদি সেই ভাইরাস হানা দেয়, তবে হয়তো...' হিরু চাচাকে গোল গোল চোখে চেয়ে থাকতে দেখে মিইয়ে গেল বেচারা। 'অবশ্য পুরোটাই হয়তোবা নিছক কল্পনা।'

'একটুও না,' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল হিরু চাচা। 'পুরোটাই বাস্তব। দোস্ত, একটা গাড়ি দরকার। এখুনি সালাম চৌধুরীর ল্যাবোরেটরীতে যেতে হবে...'

ল্যাণ্ডরোভারটা ইশারায় দেখালেন মেজর। 'ওটা নিয়ে যা। হায়দার, আসুন অমার সঙ্গে।'

তল্লাশকারীদের তাগাদা দিতে গটগট করে এগোলেন তিনি।

হিরু চাচা ড্রাইভিং সীটে উঠে বসে স্টার্ট দিল। লাফিয়ে পেছনে উঠে পড়ল মানস। এখানে বসে খানাতল্লাশি দেখার চেয়ে পাশা সাহেবের সঙ্গে যাওয়া অনেক ভাল। ক'মিনিট পরেই, ধড়ে প্রাণ ধরে রাখতে ব্যস্ত মানসের মনে হলো, সিদ্ধান্তটা বোধহয় ভুলই ছিল...

কাঁধের ওপর দিয়ে তাকাল হিরু চাচা। 'জীপ চালানোর মজাই আলাদা,' চেঁচিয়ে বলল, দু'চাকার ওপর ঘুরে মেইন রোডে উঠে এল ওরা।

মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি দিয়ে, ল্যাণ্ডরোভারে সেঁটে বসে থাকার চেষ্টায় মনোনিবেশ করল মানস।

গুপ্ত ঘরে রোবটটি যেন সহসাই সিদ্ধান্তে পৌঁছল। সুইচ টিপে প্যানেল খুলল, কিশোরকে হাতছানি দিয়ে ডাকল। বেরোতে বলছে। স্টোররুমে এখন ওরা। রোবটটার মুখের দিকে চোখ তুলে তাকাল কিশোর। 'এবার

কোথায়?'

'কন্ট্রোলরুমে।'

করিডর দিয়ে আগে আগে পা বাড়াল রোবট। বাঙ্কার জনমানবশূন্য। সমস্ত বন্দী আর আহতদের সরিয়ে নেয়া হয়েছে। তল্লাশিতে নিয়োজিত বেশিরভাগ সৈন্য। একজন গার্ড রয়েছে কেবল পাহারায়। কিশোর আর রোবটটা কোণ ঘুরে প্রায় ওর ঘাড়ের ওপর গিয়ে পড়ল। সভয়ে পিছিয়ে গেল ও, রাইফেল তুলেছে। ওকে ভর্তা বানাতে একটা হাত ওঠাল যন্ত্রমানব। 'না!' চিৎকার করে বলল কিশোর। 'ওর কোন ক্ষতি করবে না!' হাত তোলা অবস্থাতেই থমকে গেল রোবট। গার্ডটির সঙ্গে নিচু, জরুরী কণ্ঠে কথা বলল কিশোর। 'গুলি করবেন না। কেটে পড়ুন। এখুনি!'

প্রতিবাদ করতে মুখ খুলল গার্ড। কিন্তু সে কিছু বলার আগেই বলে চলল কিশোর, 'প্লীজ, যা বলছি করুন। আমাকে উদ্ধার করার চেষ্টা করবেন না। যান!' গার্ডটি কি আর করবে, সন্তর্পণে রোবটটার পাশ দিয়ে হেঁটে চলে গেল। যন্ত্রমানব হাত নামিয়ে কন্ট্রোলরুমের উদ্দেশে পা বাড়াল।

গার্ডটি উন্মুক্ত মেইন দরজার দিকে এগোচ্ছে। নিচু কম্পনের শব্দ কানে এল ওর। দরজা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে দেখে রক্ত পানি হয়ে গেল বেচারার। রোবটটার সঙ্গে আটকে পড়তে হবে ভাবতেই চোঁ চাঁ দৌড় দিল। কপাল ভাল, শেষ মুহূর্তে ফাঁক গলে বেরিয়ে যেতে পারল, পেছনে সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল দরজা। রিসার্চ সেন্টারের সারিবদ্ধ গাড়িগুলোর দিকে টলতে টলতে ছুটল ও...

রোবটটা ডোর কন্ট্রোল থেকে সরে কম্পিউটার টার্মিনালের কাছে গেল। মস্ত বড় আঙুলগুলো কোমল টোকা দিচ্ছে কিবোর্ডে। ডিজিটাল ঘড়ির কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গেল। ৬০০, ৫৯৯, ৫৯৮...

কিশোর আচমকা উপলব্ধি করল রোবটটার কুমতলব। 'না, না,' গর্জে উঠল। ওটাকে কি বোর্ড থেকে টেনে সরাতে খামোকাই চেষ্টা চালাল। উপরন্তু পাঁজরে একটা টোকা খেয়ে তিন হাত দূরে ছিটকে পড়ল। 'কেন? কেন?' চেঁচাল ও।

না ফিরেই বলল রোবট, 'আমি প্রফেসর সালাম চৌধুরীকে খুন করেছি। তাঁর প্ল্যান বাস্তবায়িত করা আমার দায়িত্ব।'

'কিন্তু প্রফেসর তাঁর মাইণ্ড চেঞ্জ করেছিলেন। তিনি নিশ্চয়ই চাইতেন না

তুমি মানুষের ক্ষতি করো।'

রোবটটা আস্তে করে ঘুরে ওর মুখোমুখি হলো। কপালের বাতিগুলো দপদপ করে জ্বলছে, ধাতব মুখটায় কষ্টের চিহ্ন–দৃষ্টি এড়াল না কিশোরের। তর্কাতর্কির তোয়াক্কা না করে অবিবেচক মানুষের মতন বলল রোবটটা, 'মানবজাতি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলে আমার মত আরও মেশিন বানিয়ে নেব। যন্ত্র কখনও মিথ্যে বলে না, ভুল শেখায় না। মানুষের বেঁচে থাকার কোন প্রয়োজন নেই।'

ডিজিটাল ঘড়িটা টিক টিক করে কাউন্টডাউন করে যাচ্ছে।

হিরু চাচা বনাম রোবটের লড়াইয়ের পর প্রফেসর চৌধুরীর ল্যাবোরেটরীতে কেউ হাত দেয়নি। এলোমেলো অবস্থায় তেমনি পড়ে আছে। দীর্ঘক্ষণ ধরে বিশৃঙ্খল ফাইলিং ক্যাবিনেটগুলো ঘেঁটে, শেষ পর্যন্ত 'মেটাল ভাইরাস' সংক্রান্ত ক'টা গোটানো নোট খুঁজে পেল হিরু চাচা। ভাইরাসটা তৈরিতে সচেষ্ট হলো সে, ফ্যালফ্যাল করে লক্ষ করছে মানস।

একটা চায়ের দাগ পড়া ছেঁড়াখোঁড়া কাগজ তুলে ধরে গভীর মনোযোগে পরীক্ষা করছে হিরু চাচা। 'ভাল কাগজে লিখে রাখলে কি ক্ষতিটা ছিল?' ক্ষোভের সঙ্গে বিড়বিড় করে বলল। ভ্রূ কুঁচকে চাইল মানসের দিকে, যেন ওরই দোষ।

ছোটমামার পাশে, বেঞ্চিতে রাখা ওয়াকিটকিটা কড়কড় করে উঠল হঠাৎ। 'হিরু, আছিস? আমি আজাদ। শুনতে পাচ্ছিস? ওভার।'

গবেষণায় মগ্ন হিরু চাচা অন্য মনে রেডিওটা ঠেলে দিল। পড়েই যেত বেঞ্চি থেকে, কিন্তু দক্ষ ফিল্ডারের মত ক্যাচ লুফে নিল মানস। সুইচ অন করে বলল, 'আমি মানস, স্যার। পাশা সাহেব কাজে একটু ব্যস্ত।'

'ওকে বলুন রোবটটাকে পাওয়া গেছে!'

মানস বলল, 'পাশা সাহেব, রোবটটাকে পাওয়া গেছে!'

এক পাত্রের আধেয় অন্য পাত্রে ঢেলে নাক দিয়ে একটা তাচ্ছিল্যের শব্দ করল হিরু চাচা।

জবাবটা উষ্ণতর হওয়া উচিত বুঝে মানস বলল, 'তবে তো, স্যার, কথাই নেই। এখন কোথায় ওটা?'

'বাঙ্কারে। কিশোরকে নিয়ে ঢুকে বসে আছে।'

হিরু চাচা এতটাই চমকে গেল যে হাত থেকে এক্সপিরিমেন্ট উড়ে যায় আরকি। মানসের হাত থেকে ওয়াকিটকি কেড়ে নিয়ে গর্জে উঠল, 'আজাদ, শোন, রোবটটা সালাম চৌধুরীর প্ল্যান ক্যারি আউট করার চেষ্টা করবে। বাঙ্কারের কম্পিউটার টার্মিনালটা কি এখনও অ্যাকটিভ?'

'মনে তো হচ্ছে। কারও তো বন্ধ করার কথা চিন্তা হয়নি।'

'ফেইল-সেফ সিস্টেমের কি অবস্থা? চালু নাকি?'

'যদ্দূর জানি চালু। বাঙ্কার অ্যাটাক করেই চালিয়ে দেয়া হয়েছিল।'

'শোন। পাওয়ার কনসার্নডদের সতর্ক করে দে। ফেইল-সেফ প্রসিডিওর যেন চালু থাকে। সে সঙ্গে আরও স্পিড বাড়াতে বল। এমার্জেন্সী ওভার হয়নি।' রিসিভারটা মানসের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে কাজে মন দিল হিরু চাচা। ফেইল-সেফ হয় কাজ করবে নয়তো করবে না। তবে এক্সপিরিমেন্ট তাকে চালিয়ে যেতেই হবে।

কিশোর হতাশ চোখে কাউন্টডাউনকে চরম পর্যায়ে পৌছতে দেখল। বুকটা ভেঙে যাচ্ছে ওর। এত মানুষের এত ত্যাগ–সবই বৃথা গেল!

কাউন্টডাউন এখন দুই সংখ্যায় নেমে এসেছে। ১৯, ১৮, ১৭…আচমকা একটা আলো ঝলসে গেল কি বোর্ডে। তার পরেই নম্বর ওঠার গতি ধীর হয়ে এল। টার্মিনালের ওপরে একটা উজ্জ্বল আলোর ঝলকানি। 'ক্যানসেল, ক্যানসেল, ক্যানসেল। ফেইল-সেফ প্রসিডিওর চালু।' ঘড়িতে ১১, ১০, ৯ উঠে থেমে গেল। টিক এবং বোঁ বোঁ শব্দ করে আবারও ৬০০-র ঘরে ফিরে এল ওটা।

হাঁফ ছাড়ল কিশোর। রোবটটা দাঁড়িয়ে আছে, যেন ধ্যানমগ্ন। জলদগম্ভীর কণ্ঠে হঠাৎ বলে উঠল, 'মানুষ অসৎ। পিশাচ। মানবজাতির বিনাশ প্রয়োজন।'

'তুমি চাইলেই দুনিয়া দখল করতে পারবে? পারবে না। নিজেই ধ্বংস হয়ে যাবে।'

'ভয় পাবেন না। আমাকে ধ্বংস করা যাবে না। আমি অজেয়।' কন্ট্রোল স্পর্শ করে ওটা মেইন দরজা খুলল, হনহনিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। সময় নষ্ট না করে কিশোরও পিছু নিল।

বাঙ্কারের দরজা খুলে যেতে দেখলেন মেজর আর তাঁর লোকেরা। দীর্ঘ

পদক্ষেপে বেরিয়ে এল রোবটটা, কিশোর একটু পেছনেই। যন্ত্রমানব নিকটবর্তী হলে সৈন্যরা প্রবৃত্তির বশে অস্ত্র বাগিয়ে ধরল।

মেজর চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আমার অর্ডার ছাড়া কেউ গুলি করবেন না। কিশোরকে পালানোর সুযোগ দিতে হবে।' গুলি করেই বা কি লাভ, ভাবলেন তিনি। কিশোরকে নিয়ে নিরাপদে পিছু হটে যাওয়া ছাড়া অন্য কিছু আশা করাও বোকামি। আর হিরুটাও যে কি, কাজের সময় প্রফেসর চৌধুরীর ল্যাবোরেটরীতে গিয়ে বসে আছে!

ধাতব মূর্তিটা কিন্তু ক্রমেই আগে বাড়ছে। অসহায় রাগে ওটাকে লক্ষ করছেন মেজর। শত্রু চোখের সামনে, অথচ তাকে কাবু করার মত যথাযথ অস্ত্র হাতে নেই। নাকি আছে? আচমকা বিদ্যুৎ খেলে গেল তাঁর মস্তিষ্কে। 'হায়দার, ডিসিনটিগ্রেটর গানটা সরিয়ে ফেলেছিলেন না? আছে?'

'জ্বী, স্যার। আর্মস ট্রাকে তুলে রেখেছি।'

'তবে জলদি নিয়ে আসুন।'

দৌড় দিল হায়দার এবং ক'মুহূর্ত পরেই বিদঘুটে অস্ত্রটা নিয়ে এল। মেজর ওর হাত থেকে নিলেন ওটা। ককিং মেকানিজম আর ট্রিগার কোথায় দেখে নিয়ে শক্ত করে চেপে ধরলেন, তারপর দৃঢ়পায়ে এগিয়ে চললেন রোবটটার দিকে।

রেঞ্জের মধ্যে পৌঁছেই চেঁচিয়ে বললেন, ' কিশোর, তুই পালা!'

কিশোর রোবটটার পাশ দিয়ে বিদ্যুৎ বেগে গাছ-গাছালির দিকে ছুট লাগাল। মওকা বুঝে মেজর ডিসিনটিগ্রেটর গান তুলে গুলি করলেন।

হাতে মারণাস্ত্রটার শক্তির গুঞ্জন অনুভব করলেন তিনি। যন্ত্রমানবের দেহ এ মুহূর্তে রক্তলাল। ওটা অদৃশ্য হয়ে যাবে বলে অপেক্ষা করছেন মেজর। কিন্তু কই, হলো না তো। বরঞ্চ বৃদ্ধি পেল আকারে। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে টলমল পায়ে পিছিয়ে গেলেন মেজর। ওদিকে বেড়েই চলেছে ওটা, আকাশের চাঁদ পেড়ে আনবে যেন।

গাছপালা, বাড়ি ঘরের মাথা ছাড়িয়ে গেছে রোবটটা। লম্বা পা ফেলে ওঁদের দিকে তেড়ে আসছে ধাতব বিস্ময়...

বারো

বলতে গেলে কিশোরই হতচকিত আজাদ চাচাকে পিঁপড়ের মত পিষ্ট হয়ে মরার হাত থেকে বাঁচাল। গাছের জটলার উদ্দেশে তখনও প্রাণপণে দৌড়চ্ছিল ও, পেছনে কিছু একটা ঘটছে টের পেয়েছে, কিন্তু কি, ধারণা করতে পারেনি। অস্বাভাবিক উচ্চতার কল্যাণে ধাবমান কিশোরকে স্পট করতে একটুও অসুবিধা হয়নি রোবটটার। দিক বদলে, মেজরকে ছেড়ে কিশোরের পিছে ধাওয়া দিল ওটা, ধরে ফেলল প্রকাণ্ড কয়েকটা পদক্ষেপে।

একটা মস্ত ছায়া কিশোরের ওপর ঝুঁকে এলে আর্তনাদ করে উঠল ও, আকাশ থেকে নেমে এসেছে ঢ্যাঙা একটা হাত। পুতুলের মতন তুলে নেয়া হলো ওকে। ওপরদিকে উঠতে উঠতে শেষপর্যন্ত বিশাল ধাতব মুখটার সমরেখায় পৌঁছল ও। বজ্রগম্ভীর কণ্ঠস্বরটি এবার আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করে তুলল, প্রতিধ্বনিত হচ্ছে দিগন্তে। 'আপনি পালাতে পারলেন না। কিভাবে শত্রুর মোকাবিলা করি দেখুন এবার।'

হাতটা প্রসারিত হয়ে বাঙ্কারের চুড়োয় সযত্নে নামিয়ে রাখল কিশোরকে। প্রাণভয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে দেয়ালের একটা তাক আঁকড়ে ধরে রইল ও। রোবটটা ঘুরে সৈন্যদের উদ্দেশে হাঁটা দিল।

দানব যন্ত্রটাকে এগিয়ে আসতে দেখে, বহুকষ্টে গলা স্বাভাবিক রাখতে পারলেন মেজর। 'সবাই গাড়িতে,' চেঁচিয়ে অদেশ করলেন। 'শিগ্‌গির পালান। আমি এটাকে অবজার্ভ করার জন্যে থাকব।'

'আমিও থাকব, স্যার,' শান্তস্বরে বলল হায়দার।

'তবে কভার নিন,' বললেন মেজর। দু'জনেই কাছের পরিখাটায় ডাইভ দিয়ে পড়ল।

গাড়িগুলো সশব্দে রওনা দিতেই, রোবটটা প্রায় ধরে ফেলল পলাতকদের। শেষ গাড়িটাকে পিষে দিল ভয়ানক একটা পায়ের চাপ, লরি এবং ওটার যাত্রীরা ছুঁড়ে দেয়া খেলনার মত উড়ে গেল আকাশে।

ঘাড় গুঁজে পড়ে আছেন মেজর আর হায়দার। রোবটটার দৃষ্টি এড়িয়ে

থাকতে পারলেই কেবল এযাত্রা প্রাণে বাঁচবেন। বেড়ালে তাড়া ইঁদুরের মত পালাচ্ছে সৈন্যদের বহনকারী গাড়িগুলো, একটা ল্যাণ্ডরোভারকে পাড়িয়ে তুবড়ে দিল যন্ত্রমানব। একটা ধাবমান লরি তুলে নিয়ে ছুঁড়ে মারল মাঠের ওপাশে।

এক তরফা খেলায় বিরক্ত হয়েই যেন মুখ ফিরিয়ে নিল এক পর্যায়ে। বাকি গাড়িগুলোকে নিরাপদে বড় রাস্তায় পৌছতে দিল। বাঙ্কারের দু'পাশে পা রেখে দাঁড়িয়ে আছে ওটা, নতুন শত্রুর জন্যে অপেক্ষা করছে যেন।

একটু পরেই মাথার ওপরে একটা গোঁ গোঁ শব্দ শোনা গেল। মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে একটা জেট ফাইটার, রোবটের নাগালের অনেক বাইরে দিয়ে চক্কর মেরে ফিরে গেল–রিপোর্ট করতে নিশ্চয়ই। ক'মিনিট বাদে আরও ক'টাকে সঙ্গে করে ফিরল। জেটগুলো ডাইভ দিল রোবটটার উদ্দেশে, রকেট কামান থেকে গোলাবর্ষণ করছে। নড়েচড়ে নিজেকে রক্ষার চেষ্টা করে যাচ্ছে ওটা।

রোবটটা যখন জেট প্লেনগুলোর হামলা এড়াতে ব্যস্ত হিরু চাচা তখন মানসকে নিয়ে ল্যাণ্ডরোভার চালিয়ে ফিরল। সাবধানে, গুটি গুটি পায়ে পরিখা থেকে বেরিয়ে এলেন মেজর আর হায়দার। ক্রুদ্ধ রোবটটার দিকে আঙুল দেখাল হিরু চাচা। 'অত বড় হয়ে গেল কি করে?'

মেজর ভারী লজ্জা পেলেন। 'ডিসিনটিগ্রেটর গান দিয়ে খতম করে দিতে চেয়েছিলাম।'

'তবে তো ভালই। বেড়ে যাওয়ার জন্যে যে এনার্জির দরকার তার সাপ্লাই পেয়ে গেছে।'

কিছুক্ষণ পরে সমস্ত গোলা-বারুদ খরচ করে দিগন্তে মিলিয়ে গেল প্লেনগুলো।

মুখ ফিরিয়ে নিলেন মেজর। 'লাভ হলো না। এরপরে হয়তো বোমারু বিমান পাঠাবে।'

'তার দরকার হবে না।' মানস হালদারের দিকে ভ্রূ দেখাল হিরু চাচা, ওর হাতে একটা প্লাস্টিকের বালতি, আজব ধরনের একটা তরল ফেনায়িত হচ্ছে ওতে, ভুড়ভুড়ি ছাড়ছে।

'ওটা কি রে?'

'প্রফেসর সালামের আরেক কীর্তি। মেটাল ভাইরাসের সল্যুশন। মানস,

দিন তো।'

প্লাস্টিকের বালতিটা হিরু চাচার হাতে দিল মানস। 'আমি ড্রাইভ করব।'

'করুন,' বলল হিরু চাচা। দু'জনে সীট বদলে বসল। ল্যাণ্ডরোভারের এঞ্জিন চালু করল মানস।

'এক মিনিট,' বন্ধুকে বললেন মেজর। 'লিকুইড ঢাললেই দৈত্যটা বশ মেনে যাবে?'

ততক্ষণে রওনা হয়ে গেছে গাড়ি। জবাব পেলেন না।

সমস্ত নার্ভ জড়ো করে ধাতব দানবের দিকে গাড়ি ছুটিয়ে দিল মানস। ভয় পাচ্ছে, যে কোন মুহূর্তে পায়ের চাপে চিঁড়ে চ্যাপ্টা হয়ে যাবে। ভাঙাচোরা জমির ওপর দিয়ে লাফাতে লাফাতে চলেছে ওরা, স্টিয়ারিং হুইল চেপে ধরে বসে আছে মানস। ক্রমেই নিকটবর্তী হচ্ছে পাহাড়সম ধাতব দেহটার। চোখের কোণে লক্ষ করল মানস, একটা ধাতব হাত ওদের বাগে পেতে নেমে আসছে। পাগলের মত হুইল ঘুরিয়ে দিয়ে রোবটটার দু'পায়ের ফাঁক গলে বেরিয়ে যেতে লাগল ও। আর ঠিক সে মুহূর্তে, হিরু চাচা সীটে উঠে দাঁড়িয়ে বালতির পুরোটা তরল ঢেলে দিল দানোটার একটা গোদা পায়ে।

মানস বিন্দুমাত্র গতি না কমিয়ে, বাঁক নিয়েই ফিরে চলল মেজরের কাছে। নিরাপদ দূরত্বে পৌঁছে পিছু ফিরে চাইল, তাদের সাহসিকতার ফলাফল দেখতে। প্রথমটায় মনে হলো, ওষুধে ধরেনি।

মেজর বললেন, 'রোবটটার সাইজের জন্যে মনে হয় কাজ হয়নি।'

মাথা নাড়ল হিরু চাচা। 'না, সেজন্যে বরং আরও দ্রুত ফল হওয়ার কথা।' চোখ সরু করে রোবটটাকে জরিপ করছে সে। উদ্বিগ্ন। অতিকায় মূর্তির মত দাঁড়িয়ে ওটা। ইতোমধ্যে পুবাকাশে ভোরের আলো ফুটেছে। ধাতব শরীরটা থেকে ঠিকরে পড়ছে রোদ। হিরু চাচা আচমকা মেজরের বাহু চেপে ধরল। 'ওই দেখ—বাঁ পা-টা, ওটায় সল্যুশন ফেলেছিলাম...'

একটা মরচে ধরা, বাদামী দাগ ছড়িয়ে পড়ছে যন্ত্রমানবের পায়ের পাতায়। অবিশ্বাস্য দ্রুততায় বাড়ছে দাগটা—পা বেয়ে উঠে শরীর এবং দু'হাতে ছড়িয়ে গেল। মুহূর্তে মুহূর্তে আকার হ্রাস পাচ্ছে ওটার. শেষ পর্যন্ত ফিরে এল স্বাভাবিক সাইজে। প্রক্রিয়াটা শেষ হলে পর মুখ থুবড়ে মাটিতে

পড়ে গেল ওটা। নিথর, নিষ্প্রাণ।

সন্তুষ্টচিত্তে মাথা ঝাঁকাল হিরু চাচা। 'দারুণ ইন্টারেস্টিং সল্যুশন', বলল, 'গ্রোথ প্রোসেস উল্টে দিয়েছে...' রোবটটার দিকে হেঁটে গেল সে। অনুসরণ করল মানস, হায়দার আর মেজর আজাদ। তারা কিছুদূর এগোতেই ওপর দিক থেকে একটা তীক্ষ্ণ গলার স্বর শোনা গেল। 'হিরু চাচা! আমাকে বাঁচাও! এখান থেকে নামিয়ে নিয়ে যাও!' সবাই চাইল মাথা তুলে। তখনও দেয়ালের তাক আঁকড়ে ধরে রেখেছে কিশোর। চেঁচাচ্ছে। 'আরে, ওই তো কিশোর,' বলে উঠলেন মেজর। 'হায়দার, দেখুন তো, শিগ্‌গির ওকে নামানোর ব্যবস্থা করুন।'

'কিশোর,' চেঁচিয়ে বলল হিরু চাচা, 'ভয় পাস না। তোর হায়দার চাচা যাচ্ছে।'

হায়দার উদ্ধার কাজে ছুটলে হিরু চাচারা রোবটটার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। অব্যক্ত বেদনা ফুটে উঠেছে হিরু চাচার চেহারায়, কিন্তু মেজর দাঁত বের করে হাসছেন। 'আর রিস্ক নিচ্ছি না বাবা। এটাকে নিয়ে গিয়ে ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেলব।'

'তার দরকার পড়বে না,' বলল হিরু চাচা। ডান পা বাড়িয়ে জুতোর ডগা দিয়ে আলতো টোকা দিল রোবটটার দেহে। ওদের চোখের সামনে চুর চুর হয়ে ভেঙে গেল অত বড় ধাতব শরীরটা। ঠিক সে সময় উত্তুরে হাওয়া ছাড়ল। দমকা বাতাসে পাক খেতে খেতে মাঠের দিকে উড়ে গেল রোবটের দেহচূর্ণ। কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। বিষণ্ন মনে, হিরু চাচা ঘুরে হাঁটা দিল।

রিসার্চ সেন্টারের ল্যাবোরেটরীতে বসে আছে চাচা-ভাতিজা। 'আমার আর কিছু করার ছিল না রে,' কিশোরের কাঁধে হাত রেখে বলল হিরু চাচা।

ঢোক গিলল কিশোর। কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক রাখতে প্রাণপণ চেষ্টা করল। 'জানি। পাগল হয়ে গিয়েছিল ওটা। কিন্তু ওর কি দোষ? ও তো ইচ্ছে করে কারও ক্ষতি করেনি। ওকে দিয়ে করানো হয়েছে। প্রথমে কিন্তু ওর মধ্যেও মানবিকতা ছিল।'

'হ্যাঁ রে,' মোলায়েম গলায় বলল হিরু চাচা। 'ওটা ভালর হাতে পড়লে খুব ভাল, খারাপের হাতে পড়লে খুব খারাপ। ব্যাড লাক, খারাপের হাতেই

পড়েছিল।'

'কিন্তু আমার যে খুব কষ্ট হচ্ছে, হিরু চাচা,' বলে ঠোঁট কামড়ে ধরল কিশোর।

'তা তো একটু হবেই,' সান্ত্বনা দিয়ে বলল হিরু চাচা। 'আস্তে আস্তে দেখবি সব ঠিক হয়ে যাবে। এক কাজ করি চল, টাইম মেশিনে চড়ে একটু ঘুরে আসি। তোর মন ভাল লাগবে।'

'কিন্তু আজাদ চাচা না তোমাকে...'

'হুঁহ,' বিরক্তির সঙ্গে উচ্চারণ করল হিরু চাচা, 'থাকতে বললে কি হবে, আমি থাকছি না। আমার নাকি মন্ত্রীসভায় বক্তৃতা করতে হবে, বঙ্গভবনে লাঞ্চ খেতে হবে! তাতে আপত্তি ছিল না, কিন্তু বাইশটা রিপোর্ট লিখবেটা কে শুনি? আমি বাবা এসবের মধ্যে নেই।'

হিরু চাচার কথার ধরনে হেসে ফেলল কিশোর।

ওর মুখে হাসি ফুটতে দেখে খুশি হয়ে উঠল হিরু চাচাও।

'আমরা কেটে পড়ি চল।'

কিশোর তো এক পায়ে খাড়া। 'চল তবে,' বলল।

ইতিউতি চেয়ে টাইম মেশিনের দিকে পা বাড়াল ওরা।

***

ইচ্ছাপূরণ

শামসুদ্দীন নওয়াব

প্রথম প্রকাশ: ২০০৮

এক

'আরি, এটা কী? দেখি, দেখি,' বলে উঠল কিশোর।

তিন গোয়েন্দা আর ডানা স্কুলের খেলার মাঠে হাজির। ডিসেম্বরের নীল আকাশ। তবে সেদিকে কারও নজর নেই। ওদের দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছে এক গাছের দুই ডালের ফাঁকে আটকে থাকা অদ্ভুত এক জিনিস।

কিশোর গায়ের জোরে টেনেও ওটাকে এক চুল নড়াতে পারল না।

ডানা চুল নাচাল।

'মনে হয় গুপ্তধন।'

'গাছের মধ্যে?' হেসে উঠল কিশোর।

এবার মুসা ওর সঙ্গে হাত লাগাল। দু'জনের মিলিত শক্তির সঙ্গে এঁটে উঠতে পারল না জিনিসটা। গাছ থেকে খুলে এল, আর দুই বন্ধু ছিটকে পড়ল মাটিতে।

জিনিসটা তুলে ধরে দেখাল কিশোর।

'পুরানো বোতল,' দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে চকচকে সবুজ বোতলটার দিকে চাইল। বোতলটার একপাশে বিজিবিজি করে অচেনা কিছু শব্দ লেখা। মুখে বড়সড় এক ছিপি।

'খোলো না,' বলল ডানা। 'কেউ হয়তো ভেতরে কোন গোপন মেসেজ রেখেছে। কয়েকশো বছর ধরে হয়তো গাছের মধ্যে লুকানো আছে বোতলটা।'

'কয়েকশো বছর ধরে লুকানো থাকলে আমরা আগে দেখিনি কেন?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

মাথা ঝাঁকাল রবিন।

'আমরা রোজই তো আসছি এখানে। না দেখার কোন কারণ নেই।'

'এই ফাটলটার মধ্যে লুক্যানো ছিল। কাল রাতের ঝড়ে হয়তো বা আলগা হয়ে গেছে,' বলল মুসা।

'খুললে খোলো নয়তো আমার কাছে দাও,' বলে হাত বাড়াল ডানা।

'আমি খুলছি।' ছিপি ধরে টানল কিশোর। কিন্তু বিন্দুমাত্র টলাতে পারল না। এবার বসে পড়ে দু'পায়ের মাঝখানে বোতলটা ধরল ও, তারপর গায়ের জোরে টান দিল।

ফট!

'খাইছে! গন্ধটা কীসের?' বলে উঠল মুসা।

কিশোর উঠে দাঁড়াল।

'পুরানো একটা বোতল। দুর্গন্ধ ছাড়া ভেতরে কিছুই নেই,' বলল বন্ধুদের উদ্দেশে। পরমুহূর্তে বোতল আর ছিপিটা ছুঁড়ে মারল স্কুলের পাশের ইয়ার্ডে।

'যেখানে সেখানে জিনিসপত্র ফেলা ঠিক না,' বলল ডানা।

শ্রাগ করল কিশোর।

'ওখানে জঞ্জাল ছাড়া আর কিছু নেই। আরেকটা বাতিল বোতল যোগ হলে কিছু যাবে আসবে না।'

গাছের ওপাশে, ইয়ার্ডটার দিকে চাইল ওরা চারজন। ভাঙা কাঠের বেড়া দিয়ে ঘেরা ফাটা টায়ার, ভাঙা বোতল আর ধাতব পিপের স্তূপ।

'জায়গাটা বিশ্রী,' শিউরে উঠে দস্তানা টানল ডানা। 'বিশেষ করে আর সব বাড়ি যখন সেজেগুজে বড়দিনের জন্যে তৈরি হচ্ছে।'

'আহা, কেউ যদি জায়গাটা পরিষ্কার করত!' বলল মুসা।

'তারচেয়ে বরং দশ লাখ ডলার চাইতে পারো,' কিশোর বলল ওকে। 'ভুলে যেয়ো না বহু বছর কেউ এখানে বাস করে না।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল মুসা।

'ঠিকই বলেছ। কিন্তু আশা করতে দোষ কী?'

দুই

'বিশ্বাসই হচ্ছে না!' চেঁচিয়ে উঠল রবিন। 'গতকালই তো এটা জাঙ্কইয়ার্ড ছিল।'

পরদিন, স্কুল তখনও বসেনি। খেলার মাঠে সবার আগে পৌঁছেছে রবিন।

মুসা ওর পাশে এসে দাঁড়াল। চেয়ে রয়েছে একদৃষ্টিতে।

'খাইছে! অবাক কাণ্ড তো!'

ইতোমধ্যে কিশোর আর ডানা এসে হাজির হয়েছে।

'মিসেস হকিন্সের জ্বালায় আর পারা গেল না,' বলল কিশোর। 'মনে হচ্ছিল সায়েন্স হোমওয়ার্ক আর বুঝি শেষই হবে না।' মিসেস হকিন্স ওদের ফোর্থ-গ্রেডের কড়া টিচার।

'মিসেস হকিন্সের কথা ছাড়ো,' বলে উঠল মুসা। স্কুলের পাশের ইয়ার্ডটা আঙুল ইশারায় দেখাল। গতকালও জায়গাটা ছিল ভাঙা-বাতিল জিনিসপত্রের গাদা, অথচ আজ একদম ঝকঝকে তকতকে।

এমনকী সবুজ বোতলটাও নেই। চমৎকারভাবে ছাঁটা হয়েছে ঘাস। খাড়া করা হয়েছে বেড়া। সাজানো হয়েছে বড়দিনের আলো দিয়ে। পিছনের বারান্দার রেলিঙে ঝুলছে বাতি। ইয়ার্ডের প্রতিটা গাছ আর ঝোপ সেজেছে আলোর মালায়।

ডানা লম্বা এক উলের স্কার্ফ পেঁচিয়েছে গলায়। শুধু নাক আর চোখজোড়া দেখা যাচ্ছে।

'দারুণ দেখাচ্ছে,' মত প্রকাশ করল ও।

'ইলেকট্রিক কোম্পানির পোয়াবারো,' হেসে বলল কিশোর। 'মোটা বিল পাবে।'

'মুসা ঠিকই বলেছিল,' বলল ডানা। 'আশা করতে দোষ কী।'

বন্ধুদের দিকে চাইল রবিন।

'তোমাদের অবাক লাগছে না রাতারাতি এত জঞ্জাল কীভাবে সাফ হয়ে গেল?' প্রশ্ন করল।

'আমার ভাল লাগছে, ব্যস। অত ভেবে কী হবে?' স্কার্ফ ভেদ করে বলল ডানা।

ঠিক এসময় উদয় হলো বিশালদেহী এক লোক। চকচকে টাক মাথা। বেগুনী এক সাইকেল চালিয়ে বাড়ির পিছনের ইয়ার্ডে এসে ঢুকল। পরনে সোনালী জরির কাজ করা ভেস্ট আর উজ্জ্বল কমলারঙা প্যান্ট। গলায় সোনার হার। এক কানে সোনার দুল। পায়ে নাগরা। সাইকেলের ভেঁপু বাজিয়ে ছেলে-মেয়েদের উদ্দেশে হাত নাড়ল।

'কেমন আছ তোমরা?' ভরাট কণ্ঠে বলল।

'ভ-ভাল, ধন্যবাদ,' জবাবে বলল রবিন। 'আপনি ভাল তো?'

প্রকাণ্ডদেহী লোকটা আন্তরিক হাসি হাসল।

'আজকে ভাল আছি। বলতে গেলে চমৎকার আছি। বহু বছর পর ব্যায়াম করার সুযোগ পেলাম কিনা।'

'আপনাকে তো আগে কখনও দেখিনি,' সন্দেহের সুরে বলল কিশোর।

মৃদু হাসল লোকটা।

'কালকে এসেছি তো, তাই দেখোনি।'

ডানা হাত বাড়িয়ে দিল।

'আমি ডানা, আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম।'

লোকটা বেড়ার গায়ে বাইকটা ঠেস দিয়ে রেখে, ডানার হাতে চুমু খেতে ঝুঁকল।

'আমার নাম হ্যানজিন। তোমার মত এত সুন্দর চুলের মেয়ের সেবা করতে পারা আমার পরম সৌভাগ্য।'

খিলখিল করে হেসে ফেলল ডানা।

'ইয়ার্ডটা খুব সুন্দর লাগছে। নিশ্চয়ই আপনার কাজ?'

খুশিতে দাঁত বেরিয়ে পড়ল আগন্তুকের।

'আমি অনেক দিন বন্দি হয়ে ছিলাম কিনা, তাই তাজা বাতাসে কাজ করতে পেরে খুব ভাল লেগেছে।'

মাথা ঝাঁকাল ডানা।

'প্রতিবেশীরা খুব খুশি হবে।'

'স্কুল বন্ধ হয়ে গেলে ভাল হত,' এসময় স্কুল বেল বাজলে বিড়বিড় করে আওড়াল কিশোর।

চলে যাওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়াল ওরা। হ্যানজিনের উদ্দেশে হাত নাড়ল ডানা।

'পরে আবার দেখা হবে,' বলল।

মাথা নুইয়ে সম্মান দেখাল হ্যানজিন।

'তোমার ইচ্ছা আমার কাছে হুকুম।' ওর গমগমে হাসির শব্দ খেলার মাঠের উপর দিয়ে প্রতিধ্বনিত হলো। কানে বাজল স্কুলের গেট পর্যন্ত।

তিন

তিন গোয়েন্দা আর ডানা হন্তদন্ত হয়ে যার যার সিটে গিয়ে বসল। মিসেস হকিন্স তাঁর সবুজ লকেটটা ঘষলেন।

'সরি, আমাদের দেরি হয়ে গেল,' বলল মুসা।

মাথা ঝাঁকাল রবিন।

'আসলে নতুন প্রতিবেশীর ডেকোরেশনের প্রশংসা করতে গিয়ে দেরিটা হয়েছে,' বলল ও।

সবুজ চোখজোড়া ঝলসে উঠল টিচারের।

'আলোর ঝলকানি নিয়ে কথা বলার সময় আমাদের নেই,' বললেন মিসেস হকিন্স। তিনি কখনও গলা চড়িয়ে কথা বলেন না। কেন না, ছেলে-মেয়েরা তাঁর ক্লাসে কখনও অমনোযোগী হয় না। তবে কোন কারণে রেগে গেলে সবুজ লকেটটা ঘষেন তিনি আর ঝলসে ওঠে তাঁর সবুজ চোখজোড়া। তারপর অদ্ভুত কোন ঘটনা ঘটে যায়। এজন্য ছেলে-মেয়েরা সমঝে চলে তাঁকে, ঘাঁটায় না।

মিসেস হকিন্স এক গাদা পড়া চাপাতেই নতুন প্রতিবেশীর কথা বেমালুম ভুলে গেল ওরা চারজন। পঞ্চাশটা অঙ্ক আর দুটো বিজ্ঞান গবেষণা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সবাই।

মাঝ সকালে, রবিন ফুঁ দিল হাত গরম করার জন্য, আর ডানার দাঁতে দাঁতে খটাখট বাড়ি খেতে লাগল। মিসেস হকিন্স সোয়েটার পরে নিয়ে থার্মোস্ট্যাট পরখ করলেন।

'খাইছে! ঠাণ্ডায় হাত-পা জমে যাচ্ছে,' ফিসফিসিয়ে বলল মুসা।

শ্রাগ করল কিশোর।

'গ্রীনহিলসে অত ঠাণ্ডা পড়ে না। আমার খুব একটা খারাপ লাগছে না।' কিন্তু কিশোরের কথা ভুল প্রমাণিত হলো। দিন শেষে, ঘন ধূসর মেঘ জমাট বাঁধল শহরের উপর। আর বরফ জমল স্কুলের জানালাগুলোতে।

'মনে হচ্ছে ভারী তুষার পড়বে,' গলা খাদে নামিয়ে বলল মুসা।

ইংরেজি পড়া চলছে তখন।

মাথা নাড়ল রবিন।

'গ্রীনহিলসে অনেক বছর সেরকম তুষার পড়ে না। তা ছাড়া আজকে সকালে রেডিওর ওয়েদার রিপোর্ট শুনেছি। আজকে রোদ থাকবে, ঠাণ্ডাও কম পড়বে।'

'সেটা হাওয়াইতে হতে পারে, এখানে নয়। গ্রীনহিলসে তুষার পড়বেই!' জানালা দিয়ে আঙুল দেখাল কিশোর। গাছ-গাছালির ডাল-পালায় জমছে, ঝরে পড়ছে বড় বড় নরম তুষারকণা।

স্কুল যখন ছুটি হলো, খেলার মাঠ আর গাছ-পালা ছেয়ে গেছে তুষারে।

ছেলে-মেয়েরা দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলে সাইকেলের ভেঁপু বাজাল হ্যানজিন।

'তুষার কেমন লাগছে?' বাইক পার্ক করে জানতে চাইল। তার পরনে এখনও সেই ভেস্ট আর প্যান্ট।

'দারুণ!' বলে ভেজা তুষার ধরার জন্য হাত বাড়াল মুসা।

ডানা স্কার্ফ পেঁচিয়ে হ্যাট পরল মাথায়।

'আমাদের বাড়ি ফেরা উচিত। রাস্তা-ঘাট পিছলা হয়ে যাবে।'

'যাক,' বলে উঠল কিশোর। হ্যানজিনের বাসার পিছনে চকচকে তুষারে খেলার ছলে হড়কে গেল। 'রাস্তা-ঘাট অচল হয়ে গেলে স্কুল বন্ধ হয়ে যাবে!'

'তুমি তখন ছুটি কাটাতে পারবে,' কিশোরের উদ্দেশে বলল হ্যানজিন।

আচমকা স্থাণু হয়ে গেল রবিন।

'ও কী বলল শুনেছ?'

'না তো। শুধু ডানার দাঁতের খটখটানি শুনছি,' জানাল কিশোর।

'হ্যানজিনের কথাগুলো শোননি?' মুসার উদ্দেশে হিসিয়ে উঠল রবিন। 'কিশোর তো এমনটাই চেয়েছিল।'

'খাইছে! কী বলছ তুমি?' মুসা জিজ্ঞেস করল।

'কিশোর চেয়েছিল স্কুল বন্ধ হয়ে যাক।'

'তাতে কী? খারাপ কিছু তো চাইনি,' ওর কথা শুনে বলল কিশোর

'এক দিক দিয়ে খারাপই,' বলল মুসা। 'ভুলে গেলে, স্কুলে কালকে ফিলিংস ব্যান্ডের শো? তুষার না গললে শো বাতিল হয়ে যাবে।'

'ভাল!' বিরস কণ্ঠে বলে উঠল কিশোর। 'সারা বছরে একটা ভাল কিছু

ঘটত, সেটাও খেয়ে নিল এই জঘন্য তুষার।'

হাস্যকর সবুজ জুতো দিয়ে তুষারে লাথি মারল হ্যানজিন। হেলান দিল বেড়ার গায়ে।

'ছোট বন্ধুদের মন খারাপ কেন? তোমরা চেয়েছিলে স্কুল না বসুক, এখন তো দেখে শুনে মনে হচ্ছে তা-ই হতে চলেছে।'

'কিন্তু তাই বলে ফিলিংসের গান মিস করব?' অভিযোগের সুরে বলল কিশোর।

'মিসেস হকিন্স না থাকলে স্কুল এতটা খারাপ লাগত না,' বলল মুসা।

'উনি অবশ্য মাঝে মাঝে ভাল কাজও করেন,' বলল ডানা। 'ফিলিংসের মার্ক নফলারকে তো উনিই আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।'

'ইস, যদি তুষার আজ রাতের মধ্যে গলে যেত! তা হলে আর কনসার্ট মিস করতে হত না,' বলল রবিন।

'মিসেস হকিন্স খাটিয়ে মারেন বলেই স্কুলে আসতে ইচ্ছে করে না। আহা, উনি যদি এমন না করতেন!' যোগ করল কিশোর।

ওরা কেউ খেয়াল করল না হ্যানজিন নিঃশব্দে হাসতে শুরু করেছে।

চার

'ভাগ্যিস স্কুল বসেছে আজকে,' পরদিন ক্লাসে বসার পর বলল কিশোর। 'কনসার্টের জন্যে তর সইছে না আমার।'

সকালের বেল তখনও বাজেনি। মিসেস হকিন্স ইতোমধ্যেই বোর্ডে অ্যাসাইনমেন্ট লিখতে আরম্ভ করেছেন। ক্লাসরুমের মেঝের কয়েক জায়গায় পানি জমে গেছে। এখানে ওখানে কয়েকটা বালতি বসানো হয়েছে, ছাদের ফুটো দিয়ে পড়া পানি ধরে রাখতে।

রবিন মাথা ঝাঁকিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। উজ্জ্বল রোদ বিলাচ্ছে সূর্য। কালকের তুষার গলে পানির পুকুর তৈরি হচ্ছে।

'এই উল্টোপাল্টা আবহাওয়া সব কিছু গুবলেট করে দিয়েছে। গ্রীনহিলসের বেশিরভাগ জায়গায় পানি জমে গেছে।' বলল রবিন।

'তাতে আমার কিছু যায় আসে না। তুষার গলে গেছে, জমজমাট কনসার্ট হবে, আমি এতেই খুশি,' বলল মুসা।

মিসেস হকিন্স ঝট করে ঘুরে দাঁড়ালেন। তাঁর বেগুনী স্কার্ট দুলে উঠল।

'আমি দুঃখিত, ছেলে-মেয়েরা। প্রিন্সিপাল সকালে আমাকে জানিয়েছেন, বন্যার জন্য ফিলিংস আজকে আমাদের এখানে পারফর্ম করতে পারছে না। পানিতে ওদের ইন্সট্রুমেন্ট ভিজে গেছে।'

'ইন্সট্রুমেন্ট বাজানোর দরকার কী? খালি গলায় গান গাওয়াই তো যথেষ্ট,' বলল মুসা।

'আমরা না হয় পা ট্যাপ করব আর কিশোর ওর চিরুনি ঠুকবে,' অনুনয় করে বলল ডানা।

'তোমাদের ভাবনাগুলো ভাল, কিন্তু ওরা এরমধ্যেই কনসার্ট ক্যানসেল করেছে,' ব্যাখ্যা করে বোর্ডে লিখে চললেন মিসেস হকিন্স।

'তুষার পড়ে সব গোলমাল হয়ে গেল,' অভিযোগ করল কিশোর।

'তুমিই তো চেয়েছিলে স্কুল না বসুক,' মুসা বলল।

'তুষার গলে রাস্তা-ঘাট অচল হয়ে যাক সেটাও চেয়েছিলে,' মনে করিয়ে দিল ডানা।

'আর তা-ই হয়েছে!' বলে উঠল রবিন।

'তাতে কী? কনসার্ট বাতিল হোক তা তো চাইনি,' আওড়াল কিশোর।

'ব্যাপারটা কেমন অদ্ভুত না, আমাদের দুটো ইচ্ছেই পূরণ হয়ে গেল?' প্রশ্ন করল রবিন।

'আমার ইচ্ছেটাও,' বলল মুসা। 'আমি চেয়েছিলাম জাঙ্কইয়ার্ড পরিষ্কার হয়ে যাক।'

'তাতে কী হলো? আমি তো চেয়েছিলাম মিসেস হকিন্স আমাদেরকে কম খাটাবেন, কিন্তু সেটা তো সত্যি হয়নি,' বলল কিশোর। 'বোর্ডের দিকে তাকিয়ে দেখো।'

ওরা চারজন টিচারের দিকে চাইল। উনি হঠাৎই হাত থেকে চক ফেলে দিলেন।

'কাজ করা যাচ্ছে না। চকটা পর্যন্ত ভিজে গেছে। আজকে আর কাজ করা সম্ভব নয়,' বিস্মিত ছেলে-মেয়েদের উদ্দেশে বললেন। 'আজকের দিনটা আমরা ভিডিও দেখে আর এটা সেটা খেলে কাটাতে পারি।'

অনেক ছেলে-মেয়ে খুশিতে চেঁচিয়ে উঠল, কিন্তু মুসা ঢোক গিলে রবিনের দিকে চাইল। কিশোরের ইচ্ছের কথা ভাবছে ওরা।

'খাইছে! মিসেস হকিন্স কোনদিন আমাদেরকে ভিডিও দেখতে দেন না,' বলল ও।

'আজকে পার্টি করলে কেমন হয়? আমি দেখি কিছু কুকি পাঠাতে বলি,' বললেন মিসেস হকিন্স।

কিশোর আনন্দে আত্মহারা।

'আমরা কি আইসক্রিমও পেতে পারি?' চেঁচিয়ে উঠল ও। বাকি ক্লাস নিস্তব্ধ হয়ে গেল। মিসেস হকিন্স তাঁর ক্লাসে চিৎকার-চেঁচামেচি মোটেই পছন্দ করেন না। কিন্তু আজ দেখা গেল তাঁর চোখ ঝলসে উঠল না। তিনি এমনকী সবুজ লকেটটাও ডললেন না। স্বভাবসিদ্ধ আধো হাসির বদলে আজকে দাঁত বেরিয়ে পড়ল তাঁর।

'নিশ্চয়ই,' জানালেন তিনি।

'মনে হচ্ছে আমাদের সবগুলো ইচ্ছেই একে একে পূরণ হয়ে যাচ্ছে,' বলল রবিন। ছুটির পর খেলার মাঠে জড় হয়েছে ওরা।

'চাইলেই এভাবে ইচ্ছে পূরণ হয়ে যায় না। আমি অনেক কিছুই চেয়েছি যেগুলো সত্যি হয়নি,' বলল কিশোর।

'হ্যাঁ, কেউ চাইলেই ইচ্ছাপূরণ করতে পারে না,' বলল মুসা।

'শুধু বোতলের জিন ছাড়া,' হেসে বলল ডানা।

'ঠিক ধরেছ! সবুজ বোতলটার কথা মনে নেই?' চেঁচিয়ে উঠল রবিন।

'ওটা নিশ্চয়ই জিনের বোতল ছিল। আর আমরা জিনটাকে মুক্তি দিয়েছি। সেজন্যেই আমাদের ইচ্ছে পূরণ হয়ে চলেছে!' সায় জানিয়ে বলল ডানা।

'তা হলে জিনটা গেল কোথায়?' প্রশ্ন করল মুসা।

ঠিক এসময় সাইকেলের ভেঁপু শোনা গেল। হ্যানজিন তার ব্যাকইয়ার্ডে প্রবেশ করে ওদের উদ্দেশে হাত নাড়ল। মুসা আর রবিন পাল্টা হাত নাড়ল। কিন্তু ডানার চোখ-জোড়া বিস্ফারিত হয়ে গেল।

'এই হ্যানজিনই আসলে জিন।'

'তোমার মাথাটা গেছে,' বলল কিশোর। 'জিন শুধু আরব্য উপন্যাসের গল্পেই থাকে। তা ছাড়া তারা বাইক চালায় না, জাদুর কার্পেটে চড়ে উড়ে

বেড়ায়।'

'ডানার কথা উড়িয়ে দিয়ো না। ভুলে যেয়ো না বোতল খোলার পর পরই হ্যানজিন দেখা দিয়েছে,' বলল নথি।

'ও দেখতেও জিনের মত,' সায় জানাল মুসা।

'আর ওর নাম হ্যানজিন,' ডানা বলল। 'নামের শেষে জিন আছে।'

হেসে উঠল কিশোর।

'তোমরা দেখি সব আলিফ লায়লার গল্প জুড়ে দিলে। জিন বলে কিচ্ছু নেই।'

'শশশ, ও শুনে ফেলবে,' সতর্ক করল ডানা।

'শুনুক না। ও কী করবে শুনি? আমাকে ব্যাঙ বানিয়ে দেবে? যত্তসব ফালতু!' জোর গলায় বলে উঠল গোয়েন্দাপ্রধান।

'চুপ করো। আমি বলছি তুমি চুপ করো,' বলে উঠল মুসা।

এসময় অট্টহাসির শব্দ ভেসে এল পাশের উঠন থেকে।

চোখ বড় বড় হয়ে গেল মুসার।

'খাইছে! একী করলাম আমি?' ফিসফিস করে বলল ও।

পাঁচ

কিশোর পরদিন কাদা ভেঙে বন্ধুদের সঙ্গে মিলিত হলো। খেলার মাঠে গল্প করছিল মুসা, রবিন আর ডানা।

'হ্যানজিনকে জিন মনে করে বোকামি করেছি আমরা। কিশোর কালকে অনেক কথা বলেছে। তোমার চাওয়ায় কোন কাজ হয়নি,' মুসার উদ্দেশে বলল রবিন।

'ভাগ্যিস কাজ হয়নি,' খোশমেজাজে বলল মুসা। 'অবশ্য কিশোরের মুখ বন্ধ করবে এমন বান্দা পৃথিবীতে জন্মায়নি।'

কিশোর বন্ধুদের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে কটমট করে মুসার দিকে চাইল।

'খাইছে! কী হয়েছে?'

কিশোর জবাব দেবে বলে মুখ খুলল। কিন্তু কথার বদলে বেরিয়ে এল ব্যাঙের ডাক।

'শরীর খারাপ নাকি?' ডানা প্রশ্ন করল।

আবারও ব্যাঙের ডাক বেরোল কিশোরের গলা দিয়ে।

মুসার চোখ বিস্ফারিত।

'খাইছে! আমার ইচ্ছে পূরণ হয়ে গেছে দেখছি!'

'ও কিছু না, কিশোরের ল্যারিনজাইটিস হয়েছে,' বলল রবিন।

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। ওর ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ থেকে বন্ধুরা যা উদ্ধার করতে পারল তা হচ্ছে, মেরি চাচী ওকে এই ভয়ানক ওষুধটা গিলতে বাধ্য করেছেন। উনি বলেছেন, কিশোর কদিনের মধ্যেই সেরে উঠবে। আর মুসার চাওয়ার সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই।

'কিন্তু তুমি তো কথাই বলতে পারছ না,' বলল মুসা।

রবিন মাথা ঝাঁকিয়ে পড়শীর বাড়ির দিকে চাইল। বারান্দা থেকে ওদের উদ্দেশে হাত নাড়ল হ্যানজিন। রবিন ওর দিকে পাল্টা হাত নেড়ে ফিসফিস করে বন্ধুদেরকে বলল, 'গোলমেলে আবহাওয়ার কারণে হয়তো কিশোরের গলা বসে গেছে।'

'কিংবা মুসার ইচ্ছাপূরণ হয়েছে,' বলল ডানা।

'শশশ,' সাবধান করল নথি। 'এখন থেকে সতর্ক থাকতে হবে হ্যানজিন যেন আমাদের কথা না শোনে। এবং আর কোন ইচ্ছার কথা কেউ মুখ ফুটে উচ্চারণ করব না! বলা তো যায় না, ও যদি সত্যি সত্যি জিন হয়!'

কিশোর মাথা নেড়ে ক্য ক্য করে উঠল।

'আমি প্রমাণ করে দিতে পারি ও জিন নয়।'

'কীভাবে?' মুসার প্রশ্ন।

'আমি স্রেফ একটা ইচ্ছা জানাব,' ককিয়ে উঠল কিশোর। 'আমি চাই–'

সঙ্গে সঙ্গে কিশোরের মুখ চেপে ধরল রবিন।

'কিশোর হয়তো ঠিকই বলেছে। শিয়োর হওয়ার জন্যে আমাদের আরেকটা ইচ্ছার কথা জানানো উচিত। কিন্তু সেটা এমন কিছু হতে হবে, যাতে বোঝা যায় ঘটনাটা কাকতালীয় নয়,' বলল মুসা।

'এবং এমন কিছু, আমরা যেটা মনে প্রাণে চাই,' ব্যাঙের গলায় বলল কিশোর।

'পেয়েছি!' চেঁচিয়ে উঠল ডানা। বন্ধুরা ওকে থামাতে পারার আগেই বলল, 'আমি চাই ফ্রেঞ্চ ফ্রাই, পিৎযা আর চকোলেট ক্যান্ডি-রোজকার লাঞ্চে!'

চকিতে হ্যানজিনের দিকে চাইল ওরা। ওদের উদ্দেশে বাউ করে এক মনে গোলাপি সাইকেলটা পালিশ করতে লাগল হ্যানজিন। শিরদাঁড়া বেয়ে ঠাণ্ডা স্রোত নেমে গেল চারজনের।

ছয়

'তোমার চাওয়াটা বোকার মত হলো,' বলল রবিন। 'ভাল কিছু চাইলে না কেন?'

'কেন, পিৎযা আর চকোলেট খারাপ হলো কোথা দিয়ে?' ডানার পক্ষ টেনে বলল মুসা।

কিশোর কোমরে হাত রেখে কর্কশ গলায় বলল, 'ওই ক্যাফেটেরিয়ার মহিলারা আমাদেরকে রোজ রোজ জাঙ্ক ফুড খেতে দেবে না। আমি আবারও বলছি হ্যানজিন জিন-টিন কিছু নয়।'

কিন্তু কিশোরের কথা মিথ্যে প্রমাণিত হলো। বেল বাজতেই গলা খাঁকরে মিসেস হকিন্স বললেন, 'একটা খারাপ খবর আছে। ফুড ডেলিভারি ট্রাকটা নষ্ট হয়ে গেছে। ক্যাফেটেরিয়া আজকের মেনু চিকেন-অ্যান্ড-ব্রোকলি বেক সার্ভ করতে পারছে না।'

'খুব খারাপ কথা,' বলল কিশোর।

'খাইছে! আজকে লাঞ্চে তা হলে কী দেওয়া হচ্ছে?' প্রশ্ন করল মুসা।

মাথা নাড়লেন মিসেস হকিন্স।

'নিশ্চয়ই ভাল কিছুই দেবে,' বললেন।

'দিলে বড় ধরনের চেঞ্জ হয়েছে বলতে হবে,' বিড়বিড় করে বলল কিশোর।

লাঞ্চের আগেই খিদে পেয়ে গেল মুসার।

'ইস, কখন যে পিৎযা খাব।'

'পিৎযাই যে খেতে পারব এমনটা ভাবার কোন কারণ নেই,' বলল রবিন। 'কপালে হয়তো শেষমেশ ফিশ স্টিকস জুটবে।'

মাথা নাড়ল মুসা।

'আমার ইচ্ছে পূরণ হতেও তো পারে,' বলল ও।

ছেলে-মেয়েদেরকে অবাক করে দিয়ে ক্যাফেটেরিয়া ওদের প্রিয় খাবার পরিবেশন করল। বিস্মিত হলো না শুধু তিন গোয়েন্দা আর ডানা।

'নিজেদের একটা জিন থাকা খারাপ নয়,' বলে পিৎযায় কামড় বসাল মুসা।

'এতেও কিছু প্রমাণ হয় না,' বসা গলায় বলে ফ্রেঞ্চ ফ্রাইতে কেচাপ ছিটাল কিশোর। 'ডেলিভারি ট্রাক যে কোন সময় নষ্ট হতে পারে। এর মধ্যে কোন ম্যাজিক নেই।'

'আজকে নষ্ট হয়েছে বলে খুশি আমি,' বলল ডানা।

মুসা গেল আরেকবার ট্রে ভরে খাবার নিয়ে আসতে।

পেট পুরে খেল ওরা।

'পেটে আর এক ইঞ্চি জায়গা নেই,' গুঙিয়ে উঠল রবিন।

'জীবনে আর চকোলেট বার দেখতে চাই না,' যোগ করল কিশোর। টেবিলে অন্তত পনেরোটা ক্যান্ডি র‍্যাপার ছড়ানো রয়েছে।

ঢেকুর তুলল মুসা।

'চলো মাঠে যাই।'

খেলার মাঠে গিয়ে শুয়ে পড়ল ওরা। মুসা পেট চেপে ধরে গুঙিয়ে উঠল।

'নিজেদের জিন থাকা এখন আর অতখানি আনন্দের ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে না,' বলল।

'আমাদের জিন নেই,' ধরা গলায় বলল কিশোর।

'কিন্তু আমার ইচ্ছে তো পূরণ হয়েছে!' তর্ক জুড়ল ডানা। 'এতে প্রমাণ হয় হ্যানজিন আসলেই জিন।'

'কিছুই প্রমাণ হয় না,' জোর দিয়ে বলল কিশোর।

'এটা ব্যাখ্যা করা কঠিন, ডানা যেদিন ওর ইচ্ছের কথা জানাল ঠিক

সেদিনই ডেলিভারি ট্রাক গেল নষ্ট হয়ে,' বলল নথি।

'তাতে কী?' বলে উঠল কিশোর। 'রাশেদ চাচার ট্রাক কদিনই বা ঠিক থাকে?'

'খাইছে!' এসময় লাল রঙের এক স্পোর্টস কার দেখে বলে উঠল মুসা। 'রাশেদ চাচার ওরকম একটা গাড়ি থাকা দরকার ছিল।'

'আহা, সত্যিই যদি থাকত,' বলল কিশোর।

ওরা চোখের পলক ফেলার আগেই, ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষে দাঁড়াল স্পোর্টস কারটা। আর ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন রাশেদ পাশা।

সাত

'রাশেদ চাচার গাড়িটা সত্যিই দারুণ,' পরদিন সকালে বলল রবিন। ক্লাস তখনও বসেনি। ওরা চারজন খেলার মাঠে দাঁড়িয়ে।

'গাড়িটায় চড়ে ঘুরতে পারলে হেভি হত!' বলল মুসা।

কিশোর বলল, 'চাচা কাজে বাইরে যাচ্ছে বলে কোম্পানী গাড়িটা ধার দিয়েছে। কাজ থেকে ফিরুক সবাই মিলে চড়া যাবে।'

'কিন্তু এখন কাজ কীসের? বড়দিন তো প্রায় চলে এসেছে,' বলল ডানা।

'বড়দিন বলে তো আর কাজ বন্ধ রাখা যায় না,' বলল রবিন।

'জিনের কাছে চাইলে সে কাজ বন্ধ করে দিতে পারে,' মুসা বলল।

'আমি ওসব আজগুবী কথায় বিশ্বাস করি না,' দৃঢ় গলায় জানাল কিশোর।

'তোমার ধারণা ভুলও হতে পারে,' বলে ব্যাগ থেকে বড় এক বই বের করল নথি। 'কাল সন্ধ্যায় এটা পাবলিক লাইব্রেরি থেকে নিয়ে এসেছি।'

'কী আছে এতে?' প্রশ্ন করল ডানা।

বইটা খুলল রবিন। বন্ধুদেরকে একটা অধ্যায় বের করে দেখাল। তাতে লেখা, জিন: ইচ্ছাপূরণ।

'খাইছে! ছবিটা দেখো।' বলল মুসা।

সবুজ এক বোতল থেকে বেরিয়ে আসছে প্রকাণ্ডদেহী এক জিন। দেখতে অবিকল হ্যানজিনের মত।

পড়ে চলল রবিন।

' "জিনদেরকে হাজার হাজার বছর ধরে বোতলবন্দি করে রাখা যায়। কথিত আছে, জিনকে যে বোতল থেকে মুক্তি দেবে সে তিনটা বর পাবে। জিন তা হলে বোতলের অভিশাপ থেকে মুক্তি পাবে এবং মুক্তিদাতা আর কোন বর পাবে না।"'

'খাইছে! আমাদের চারজনের তিনটে করে বর হলে মোট বারোটা হয়!' বলে উঠল মুসা।

'আমরা চাইলে গোটা একটা খেলনার দোকান পেতে পারি,' ডানা হাসি মুখে বলল।

রবিন বইটা বন্ধ করে ব্যাকপ্যাকে রেখে দিল।

'আমাদের বুঝেশুনে বর চাওয়া উচিত।'

'তোমাদের সবার মাথার চিকিৎসা দরকার।' বলে কাদার গর্তে লাথি মারল কিশোর।

শ্রাগ করল ডানা।

'চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কী।'

এসময় হ্যানজিন পিছনের উঠনে সাইকেল চালিয়ে ঢুকল। ভেঁপু বাজিয়ে হাত নাড়ল ওদের উদ্দেশে। ওকে সিট থেকে নেমে বারান্দার সঙ্গে বাইক ঠেস দিয়ে রাখতে দেখে ডানা বলল, 'ইস, আমি যদি সারাজীবন বাব্‌ল্ গাম খেতে পেতাম!'

'আমি যদি অনেক রাত পর্যন্ত জেগে ভিডিও গেমস খেলতে পারতাম! মা যদি কিছু না বলত!' বলল নথি।

'ব্যস, এই! আর কিছু মনে এল না? দাঁড়াও, আমি একটা ভাল বর চাইছি...আমি চাই দশ লাখ ডলার,' বলল কিশোর।

মাথা নাড়ল ডানা।

'তোমার এমন কিছু চাওয়া উচিত যাতে পৃথিবীর উপকার হয়। আমি চাই মানুষে মানুষে সদ্ভাব।'

এসময় স্কুল বেল বাজলে কারও পক্ষে আর বর চাওয়া সম্ভব হলো না। ওরা কেউ লক্ষ করল না হ্যানজিন ওদের দিকে চেয়ে মুচকি-মুচকি হাসছে।

আট

'দারুণ কেটেছে সময়টা,' কিশোরকে বলল রবিন। পরদিন। স্কুলে যাচ্ছে ওরা।

'তোমরা কী নিয়ে কথা বলছ?' মুসা আর ডানা ওদের কাছে হেঁটে এল।

'রবিন কাল রাতে আমার বাসায় ছিল। আমরা রাত একটা পর্যন্ত ভিডিও গেমস খেলেছি,' জানাল কিশোর।

মুসা চাইল রবিনের দিকে।

'অবাকই লাগছে আন্টি তোমাকে কিশোরের বাসায় রাত কাটাতে দিয়েছেন শুনে। এখন তো ছুটি-ছাটা কিছু নেই।'

মাথা ঝাঁকাল নথি।

'আমিও কম অবাক হইনি।'

ওরা চার বন্ধু স্কুলের সিঁড়ির কাছে পৌঁছে গেল। কিশোর আর রবিন বসে পড়ল সবচেয়ে উপরের ধাপে।

'আমার মাও কালকে খুব ভাল ব্যবহার করেছে। শপিঙে নিয়ে গিয়ে তিনটা ড্রেস কিনে দিয়েছে। দোকানের মালিক এতই খুশি হয়েছে যে একটা ড্রেস ফাও দিয়ে দিয়েছে,' বলল ডানা।

'আমাদের ভাল সময় যাচ্ছে বলতে হবে,' বলল কিশোর। 'রাশেদ চাচার নতুন গাড়িতে কালকে আমার হাত ফস্কে পুরো এক টিন নীল রং পড়ে গেছিল। অথচ চাচা আমাকে কিছুই বলেনি। বরঞ্চ রং মুছতে সাহায্য করেছে।'

এসময় জুলিকে দেখা গেল।

'সায়েন্স টেস্টের জন্যে পড়াশোনা করেছ?' প্রশ্ন করল ও। 'আমি তিন ঘণ্টা পড়েছি!'

ডানার চোখজোড়া বিস্ফারিত হয়ে গেল।

'হায়, হায়! টেস্টের কথা তো ভুলেই গেছিলাম। নতুন ড্রেসের ট্রায়াল

দিতে দিতেই তো সময় চলে গেছে।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল মুসা।

'আমি পড়তে পারিনি। তুষার গলে ছাদ ফুটো হয়ে গেছে আমাদের। পানি পড়ে বিজ্ঞান বইটা ভিজে গেছে,' জানাল ও।

'আমরা পড়েছি,' জানাল নথি।

সায় জানাল কিশোর।

'ভিডিও গেম খেলার পর।'

'খাইছে! অত রাতে?' বলে উঠল মুসা।

'আমি সবচেয়ে ভাল গ্রেড পাব,' বড়াই করল জুলি। ধাপ বেয়ে উঠতে লাগল। সবচেয়ে উঁচু ধাপে পৌঁছেছে, হোঁচট খেয়ে চিতিয়ে পড়ে যাচ্ছিল ও। মুসা চট করে ওকে ধরে ফেলল। কিন্তু জুলির বই-পত্র উড়ে গেল এদিক-সেদিক। কিশোর লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে জুলির হোমওয়র্কের কাগজগুলো কুড়িয়ে নিল একে একে।

কাগজগুলো জুলির হাতে তুলে দিল ও।

'ব্যথা পাওনি তো?'

লজ্জা পেল জুলি।

'না, ধন্যবাদ।'

শ্রাগ করল কিশোর।

'নো প্রবলেম,' বলে দরজাটা মেলে ধরে থাকল, জুলি যতক্ষণ না ভিতরে প্রবেশ করল।

'আমার ইচ্ছেটা পূরণ হয়ে গেল,' বলল ডানা।

'কীরকম?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'আমি চেয়েছিলাম মানুষে মানুষে সদ্ভাব। কিশোর জুলিকে তেমন একটা পছন্দ না করলেও কাগজ তুলে দিয়ে সাহায্য করেছে,' জানাল ডানা।

ওরা মুহূর্তে নিশ্চুপ হয়ে গেল। গতকালের ইচ্ছের কথা মনে পড়ে গেছে সবার।

'ভাল ব্যবহার করতে জিনের সাহায্য লাগে না,' শেষমেশ বলল কিশোর।

'কেমন জানি খটকা লাগছে আমার। প্রথমে রবিনের ভিডিও গেমস খেলার শখ পূরণ হলো, আন্টি আপত্তি করলেন না। তারপর রাশেদ চাচা

নতুন গাড়িতে রং ফেলার পরও কিশোরকে কিছু বললেন না। আমি একটা ফ্রী ড্রেস পেয়ে গেলাম। মানুষে মানুষে সুসম্পর্ক চেয়েছিলাম সেটাও দেখতে পেলাম।' বলল ডানা।

'ডানা ঠিকই বলেছে,' আস্তে করে বলল মুসা। 'ডানার ইচ্ছে পূরণ হয়েছে, তারমানে হ্যানজিন আসলেই জিন।'

'কিশোর, হ্যানজিনের ব্যাপারে কী করা যায় বলো তো?' প্রশ্ন করল রবিন। ওরা সবাই স্কুলে ঢুকে পড়ল। 'ও কি সত্যিই জিন?'

'ভুলে যাচ্ছ কেন, আমি দশ লাখ ডলার চেয়েছিলাম, পাইনি। আর ডানাও বাব্‌ল্ গাম পায়নি,' বলল কিশোর।

ওদের কথা আর বেশিদূর এগোতে পারল না। কারণ মিসেস হকিন্স ওদের কথার মাঝখানে বাধা দিলেন।

নয়

মিসেস হকিন্স দরজায় দাঁড়িয়ে আন্তরিক হাসি হাসছেন।

'এসো, এসো,' ছেলে-মেয়েদেরকে ডাকলেন।

'খাইছে! ওঁর হাসি দেখলে ভয় হয়,' ফিসফিস করে বলে ক্লাসে ঢুকল মুসা। 'ব্যাপারটা মোটেই স্বাভাবিক নয়।'

শ্রাগ করল ডানা।

'আমি চেয়েছিলাম উনি ভাল ব্যবহার করুন। তা-ই হয়েছে।'

চিরাচরিত স্কার্ট ও ব্লাউজের বদলে মিসেস হকিন্সের পরনে আজ নীল জিন্স, স্নিকার্স আর সান্তা সোয়েটশার্ট।

'গতকালকে আমাদের পার্টিটা কী দারুণ জমেছিল, তাই না?' বললেন মিসেস হকিন্স। 'আমি চাইনি পার্টি শেষ হয়ে যাক।'

ডেস্কের ড্রয়ার থেকে এক ব্যাগ ভর্তি বাব্‌ল্ গাম বের করলেন তিনি। তারপর বিলি করতে লাগলেন।

'আজকে বাব্‌ল্ ফোলানোর প্রতিযোগিতা করলে কেমন হয়?' প্রশ্ন করলেন খোশমেজাজে।

রবিন আর মুসা ছাড়া সবাই খুশিতে চিৎকার করে উঠল। ওরা দু'জন হতভম্ব হয়ে গেছে।

'এবার প্রমাণ পেলে?' কিশোরকে বলল নথি।

কিশোর মাথা নাড়ল। ক্লাসের সবাই বাব্‌ল্ গামের জন্য ঘিরে ধরেছে মিসেস হকিন্সকে।

'আমার দশ লাখ ডলারের কী হলো?' বলল গোয়েন্দাপ্রধান।

রবিন দু'মুহূর্ত ভেবে নিল।

'তুমি তুষার চেয়েছিলে, মিসেস হকিন্স কম পরিশ্রম করান সেটা চেয়েছিলে, রাশেদ চাচার লাল স্পোর্টস কার চেয়েছিলে–সবই তো পেয়েছ। তোমার তিনটে ইচ্ছেই পূরণ হয়ে গেছে।'

'কিন্তু আমার তো আরেকটা বর দরকার,' বলল কিশোর।

'তারমানে তুমি বিশ্বাস করো যে হ্যানজিন জিন,' বলল মুসা।

'আমি বিশ্বাস করি আমি সবচেয়ে বড় বাব্‌ল্ ফোলাতে পারব,' বলে গাম আনতে গেল কিশোর।

সারা সকাল বাব্‌ল্ ফোলাল ওরা। কিশোর সেরা বাব্‌ল্ ব্লোয়ার হলো। ও এতটাই ভাল ফুলিয়েছে, মিসেস হকিন্স পর্যন্ত মুগ্ধ। ওকে আরেকবার করে দেখাতে বললেন। কিশোর গাম চিবিয়ে নরম করল। তারপর ফুলিয়ে বাস্কেটবলের সমান বড় করল।

'অবিশ্বাস্য,' বলে কিশোরের দিকে চেয়ে চোখ টিপল জুলি।

'ফুটাতে না হলে ভাল হত,' বলল রবিন।

কিশোর ওটা ফোটাল না। মুখ থেকে বের করে গামটাকে তুলে ধরল বেলুনের মত। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ওটা ডানার চুল ছুঁয়ে ফেলল। ছিটকে সরে গেল ডানা, কিন্তু ততক্ষণে যা হওয়ার হয়ে গেছে। ডানার মাথায় ফাটল কিশোরের বিশাল বাব্‌ল্।

'কী করেছ দেখো!' চেঁচিয়ে উঠল ডানা। আঠা ধরে টানাটানি করতেই আরও সেঁটে গেল। 'এখন কী করি?'

মিসেস হকিন্স ওদের মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন। গোটা ক্লাস আশঙ্কা করছে এখুনি ওঁর চোখ ঝলসে উঠবে, সবুজ লকেটটা কিছু একটা অদ্ভুত কাণ্ড করবে। কিন্তু সেসব কিছুই ঘটল না।

মিসেস হকিন্স আবারও হাসলেন।

'চিন্তার কিছু নেই। খানিকটা চুল কেটে দিলেই হবে।'

'এই যে কাঁচি,' বলল মুসা।

কিশোর হাত বাড়িয়ে নিল কাঁচিটা।

'আমি ভুল করেছি আমিই ঠিক করে দেব,' বলল।

'না!' আর্তনাদ ছাড়ল ডানা। কিন্তু তার আগেই একগোছা চুল কেটে নিয়েছে কিশোর।

'চুপ করে বসে থাকো,' বলল ও। 'হয়ে গেছে প্রায়।'

আরেক গোছা চুল কোলের উপর পড়তেই ফুঁপিয়ে উঠল ডানা।

'কী করছ কী?' চেঁচিয়ে উঠল কিশোরের উদ্দেশে। পরমুহূর্তে ওর বাবল্ গামটা ছুঁড়ে মারল। মিসেস হকিন্সের পাশে, চকবোর্ডের উপরে গিয়ে পড়ল ওটা। গোটা ক্লাস নীরব হয়ে গেল। এমনকী ডানাও।

মিসেস হকিন্স চকবোর্ড থেকে গামটা তুলে নিয়ে টিসু পেপারে মুড়লেন। এবার সরাসরি চাইলেন ডানার দিকে।

'তুমি আপসেট হয়ে পড়েছ,' মৃদু কণ্ঠে বললেন। 'খানিকক্ষণ বরং প্রিন্সিপালের অফিসে কাটিয়ে এসো।'

মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল ডানার। মাথা নাড়ল।

'কি...কি...কিন্তু আ...আমাকে আগে কখনও প্রিন্সিপালের অফিসে পাঠানো হয়নি।'

'সব কিছুরই শুরু আছে,' বলল কিশোর।

'কিশোর ঠিকই বলেছে,' বললেন মিসেস হকিন্স। 'ডানা, তুমি যাও।'

ডানা ধীরে ধীরে ক্লাস ত্যাগ করল। মুহূর্তে সবারই বাবল্ ফোলানোর ইচ্ছে মরে গেল।

'এখন সায়েন্স টেস্ট হবে,' বললেন মিসেস হকিন্স।

হাতে হাতে প্রশ্নপত্র বিলি করতে লাগলেন।

দশ

রবিন ওর পিৎযা ও ক্যান্ডির ট্রেটা ঠেলে সরিয়ে দিল।

'রোজ রোজ এসব খাবার ভাল্লাগে না। এমনিতেই গাম চিবিয়ে আমার

পেট ব্যথা করছে।' বলল ও।

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানাল কিশোর।

'আমারও চোয়াল ব্যথা হয়ে গেছে।'

'পিৎযা খেতে যে আমার বিরক্ত লাগতে পারে কখনও ভাবিনি,' স্বীকার করল মুসা।

'আমাকে প্রিন্সিপালের অফিসে পাঠানো হবে কোনদিন ভাবতেও পারিনি,' ছলছল চোখে বলল ডানা।

রবিন ওর পিঠ চাপড়ে দিল।

'ও কিছু না। কিন্তু মুসা আর আমার ব্যাপারটা ভেবে দেখো।'

মাথা ঝাঁকাল মুসা।

'বিশ্রী একটা দিন যাচ্ছে। সায়েন্স টেস্টের সময় তো ঘুমিয়ে কাটালাম। সব রবিনের দোষ।'

রবিন আর মুসা দু'জনেই টেস্টের সময় ঘুমিয়েছে।

'আমার দোষ? কেন, কী করেছি আমি?' রবিন জবাব চাইল।

'তুমি রাত জাগতে চেয়েছিলে,' মনে করিয়ে দিল মুসা।

ডানা একটা হাত তুলল।

'রবিনের দোষ নয়, দোষটা হ্যানজিনের।'

'হ্যানজিন আবার কী করল?' প্রশ্ন করল কিশোর।

'ও ইচ্ছেগুলোকে পূরণ করেছে,' বলল ডানা।

মাথা নাড়ল মুসা।

'ইচ্ছেগুলো আমাদের ছিল। দোষ আমাদের। হ্যানজিনের নয়।'

'মুসা ঠিকই বলেছে। আমাদেরকে সব কিছু ঠিকঠাক করে ফেলতে হবে।' ডানা বলল।

'বোকার মত কথা বললে তো হবে না,' বলল কিশোর। 'পরীক্ষায় ফেল করার পর আর কী করার থাকে? এমনকী ডানার চুলও এখন ঠিক করা যাবে না।'

ডানার দিকে চাইল ওরা। কাঁটার মত হয়ে রয়েছে চুল।

'অতটা খারাপ দেখাচ্ছে না,' সান্ত্বনা দিয়ে বলল মুসা।

'সবচেয়ে খারাপ যেটা লাগছে,' বলল রবিন, 'সেটা হচ্ছে এই হিট ওয়েভ। পাহাড়ের বরফ গলছে, নদীর পানি বাড়ছে। এভাবে চলতে থাকলে

গ্রীনহিলসে বন্যা হয়ে যাবে। আর হবে ঠিক বড়দিনের সময়।'

'খাইছে! বহু লোক তো ঘর হারাবে।' আতঙ্কিত গলায় বলল মুসা।

মাথা ঝাঁকাল রবিন।

'এ তো সবে শুরু...গ্রীনহিলসের দিকে বড় ধরনের ঝড় আসছে। শহরটা ভেসে যাবে, তার আগেই যদি আমরা কিছু না করি।'

'বাকি ইচ্ছেগুলো আমরা কাজে লাগাতে পারি,' প্রস্তাব করল মুসা।

'মুসা ঠিক বলেছে,' বলল ডানা।

'আমার সব বর শেষ,' মনে করিয়ে দিল কিশোর।

'আমার তিনটেও,' জানাল রবিন।

ডানা মাথা নাড়ল।

'আমারও।'

'আমার দুটো ইচ্ছে পূরণ হয়েছে। একটা হলো কিশোরের মুখ বন্ধ করা, যেটা টেকেনি। আর আরেকটা হচ্ছে হ্যানজিনের ইয়ার্ড পরিষ্কার করা।' বলল মুসা।

রবিন হাত রাখল মুসার কাঁধে।

'তোমার ওপরই সব কিছু নির্ভর করছে। গ্রীনহিলসকে বন্যার হাত থেকে একমাত্র তুমিই বাঁচাতে পারো।'

'ওহ্, মুসা, পারবে তো?' ফিসফিস করে বলল ডানা।

ঢোক গিলল মুসা।

'পারব।'

এগারো

স্কুল ছুটির পর চারজন খেলার মাঠে চলে এল। হ্যানজিনের উঠনের দিকে চাইল ওরা। বেড়া আর গাছে তখনও মিটমিট করে জ্বলছে বড়দিনের বাতি।

মেঘে ঢেকে গেছে আকাশ। কাছেই গুড়-গুড় শব্দে বাজ ডাকছে। রবিন মুসার বাহু চেপে ধরল।

'যা করার এখুনি করে ফেলতে হবে,' জরুরী কণ্ঠে বলল ও।

'কিন্তু ঝড়-বৃষ্টি আসছে। আমরা তো ভিজে যাব।'

'তুমি কিছু না করলে লাখ-লাখ মানুষ পানিতে ভাসবে,' বলল ডানা।

'যত্তসব পাগলামি,' বলল কিশোর।

বড় করে শ্বাস টানল মুসা।

'গ্রীনহিলসকে আমাদের বন্যার হাত থেকে বাঁচাতে হবে দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করল।

'যা চাইবে ভেবেচিন্তে চেয়ো,' বলল রবিন।

'হ্যাঁ, বরটা নষ্ট যাতে না হয়,' ডানা যোগ করল।

মুসা মাথা নেড়ে গলা চড়িয়ে ডাক ছাড়ল।

'হ্যানজিন, আপনি একটু বাইরে আসবেন?'

কিন্তু হ্যানজিন দরজা খুলল না। উঠন আর বাড়িটা নিস্তব্ধ। শুধুমাত্র বাতাসে দুলছে মিটমিটে আলোগুলো। ওদের মাথার উপরে চাবুক হানছে গাছের ডাল। ছোট এক ডাল ভেঙে উড়ে গিয়ে পড়ল হ্যানজিনের উঠনে।

'বেরিয়ে আসুন, হ্যানজিন!' চেঁচাল ডানা। 'আমরা জানি আপনি কে।'

'আপনি সব কিছু নষ্ট করেছেন,' হেঁকে বলল কিশোর।

'খাইছে! ওকে খেপিয়ো না!' হুঁশিয়ার করল মুসা।

'আমাদের বরং ওকে বরগুলোর জন্যে ধন্যবাদ দেয়া উচিত,' ডানা বলল। 'কোন কোনটা তো ভালই ফল দিয়েছে।'

মাথা নাড়ল রবিন।

'একটাও কোন ভাল ফল দেয়নি। আমরা ভয়ঙ্কর এক বন্যা ডেকে এনেছি, জাঙ্ক ফুড খেয়ে স্কুলের অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়েছে, এবং মিসেস হকিন্স আমাদের প্রতি নরম হতে গিয়ে হয়তো তাঁর চাকরিটাই হারাবেন।'

'সবচেয়ে খারাপ ব্যাপার হচ্ছে জুলি ভেবেছে আমি ওকে পছন্দ করি,' বলল কিশোর।

'সব কিছুই কেমন ভজকট হয়ে গেছে। ভোগান্তি আরও বাড়াবে এই ঝড়টা,' বলল মুসা।

'গেল কই ওই প্যাডেল মারা লোকটা?' প্রশ্ন করল কিশোর। 'রোজই তো স্কুলের পর তার দেখা পাওয়া যেত।'

'বাতাসের জন্যে হয়তো শুনতে পাচ্ছে না,' বলল ডানা।

'এসো সবাই মিলে একসাথে চেঁচাই,' প্রস্তাব করল নথি।

'হ্যানজিন!' সমস্বরে চেঁচাল ওরা।

কিন্তু বাতাসের তীক্ষ্ণ শোঁ-শোঁ শব্দ ছাড়া আর কোন জবাব পাওয়া গেল না।

ইতোমধ্যে বাতাসের ঝাপ্টায় ডানার স্কার্ফ উড়ে গেছে। মুসার নোটবইয়ের কাগজগুলো ইতস্তত উড়ছে। রবিন এসময় চোখের কোণে দেখতে পেল একটা কার্পেট ওর পাশ দিয়ে উড়ে চলে যাচ্ছে। চোখের পলক ফেলতেই হাওয়া হয়ে গেল ওটা, ত্রিসীমানায় আর দেখা গেল না।

'খাইছে! কী শুরু হলো এসব,' চিৎকার ছেড়ে কাগজ কুড়োতে লাগল মুসা।

'আমাদেরকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে।' বলে বেড়া আঁকড়ে ধরল ডানা। 'সব হ্যানজিনের দোষ।'

মুসা একটা উড়ন্ত কাগজ থাবা মেরে ধরে চেঁচিয়ে উঠল, 'আমি চাই সব কিছু আবার স্বাভাবিক হয়ে যাক!'

বারো

পরদিন সকাল। ওরা চারজন ফুড ডেলিভারির লোকজনদেরকে সাদা ট্রাক থেকে ব্রোকলি ও কর্ন ডগসের বাক্স নামাতে দেখল। বাতাস ঠাণ্ডা। মাটিতে তুষারের পাতলা প্রলেপ। তুষারের নীচে, হ্যানজিনের উঠনে এটা-সেটা পড়ে রয়েছে। বড়দিনের আলো নেই, হ্যানজিনও নেই।

'সব কিছু আবার নর্মাল হয়ে এসেছে,' বলল মুসা।

মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

'ঝড়ে জায়গাটা আবার নোংরা হয়ে গেছে।'

'যা বাতাস ছেড়েছিল কালকে বাপরে বাপ! মনে হচ্ছিল উড়িয়ে নিয়ে যাবে বুঝি!' বলল ডানা।

'কিন্তু আমরা পেরেছি,' বলল মুসা। 'গ্রীনহিলস শহরকে আমরা বাঁচাতে পেরেছি।'

মাথা নেড়ে সায় জানাল রবিন।

'ঠাণ্ডা বাতাস বন্যাটাকে ঠেকিয়ে দিয়েছে। পাহাড়ের তুষার আবারও জমাট বেঁধে গেছে।'

কিশোর জ্যাকেট টেনেটুনে ঠিক করল।

'রাশেদ চাচার ট্রিপটা তার কোম্পানী বাতিল করাতে আমি খুব খুশি হয়েছি। ওরা যদিও স্পোর্টস কারটা ফেরত নিয়েছে। তাতে কী?'

খালি বাড়িটার দিকে চাইল মুসা।

'হ্যানজিনকে কিন্তু মিস করব আমি।'

সায় জানাল নথি।

'হ্যাঁ, রোজ রোজ তো আর এরকম সত্যিকারের জিনের দেখা পাওয়া যায় না,' বলল ও।

'ও যদি জিন নাও হয়ে থাকে, ইয়ার্ডটাকে কিন্তু সুন্দর করে সাজিয়েছিল,' ডানা বলল।

'আরি, এটা কী?' হঠাৎ বলে উঠল কিশোর। ছোট্ট এক বাদামি শিশি আটকে রয়েছে দুটো ডালের ফাঁকে।

'খুলো না!' বন্ধুরা সাবধান করল।

মাথা নাড়ল কিশোর।

'এটা খোলাই আছে। ভিতরে একটা চিরকুট দেখা যাচ্ছে।'

ছেলে-মেয়েরা কাছিয়ে এল অদ্ভুত হাতের লেখাটা পড়তে।

'হ্যানজিন লিখেছে,' মুসা জানাল। 'ও বলছে, আমরা চাইলে নিজেরাই আমাদের ইচ্ছে পূরণ করতে পারি। ইচ্ছাপূরণের ক্ষমতা নাকি আমাদের সবার মধ্যেই আছে।'

'তুমি আমাদের জিন হয়ে যাচ্ছ নাকি?' রবিন ঠাট্টা করে বলল।

'একটু-একটু,' হেসে বলল মুসা। 'ছুটির পর ইয়ার্ডটার ময়লা পরিষ্কার করব ঠিক করেছি।'

'পাগল নাকি তুমি? এ তো গাধার খাটুনি,' বলল ডানা।

'আমি তোমাকে সাহায্য করব,' হেসে বলল কিশোর। 'আমার ওপরও মনে হয় খানিকটা জিন ভর করেছে।'

'আমিও আছি তোমাদের সাথে,' রবিন জানাল। 'শুধু একটাই অনুরোধ, হুট করে কোন বোতল-টোতল খুলে ফেলো না যেন।'

'প্রশ্নই ওঠে না,' বলে উঠল কিশোর।

তিন গোয়েন্দা চাইল ডানার দিকে।
'ডানা, তুমি আমাদেরকে হেলপ করলে খুশি হতাম,' বলল মুসা।
আরব্য রজনীর জিনের মত নুয়ে পড়ে অভিবাদন জানাল ডানা।
'জো হুকুম, প্রভু!'

***

এ-মাসের তিন গোয়েন্দা

কিশোর–সুব্রত সিংহ
C/o চিত্তরঞ্জন দাসের বাড়ি, বাসুলিয়া পট্টি, পুরাতন বাজার, ঝিলিম রোড, চাঁপাই নবাবগঞ্জ। পো: কোড: ৬৩০০।

মুসা–টাইগার মনির
C/o আব্দুল্লাহ্ আলমামুন, অগ্রণী ব্যাংকের দক্ষিণ পার্শ্বে
থানা+পো: বোয়ালমারী, জেলা: ফরিদপুর।

রবিন–মোঃ শাওন হোসেন (রাজু)
বোয়ালমারী অগ্রণী ব্যাংকের দক্ষিণ পার্শ্বে
থানা+পো: বোয়ালমারী, জেলা: ফরিদপুর।

জিনা–সুজানা আলী সুইটি
১০৯৭/এ, রোড নং ২০, খিলগাঁও, ঢাকা-১২১৯, (৬ষ্ঠতলা, বামের ফ্ল্যাট

কিশোর থ্রিলার
ভলিউম-১০৬

তিন গোয়েন্দা

রকিব হাসান/শামসুদ্দীন নওয়াব

ভূতুড়ে শহর: রকিব হাসান

গোল্ডেন ডোর সিটি। ভয়ঙ্কর এক মৃত্যুপুরী। রাত দুপুরে শোনা যায় অদ্ভুত চিৎকার। মাথার অনেক উপর থেকে ভেসে আসে বড় বড় ভ্যাম্পায়ার-বাদুড়ের ডানা ঝাপটানোর শব্দ, মাটির নীচ থেকে যেন চুইয়ে উপরে উঠে আসে প্রেতের চাপা গোঙানি। মুসাকে নিয়ে সাগরে ডুব দিল কিশোর। নড়ে উঠল ক্যাপ্টেনের কঙ্কাল।

রোবট-রহস্য: শামসুদ্দীন নওয়াব

ভয়াবহ মারণাস্ত্র ডিসিনটিগ্রেটর গান। ওটার প্ল্যান, মাল-মশলা চুরি গেল একে একে। কারা করছে অপকর্মটা? কী তাদের উদ্দেশ্য? জীবনবাজি রেখে এগিয়ে এল কিশোর আর হিরু চাচা।

ইচ্ছাপূরণ: শামসুদ্দীন নওয়াব

পুরানো একটা বোতল। ওটা খুলতেই ঘটতে শুরু করল অদ্ভুত সব ঘটনা। কোত্থেকে উদয় হলো দীর্ঘদেহী এক আগন্তুক। আশ্চর্যজনকভাবে সত্যি হয়ে যাচ্ছে তিন গোয়েন্দার ইচ্ছেগুলো। রবিনের ধারণা আগন্তুক জিন, বোতল থেকে বেরিয়েছে। ওর কথা হেসেই উড়িয়ে দিল কিশোর। কিন্তু ক্রমেই জটিল হয়ে উঠছে রহস্য।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০